জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ মোঃ এনামুল কবির

সম্পাদনা

অধ্যাপক আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

draft copy

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

চিত্রণ
কামরুন নাহার ময়না

গ্রাফিক্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: _____

draft copy

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্যদিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

draft copy

draft copy

সূচিপত্র

অনুসন্ধানীচর্চা ও মুক্তমানস গঠন

ইতিহাস জানার উপায় এবং কাল বা যুগ বিভাজনের সমস্যা

বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসে সন্ধানে

আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ

দক্ষিণ এশিয়া: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধু: মানবতা ও মানুষের মুক্তির প্রতি অঙ্গিকার

ব্যক্তি জীবনে সামাজিক কাঠামো

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব

মিলেমিশে নিরাপদে বসবাস

সম্পদের উৎপাদন, বন্টন ও সমতার নীতি

draft copy

অনুসন্ধানীচর্চা ও মুক্তমানস গঠন

প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাব

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতায় প্রথমেই জব্বার হোসেন ও অন্বেষা সাঙ্গমার জীবনের গল্প সম্পর্কে জেনে নিই।

সমুদ্রে মাছ ধরায় ব্যাস্ত জেলেরা

জব্বার হোসেনের জন্ম সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়। সমুদ্রে মাছ ধরে এবং হাঁটে মাছ বিক্রি করেই তার জীবন চলে যায়। বাড়িতে আছে স্ত্রী ও তিন সন্তান।

জব্বার হোসেন স্বপ্ন দেখেন তার সন্তানরা পড়াশুনা করে শিক্ষিত হবে। হাঁট বাজারে মাঝে মাঝে শহর থেকে আসা বড় সাহেবদের দেখতে পান। তারা মাছ কিনে নিয়ে যান। তাদের ভাষাও জেলেদের মতো না। জব্বার হোসেন অবশ্য এই ভাষার একটি নাম দিয়েছেন শিক্ষিত ভাষা।

দাদার কাছ থেকে শুনেছেন এখানে নাকি একসময় জাহাজও আসত। এখান থেকে লবণ, জামা কাপড় এসব জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেতো। জাহাজে বিদেশী মানুষেরাও আসত।

শহরের বড় সাহেবদের পড়া শার্ট, প্যান্ট কোর্ট দেখে তার ভালো লাগে। স্ত্রীকে জানায় এবার কিছু টাকা জমলে দর্জির কাছ থেকে শার্ট, প্যান্ট, কোর্ট বানিয়ে নিবেন। তার এই কথা শুনে স্ত্রী হাসে। এই জামা কাপড় পরে আপনি কই যাবেন? জব্বার সাহেব ভাবেন সত্যিইতো এইটা পড়ে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। এমনকি এই পোশাকে তিনি সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারবেন না। তিনি বুঝলেন, না লুঙ্গির মতো এই রকম আরামদায়ক

draft copy

পোশাক আর কোনোটাই হয় না। একটু গুঁজে দিলেই হলো কাজে লেগে পরা যায়। আবার ভিজে গেলে বাতাসে খুব তাড়িতাড়ি শুকিয়েও যায়।

জব্বার হোসেনের ছোট ছনের ঘর মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঝড়ে ভেঙে যায়। এগুলো ঠিক করতে তখন বেশ কষ্ট করতে হয়। তারপরও আগের চেয়ে অবস্থা এখন অনেক ভালো। মায়ের কাছ থেকে শুনা এক সময় নাকী বড় বড় ঝড়ে অনেক মানুষ মারা যেতো। এরকমই এক ঝড়ের সময় মা তার এক ছোটবোনকে হারিয়েছে। এখন সমুদ্রে এরকম বড় ঝড়ের আশংকা হলে তারা বিপদসংকেত পান। স্ত্রী সন্তান নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেন।

জব্বার হোসেনের জীবন যেনো এই সমুদ্রেই। সন্তানরা যেখানেই যাক তিনি এই সমুদ্রেই মরতে চান। মাঝে মাঝে সমুদ্রের পানির উপর মাছের ট্রলারে গা ভাসিয়ে দিয়ে জোর গলায় গান ছাড়েন... আমি অপার হয়ে বসে আছি পারে লইয়া যাও আমায়.....।

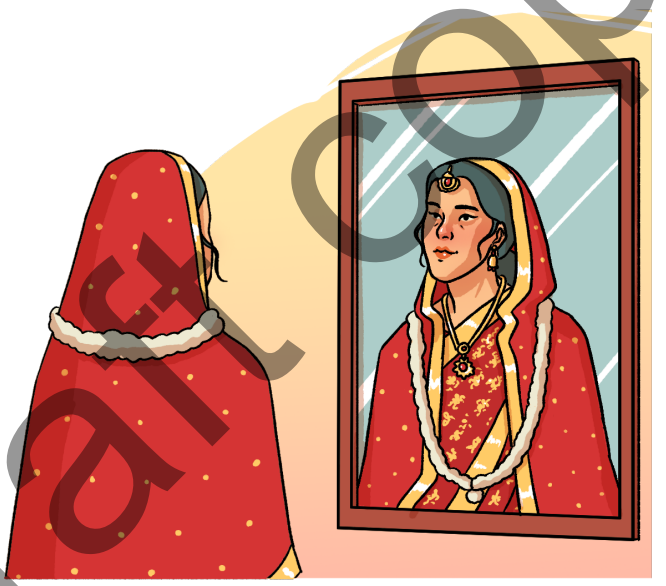

একটি গারো সম্প্রদায়ের মেয়ে শাড়ি পড়ে বিয়ের সাজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের গারো টিলায় বড় হয়েছে অন্বেষা সাঙ্গামা। চারিপাশে গাছপালা ও টিলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সবসময় তাকে আগলে রেখেছে। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছে না। বেশ সেজে ফেলেছে আজ। নিজ রুমটি পরিপাটি ঘরে গুছিয়েছে। পুরনো কিছু জিনিসপত্রও সরিয়েছে। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে উঠবে এখানেই।

বাড়ি ভর্তি মানুষ। সবার আগ্রহ নতুন বরকে দেখার। তাছাড়া, প্রতিবেশীরা ও আত্মীয় স্বজনরা প্রস্তুতি নিচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠানে গান ও নাচ পরিবেশন করবে। খাবারদারের আয়োজনও করা হয়েছে। কিন্তু অন্বেষা কেনো যেনো সবার মতো মজা করতে পারছে না। চিন্তা হচ্ছে নতুন জীবনের সব কিছু কিভাবে শুরু করবে?

draft copy

হঠাৎই মা ঢুকলেন ঘরে। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বললেন। নতুন জামাইকে বাইরে কাজ করতে হবে। তাদের জমিজমা দেখে শুনে রাখতে হবে। তাই বিয়ের পরদিনই মেয়ের জামাইকে নিয়ে তিনি চাষাবাদের সম্পত্তি দেখিয়ে দিতে চান। অন্বেষার একটু রাগ হলো। মাকে একটু কড়া করেই বলল, মা একজন মানুষ প্রথম আমাদের সাথে এসে থাকবে। বিয়ের পরদিনই তুমি তাকে কাজে পাঠিয়ে দিবে। মায়ের উত্তর, কি করব বলো আমার সব সম্পদইতো তোমার। তুমি যদি বরকে পরিশ্রমি করে না তুলো। বরতো আলসে হয়ে যাবে।

অন্বেষা মায়ের কথা মেনে নিল। তারপর কথা ঘুরিয়ে বললো, মা কেমন লাগছে আমাকে? মা এবারও কিছুটা মলিন দৃষ্টিতে বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমি দক্কান্দা পড়ে বিয়ে করবে। অন্বেষা বলল, মা এখনতো তেমন কেউ এই পোশাকে বিয়ে করে না। মা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সবার মতো না। অন্বেষা বলল, মা আমি সামনের সবগুলো অনুষ্ঠানে দক্কান্দা পড়ব। বিয়েতো একবারই হয় এই একটা দিন আমার মতো করে একটু সাজি। মা আর কিছু না বলেই চলে গেলেন।

অন্বেষার অনেকদিন পর আজ কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। তার একটি ডায়েরি আছে সেখানে তার বিশেষ মুহূর্তগুলো লিখে রাখে। কিন্তু যখনই লিখতে বসে তার নিজের ভাষায় লিখতে পারে না। কারণ গারো ভাষার লেখার জন্য বর্ণমালা নেই। আহা! যদি নিজের ভাষায় লেখা যেতো। তারপরও লিখবে সে যে ভাষা স্কুলে, কলেজে শিখেছে সেই বাংলা ভাষাতেই লিখবে।

ডায়েরি খুলতেই অন্বেষার নানীর কথা মনে পরছে। নানীর ছবিটার দিকে তাকাতেই মনে পরে গেল সেই কথা, তোমার যে বর হবে সে খুব সৌভাগ্যবান। তুমি মানুষকে অনেক বুঝ। দেখে শুনে ভালো বর তুলো। তার বর মিন্টুর সাথে দেখা হয় রে-রে নৃত্য পালাতে। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা নেচেছে, গান গেয়েছে। এরপর তাকে ভালো লাগার কথা পরিবারকে জানালে তারাই এই বিয়ের আয়োজন করে। গারো সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে ভিন্ন গোত্রের ছেলেকে বিয়ে করতে হয়। মিন্টুও ভিন্ন সম্প্রদায়ের।

ছোটবেলায় অন্বেষা একদিন নানীকে জিজ্ঞেস করল নানী তুমি নানাকে কি উপহার দিয়েছ বিয়েতে? নানী তাকে খুব সুন্দর একটি আংটি দেখালেন। অন্বেষা বললো, এটাতো অনেক সুন্দর। নানী বলল, তোমার বিয়েতেও তোমার বরকে এই আংটি দিলে কেমন হয়? সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল অন্বেষা। আজ নানীর দেওয়া সেই আংটি দিয়েই সে চার্চে বরকে গ্রহণ করবে তার জীবনে।

অনুশীলনী কাজ ১: জব্বার হোসেন ও অন্বেষা সাঙ্গামার জীবনের গল্প পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাব বিদ্যমান। দুজনের জীবন ধারা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্নতা রয়েছে। চলো এখন আমরা জব্বার হোসেন ও অন্বেষা সাঙ্গামা যে অঞ্চলে থাকেন সেখানকার প্রাকৃতিক উপাদান, সামাজিক উপাদান সনাক্ত করে নিচের ছিকটি পূরণ করে ফেলি।

draft copy

	প্রাকৃতিক উপাদান	সামাজিক উপাদান
জব্বার হোসেন		
অন্বেষা সাঙ্গামা		

অনুশীলনী কাজ ২: জব্বার হোসেন ও অন্বেষা সাঙ্গামা যে অঞ্চলে থাকেন সেখানকার প্রাকৃতিক উপাদান, সামাজিক উপাদান কিভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করছে তা আলোচনা করে লিখি।

সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কিভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে	গারো সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কিভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে

draft copy

আমরা এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমাদের চারপাশের মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কিভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা জানার চেষ্টা করব। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি নবম শ্রেণিতেও আমরা অনেকটা একই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করব। তবে তথ্য সংগ্রহ করার প্রশ্নমালা এমনভাবে সাজাব যেনো তথ্যদাতা হ্যাঁ বা না উত্তরের পাশাপাশি তার নিজস্ব মতামত প্রদানেরও কিছুটা সুযোগ থাকবে। সেই সাথে দুয়ের অধিক বিকল্প থেকে তথ্যদাতার উত্তর বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি

আমরা পূর্বের ক্লাসের মতো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করব। আমরা ধাপগুলো আবার মনে করে নিই।

১. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা

৩. তথ্যের উৎস নির্বাচন করা

৪. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ

৫. তথ্য সংগ্রহ করা

৬. তথ্য বিশ্লেষণ করা

৭. ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমরা এখন রাজু কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদনে কিভাবে উপস্থাপন করছে তা জেনে নিই। এই প্রক্রিয়ায় আমরাও অনুসন্ধান করতে পারব এবং প্রতিবেদন লিখতে পারব।

রাজুর বাড়ি পাহাড়ে কূল ঘেঁষা। সেখান থেকে পাহাড়ের গা চুয়ে পানি নেমে আসে সংকীর্ণ পথ ধরে। রাজুর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবাই কাছাকাছি থাকে। বিয়ে, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন আয়োজনে সবাই থাকে। রাজু শুনেছে আগে বিয়ের অনুষ্ঠানে নাকী বিয়ের গেইট হতো কলা গাছ কেটে। এখানে আশে-পাশে কলা গাছ হয় অনেক। কিন্তু এখনতো এরকম দেখা যায় না। এখন বিয়ে বাড়িতে কাপড় ও ফুল দিয়ে গেইট সাজায়। আগে নাকি বিয়েতে সারা রাত ধরে বাড়ির নারীরা বিভিন্ন ধরনের পিঠা রান্না করত, গান করত, মজা করত। এখন বিয়েতে মোবাইল ফোনে জোরে গান বাজতে শুনে। কখনো কখনো মাইকেও বাজে গান। রাজু চিন্তা করল প্রকৃতির উপাদান ও সমাজের উপাদানের পরিবর্তন তাদের এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। রাজু চিন্তা করল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে জানবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো এলাকার সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত করছে। এজন্য সে ৩০ জন বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নিবে ঠিক করল। সেইসাথে প্রশ্নমালাও তৈরি করল।

draft copy

তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা

১. আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনগুলো পরিবর্তিত হয়েছে?

- গাছপালা
- পাহাড়
- পুকুর
- পশু পাখির সংখ্যা
- অন্যান্য

২. প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন এলাকার মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতিতে কি কোন প্রভাব ফেলেছে?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৩. যদি হ্যাঁ হয়, প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতিতে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে?

---

৪. আমাদের এলাকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো কিভাবে ভূমিকা রেখেছে?

---

৫. আমাদের এলাকার সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনগুলো পরিবর্তিত হয়েছে?\

- পরিবার
- যানবাহন
- রাস্তা-ঘাট
- পোশাক
- অন্যান্য
-

৬. সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন এলাকার মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতিতে কি কোন প্রভাব ফেলে?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. যদি হ্যাঁ হয়, সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতিতে কিভাবে প্রভাব ফেলে?

---

৮. আমাদের এলাকার সামাজিক উপাদানগুলো কিভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করছে।

---

draft copy

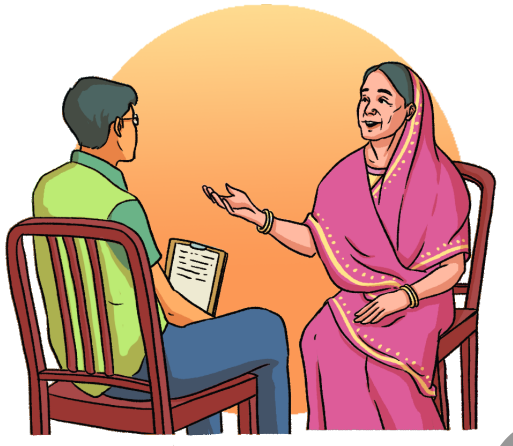

একজন বয়স্ক নারী কাঠের চেয়ারে বসে কথা বলছেন। একজন ক্লাস নাইনে পড়ুয়া ছেলে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

রাজু ৩০ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য নিল। এরপর সে প্রাপ্ত তথ্য টেবিলে উপস্থাপন করল।

১নং প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

গাছপালা	পাহাড়	পুকুর	পশু-পাখি	অন্যান্য
৩০ জন	২৮জন	২৬জন	৩০জন	১০ জন

২নং প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

হ্যাঁ	না
২৭ জন	৩ জন
শতাংশ, $\frac{(২৭\times১০০)}{৩০}$ =৯০%	শতাংশ, $\frac{(৩\times১০০)}{৩০}$ =১০%

৩ নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে রাজু কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করল। তারপর একেএকে সব সাজাল:

প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতির যে বিষয়গুলোতে প্রভাব ফেলছে

- চাষাবাদ
- অর্থনীতি
- পূজা-পার্বন
- উৎসব
- কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
- ব্যবসা
- চাকরি

draft copy

৪নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো যেভাবে ভূমিকা রেখেছে

- চাষাবাদসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের জন্য প্রাকৃতিক উপাদানের পরিমান কমছে।
- পূজা-পার্বন, উৎসব ইত্যাদি আগে প্রাকৃতিক উপাদানের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। এখন সেরকমটি নেই।
- অতীতে মানুষ প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। এখন প্রাকৃতিক উপাদান কমে যাচ্ছে।

৫নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

পরিবার	যানবাহন	রাস্তা-ঘাট	পোশাক	অন্যান্য
২৮ জন	২৫জন	৩০জন	২৮জন	২০ জন

৬নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

হ্যাঁ	না
২৪	৬
শতাংশ, $\frac{(২৪\times১০০)}{৩০}$ =৮০%	শতাংশ, $\frac{(৬\times১০০)}{৩০}$ =২০%

৭নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যকেও রাজু কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করে নিল।

সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতির যে বিষয়গুলোতে প্রভাব ফেলছে

- যাতায়াত
- যোগাযোগ
- উৎস উদযাপন
- রীতি-নীতি

৮নং প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে সামাজিক উপাদানগুলো যেভাবে ভূমিকা রেখেছে

- রাস্তা-ঘাট ও যানবাহনের উন্নয়নের ফলে সুযোগ সুবিধা বেড়েছে
- আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপনে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও পুরনো গানের বিলুপ্তি
- মোবাইল ফোন ব্যবহারীর সংখ্যা বাড়ছে
- আগে মানুষের মধ্যে একাত্মতা ছিল
- প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করছে

draft copy

রাজুর মনে হলো আচ্ছা তার এলাকার পরিবার সংখ্যা গত ২০ বছরে কি পরিমান বেড়েছে বা কমেছে তা সে জানতে চায়। এজন্য সে এলাকার একজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নিল। এজন্য সে ২০ বছর কে ১-৫, ৬-১০, ১১-১৫, ১৬-২০ এই চারভাবে বিন্যস্ত করল। তারপর ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে আনুমানিক সংখ্যা জানতে চাইলো। তথ্যগুলোকে এভাবে সাজালঃ

বিস্তার	গত ১৬-২০ বছর	গত ১১-১৫ বছর	গত ৬-১০ বছর	গত ১-৫ বছর
বিস্তার মধ্যবিন্দু	$\frac{(১৬+২০)}{২}$ = ১৮ বছর	$\frac{(১১+১৫)}{২}$ = ১৩ বছর	$\frac{(৬+১০)}{২}$ = ৮ বছর	$\frac{(১+৫)}{২}$ = ৩ বছর
পরিবার সংখ্যা	৫০টি	৪৮টি	৫৪টি	৬০টি

রাজুর জানতে ইচ্ছে হল পরিবারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও গত ১১-১৫ বছরে ২টি পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। সে স্থানীয় একটি পত্রিকার তথ্য থেকে জানতে পারে ১৩ বছর আগে এলাকার ভূমি ধ্বসে ২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা পাশের একটি এলাকায় আশ্রয় নেয়।

রাজু এখন তার প্রাপ্ত তথ্যগুলো কে স্তম্ভ চিত্র, পাই চার্ট ও গ্রাফে প্রকাশ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করল।

প্রতিবেদন

অনুসন্ধানের বিষয়: আমার এলাকার প্রকৃতি ও সমাজের উপাদান কিভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য: ১. প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়

২. এই পরিবর্তন কিভাবে এলাকা ইতিহসে ভূমিকা রাখছে

৩. প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কিভাবে এলাকার সাংস্কৃতির উপর ভূমিকা রাখছে

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: আমি এলাকার ৩০ জন মানুষের কাছ থেকে এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালায় কিছু প্রশ্ন উত্তরদাতা বিকল্প উত্তর থেকে বেছে নিয়েছেন। যা থেকে এলাকার কোন কোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে এবং কোন উপাদানগুলো এলাকার ইতহাস এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সেইসাথে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। যেখানে উত্তরদাতা প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন কিভাবে এলাকার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিতে ভূমিকা রেখেছে সেই সম্পর্কে সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন।

তথ্য সংগ্রহের পূর্বে: তথ্য দাতাকে অনুসন্ধানের বিষয় এবং তথ্য সংগ্রহে কত সময় লাগতে পারে সে বিষয়ে জানিয়েছি। তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন: প্রাপ্ত তথ্য নিচের স্তম্ভচিত্র, গ্রাফ ও পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

draft copy

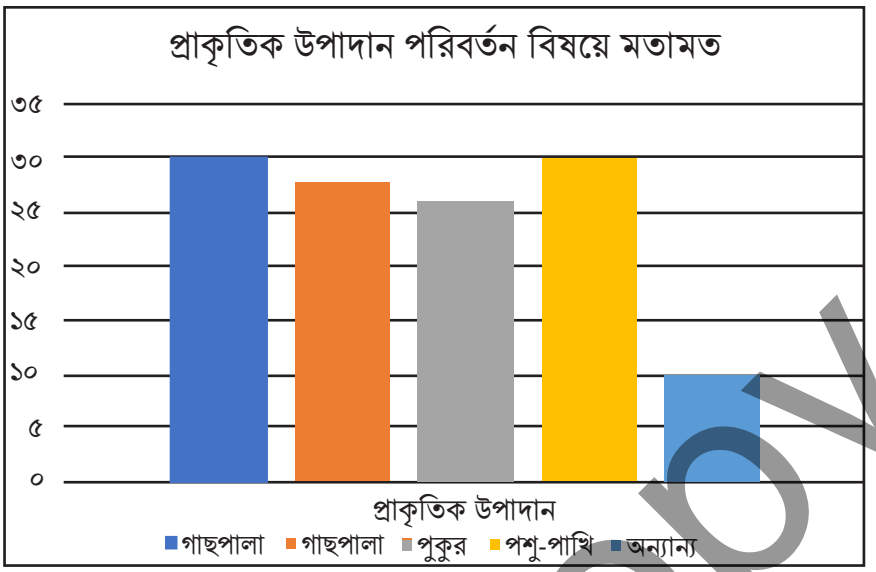
প্রাকৃতিক উপাদান পরিবর্তন বিষয়ে মতামত
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
প্রাকৃতিক উপাদান
গাছপালা
গাছপালা
পুকুর
পশু-পাখি
অন্যান্য

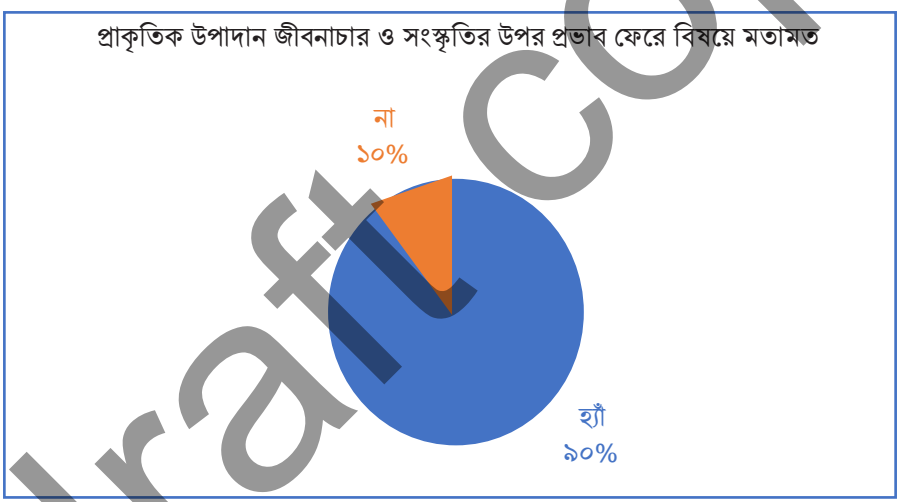
প্রাকৃতিক উপাদান জীবনাচার ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেরে বিষয়ে মতামত
না
১০%
হ্যাঁ
৯০%

draft copy

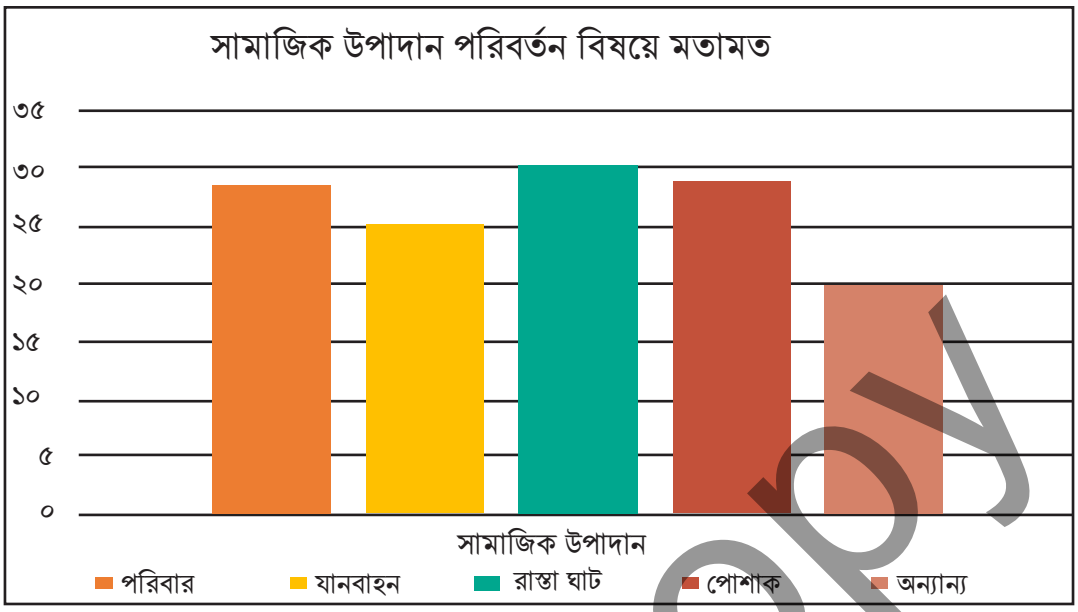
সামাজিক উপাদান পরিবর্তন বিষয়ে মতামত
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
সামাজিক উপাদান
পরিবার
যানবাহন
রাস্তা ঘাট
পোশাক
অন্যান্য

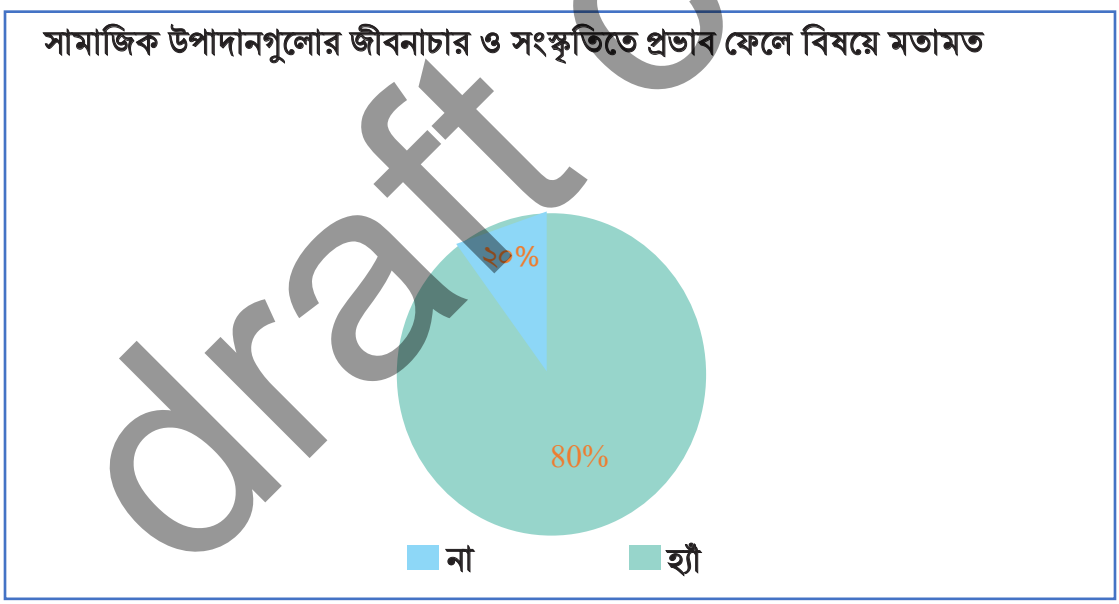
সামাজিক উপাদানগুলোর জীবনাচার ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে বিষয়ে মতামত
২০%
80%
না
হ্যাঁ

draft copy

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ: এলাকার ৩০ জন মানুষের কাছ থেকে মতামত নিয়েছি গাছপালা, পাহাড়, পুকুর, পশুপাখি সংখ্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য। সবার মতামত প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৯০%) মানুষ মনে করেন প্রাকৃতিক উপাদান এলাকার মানুষের জীবনাচার ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলছে।

তাদের মতামত এলাকার চাষাবাদ, অর্থনীতি, পূজা-পার্বন, উৎসব ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এলাকার উল্লেখযোগ্য মানুষের মতামত কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির চেয়ে মানুষ চাকরি ও ব্যবসায় বেশি ঝুঁকছে। তাই প্রাকৃতিক উপাদানের পরিমান কমছে। এভাবে প্রাকৃতিক উপাদান এলাকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। সামাজিক উপাদান হিসেবে পরিবার, যানবাহন, রাস্তাঘাট, পোশাক ও অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত নিয়েছি।

এলাকার সবাই মত প্ররকাশ করেছেন সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষ মনে করেন সামাজিক উপাদান এলাকার জীবনাচার ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। তাদের মতে রাস্তা-ঘাট ও যানবাহনের উন্নয়নের ফলে মানুষ এখন শহরের সাথে সহজে যোগাযোগ রাখতে পারছে। আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপনে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারীর সংখ্যা বাড়ছে। অনেকের মতে প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করছে। অন্যদিকে এলাকায় পরিবারের সংখ্যা গত বিশ বছরে বেড়েছে। এক দৈনিক পত্রিকার তথ্য অনুসারে এলাকায় ১৩ বছর আগে পাহাড় ধ্বসে ২টি পরিবার ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা অন্য এলাকায় বসবাস করা শুরু করে।

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত: প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন হওয়ায় এলাকার মানুষের জী মানুষের জীবনাচার, রীতি-নীতি, উৎস উদযাচন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করছে। এক্ষেত্রে ভালো ও বনযাত্রা ও সংস্কৃতি এখন বদলে গেছে। প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পরিবর্তন এলাকার খারাপ দুইরকম প্রভাবই লক্ষণীয়।

অনুসন্ধানী কাজ ১: রাজুর মতো আমরাও আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো সনাক্ত করে সেগুলোর পরিবর্তন নিয়ে এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিই। এই পরিবর্তনগুলো কিভাবে সাংস্কৃতিক

draft copy

ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দিই। কাজটি আমরা দলগতভাবে করব।

রাজু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে এই তথ্য পেল যে এলাকার সংস্কৃতি ও জীবনাচার বদলে যাচ্ছে। আগের দিনের লোকগীতি, নৃত্য ইত্যাদি এখন বিলুপ্তির পথে। তাই সে তার ক্লাসের সহপাঠীদের নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। ৪০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে ছিল পুরনো দিনের গান, লোকগীতি, নাচ, কবিতা বা প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি। তাদের এই আয়োজনে তারা এলাকার একজন প্রবীন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ করল অতিথি হিসেবে। ক্লাসের সবাই সেদিন ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়ল।

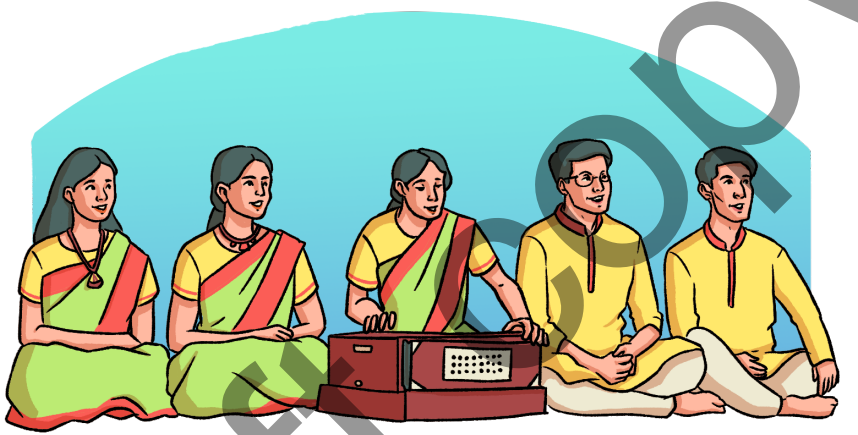

একটি ক্লাসে নবম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী শাড়ি, পাঞ্জাবী পড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান পরিবেশন করছে

অনুশীলনী কাজ ৩: আমরাও রাজুর মতো একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। সেখানে ঐতিহ্যবাহী গান, নাচ, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি পরিবেশনা রাখব। এলাকার একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করব।

draft copy

ইতিহাস জানার উপায় এবং কাল বা যুগ বিভাজনেরসমস্যা

ইতিহাস পাঠ ও অনুসন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের বিষয়। ইতিহাসের পাঠ মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। অতীত না জানলে মানুষের কোনো বর্তমান থাকে না। আর মানুষের ভবিষ্যৎ তার অতীত কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। সুতরাং অতীতে মানুষের অর্জিত নানান অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত সকল মানুষ, সমাজ, দেশ ও জাতির জন্যে অতীব জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরিরা এই পৃথিবীতে নানান চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে ছিলেন, তাদের সেইসব অভিজ্ঞতা, নানান কাজকর্ম বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের ভিত্তিতে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা ও বুঝার চেষ্টা করা হয় তখনই তা ইতিহাস হয়ে উঠে।

মানুষ লক্ষ বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তার ইতিহাস নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে জানা প্রয়োজন। আর এই ইতিহাস যিনি নিয়ম মেনে অনুসন্ধান করবেন তিনি হলেন ইতিহাসবিদ। একজন পেশাদার ইতিহাসবিদ ইতিহাস অনুসন্ধানের নিয়মতান্ত্রিক কলা-কৌশল ও পদ্ধতিগুলো নির্মোহভাবে প্রয়োগ করে ইতিহাস লিখবেন এটাই প্রত্যাশিত।

ইতিহাস অনুসন্ধান বা জানার নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন না করলে একজন মানুষ, একটি সমাজ, কোনো দেশ কিংবা জাতি দিক-ভ্রান্ত আর বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর প্রত্যাশাগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে। সেই স্বপ্ন আর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের সঠিক পথ বা আলোর দিশা খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'অপ-তথ্য' কিংবা 'কু-তথ্য' ইতিহাসে প্রাধান্য বিস্তার করবে। ইতিহাস অনুসন্ধান বা চর্চায় দেখা দেবে নানান ব্যত্যয়, ভ্রান্তি এমনকি দখলদারিত্ব। ইতিহাসের উৎসগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমালোচনামূলক অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করার মাধ্যমে এই দখলদারিত্ব চলে। ইতিহাসের পাতা জুড়ে কেবলই কোনো ভাষা, ধর্ম, রাজবংশ কিংবা রাজার গর্ব, গৌরব, মহিমা, আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা হয়। ইতিহাস চর্চা ও পাঠে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে গৌণ, উপেক্ষিত।

ইতিহাস পাঠ

৯ম শ্রেণিতে ইতিহাসের বেশ কয়েকটি পাঠ আর অনুসন্ধান সকলের জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেকে জানার জন্য, নিজের পরিবার, সমাজ, দেশ আর মানুষকে জানা ও বুঝার জন্য ইতিহাসের এই পাঠগুলো সাহায্য করতে পারে। চলো, শুরুতেই জেনে নেয়া যাক ইতিহাস অনুসন্ধানের পাঠে আমাদের জন্যে কী কী থাকছে-

- ইতিহাস জানার উপায় ও কাল বা যুগ বিভাজনের সমস্যা
- বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে
- দক্ষিণ এশিয়া: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

draft copy

- ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘বাংলাদেশ’: মানবতাবাদী ধারা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা
- ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করলেই কি ইতিহাস হয়?

ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করলেই কি ইতিহাস হয়? না, হয় না। অনেকেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মনগড়া কাহিনীকে ইতিহাস বলে চালিয়ে দেন। অনেক পেশাদার ইতিহাসবিদও নানান স্বার্থের কারণে এমন কাজ করতে পারেন। তাই কোনো একটা তথ্য, ঘটনা কিংবা কাহিনীকে ইতিহাস বলে দাবি করলেই তা ইতিহাস হয়ে যায় না। যথোপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ হাজির করে এবং সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল তা ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মাথায় ঘুরছে অনেক প্রশ্ন, অনেক চিন্তা। ইতিহাস অনুসন্ধানের উপায় জানার আগে ইতিহাস পাঠ নিয়ে দু’একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন খুশি আপা। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. রোমিলা থাপারের গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে খুশি আপা বলেন, ইতিহাসের নাম ব্যবহার করা বইয়ের পাতায় ছাপানো যেকোনো বর্ণনা কিংবা কোনো ব্যক্তি ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করে কোনো কিছু লিখলেই বা বললেই তা ইতিহাস হয় না। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা মানুষের জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনার বর্ণনা তখনই ইতিহাস হবে যখন তা রচনার সময়--

- ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে;
- উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে;
- যথাসম্ভব নির্মোহ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে; আর
- নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রেখে বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

খুশি আপার কথাগুলো শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বিষয়টি তারা আগের শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়েও খানিকটা পড়েছে। কয়েকজন ইতিহাসবিদের গবেষণা উদ্ধৃত করে খুশি আপা বলেন, আমরা আগেই জেনেছি যে, বিভিন্ন উপাদান ও উৎসের ভিত্তিতে ইতিহাস জানতে হয়। ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাদের জীবন-কাহিনি নয়, তাদের সফলতা, যুদ্ধজয় অথবা রাজত্ব বিস্তারের বিবরণ নয়। ইতিহাস হতে পারে নানান ধরনের। কোন ধরনের ইতিহাস জানা ও লেখা হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। কোন কোন ধরনের উপাদান-উৎস ইতিহাস জানার জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিহাস জানার ও লেখার জন্য সব ধরনের পক্ষপাত থেকে দূরে থাকতে হয়। যে সকল উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলো সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। সেগুলোতে কারও কোনো পক্ষপাত বা নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে কিনা, যাচাই করতে হয়।

চলো দুটো উদাহরণ থেকে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি। প্রাচীন ভারতের ৭ম শতকের সাম্রাজ্যবাদী শাসক হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত ‘হর্ষচরিত’ গ্রন্থে লেখক শাসকের এমন গুণকীর্তন করেছেন যা সত্যকে অনেকক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গেছে। এই গুণকীর্তন কিন্তু ইতিহাস নয়। গুণকীর্তনের মধ্য থেকে যেটুকু সত্য আছে তা খুঁজে বের করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল তা ইতিহাসে জায়গা পেতে পারে। ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই আর উৎসকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এই যৌক্তিক

draft copy

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১৩ শতকের শুরুর সময়ের অপর একটি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে বখতিয়ার খলজি সম্পর্কে এমন অনেক কথাই বলা হয়েছে যার চূড়ান্ত সত্যতা এখনও উদ্ঘাটন করা যায় নি। বখতিয়ার সকল ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন, বিহার ধ্বংস করেছেন কিংবা নদীয়া দখল করেছেন – এই সকল তথ্যের কোনো ভিত্তি এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নাই। 'তবকাত' অনুবাদকারী বিশিষ্ট পন্ডিত ড. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া স্পষ্ট করে বলেছেন, বখতিয়ার কোন বিহার ধ্বংস, কোন নদীয়া দখল করেছিলেন তা যেমন জানা যায় না তেমনি তিনি নগরীর সকল ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছিলেন বলে যা বলা হয়েছে তাও প্রমাণিত নয়। এগুলো সাধারণিকৃত বক্তব্য।

চলো টীকা লিখি-

খুশি আপা শিক্ষার্থীদেরকে একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করলেন। শিক্ষার্থীরা ছোটো করে দুটো টীকা লিখবে। উপরের অংশটুকু পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। টীকা লেখার সময় ইতিহাস জানা ও লেখার উপায় সম্পর্কে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাগুলো তুলে ধরবে।

১। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের সকল তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন?

২। 'তবকাত-ই-নাসিরি'-তে উল্লিখিত সব তথ্যই কি সত্য?

ইতিহাসের তথ্য-উপাত্তের নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু কেবল দু-একটি উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের সমালোচনামূলক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্ষপাতমূলক হতে বাধ্য। এটি এমনকি হতে পারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং মনে রাখবে, কেউ কোনো কিছুকে ইতিহাস বললেই তা ইতিহাস নাও হতে পারে। আমাদেরকে দেখতে ও বুঝতে হবে, কে, কখন এবং কীভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন। কোন কোন উপাদান বা উৎসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। আরো অনুধাবন করতে হবে, ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক ও নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে তা রচিত হয়েছে কিনা। মানুষের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতাকে অস্বীকার করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো একটি বস্তু, ভাষা, ধর্ম, জাতি কিংবা সমাজ-সংস্কৃতিকে 'শ্রেষ্ঠ' ঘোষণা করার মাধ্যমে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে কিনা তা গভীর অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

ইতিহাস মানুষের অতীত কর্মকান্ডের গবেষণাভিত্তিক, সমালোচনামূলক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। সবসময় এই কথাগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আমরা এখন সবাই জানি যে, ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, গবেষণা করেন তাদের ইতিহাসবিদ বলে। সে হিসেবে আমরাও একেকজন খুদে ইতিহাসবিদ। একদিন আমাদের মধ্য থেকে অনেকে নিশ্চয়ই বড় ইতিহাসবিদ হবো। বড় ইতিহাসবিদ হওয়া অনেক সাধনার ব্যাপার। কারণ বড় ইতিহাসবিদ হতে গেলে যে সময়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চাই সে সময়কাল এবং অনুসন্ধানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অতীত সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন ধরণের উৎস ব্যবহার করতে হয়। আগের শ্রেণিগুলোতে নানান উৎস কিংবা উপাদানের বর্ণনা পড়েছি এবং আমরা সেগুলোর ছবিও দেখেছি। প্রস্তর যুগ, তাম্রপ্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত মানুষের তৈরি এবং ব্যবহৃত সকল সামগ্রীই ইতিহাসের অতি মূল্যবান উৎস বা উপাদান। কোনো একটি স্থানে বসতি স্থাপনকারী একদল মানুষের কালানুক্রমিক ইতিহাস অধ্যয়নকালে তাদের ব্যবহৃত বিচিত্র সব সামগ্রী হতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলীর সমালোচনামূলক অনুসন্ধান করতে হয় অতি সতর্কতার সাথে। একজন ইতিহাসবিদের

draft copy

জন্য তথ্য ব্যবহারের কলা-কৌশল ও পদ্ধতি জানা সবচাইতে জরুরি। তা না হলে তিনি ইতিহাসের যেকোনো বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টানতে ব্যর্থ হবেন। ইতিহাস পর্যবসিত হবে মনগড়া কল্প-কাহিনী বা রূপকথায়।

স্থান ও কালের ভিন্নতায় ইতিহাসের ভিন্নতা: দেশ, কাল ও যুগ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস জানা, বুঝা ও লেখার উপায় অর্থাৎ কলা-কৌশল ও পদ্ধতিগত দিকগুলো নিয়ে চলো সংক্ষেপে আলোচনা করে সহজভাবে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করি।

স্থান ও কাল নির্ধারণ: ইতিহাস চর্চায় যথাযথভাবে স্থান ও কাল নির্ধারণ করা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস নানান সময়ে নানান রকম হয়। আবার একটি স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে অন্য অনেক স্থানের ঘটনা যুক্ত থাকে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার ব্যাখ্যা করলেও তা পূর্ণতা পায় না। তাই স্থান এবং কাল বিষয়ে ইতিহাসবিদকে সচেতন থাকতে হয়।

দরবারি ইতিহাসচর্চার অসুবিধা বা সমস্যা: ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎসের স্বল্পতা একটি প্রধান সমস্যা। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বাংলার ক্ষেত্রে যেসব লিখিত উৎস পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নানান পর্যটক এবং রাজ-দরবারে বসে লেখা। এইসব লেখায় রাজাদের গুণকীর্তন বেশি থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কথা খুব কমই জানা যায়। আর এই রাজা-বাদশাদের গুণকীর্তনকেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবেই চলেছে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। এরপর ব্রিটিশদের হাতে যে ইতিহাসচর্চা হয়েছে সেখানেও ঔপনিবেশিক স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যায়। তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় আর রাজাদের ধন-দৌলত অর্জনকে মানুষের অর্জন হিসেবে দেখিয়ে মিথ্যে "গৌরব" প্রচারের চেষ্টা করা রয়েছে। ইতিহাসের পাঠক ও লেখকদের তাই খুব সাবধানে উৎস নির্বাচন করে নানানভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক ইতিহাস খুঁজে বের করতে হয়।

প্রতিবেদন রচনা ও দলীয় উপস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে খুশি আপা কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর যুগ বা কাল বিভাজনের সমস্যা সম্পর্কে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। এরপর সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে প্রতিটি দল একটি করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করবে। প্রতিবেদনে প্রতিটি দল ইতিহাস রচনায় যুগ বা কাল বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যাবলী তুলে ধরবে। একই সাথে বাংলার ইতিহাসে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানা ও লেখার জন্যে কেমন যুগ বিভাজন করা যেতে পারে তা প্রস্তাব করবে।

প্রতিটি দল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের উপস্থিতিতে দলীয় উপস্থাপনা প্রদান করবে। উপস্থাপনার সময় দলের পক্ষ

নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি: ইতিহাসের আরেকটি জরুরি বিষয় হচ্ছে ইতিহাসবিদের নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাস লিখতে বসে ইতিহাসবিদ যদি কোন বিশেষ ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক শক্তির পক্ষ গ্রহণ করে ফেলেন তবে সেই ইতিহাস আর নিরপেক্ষ থাকে না। সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সকল ভাষা, জনপদ, জনজাতি তথা মানুষের কণ্ঠস্বর হতে হয় ইতিহাসকে। বিশেষ কোন গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম বা অর্থনৈতিক গৌরব আর মহিমাকে তুলে ধরার কাজ ইতিহাসের নয়।

draft copy

সাধারণিকরণের সমস্যা: ইতিহাসে সাধারণিকরণের সমস্যা সবচাইতে প্রকট। একজন ইতিহাসবিদ বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে অতীত পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করেন। বর্তমানের নানান প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ধ্যান-ধারণা আর ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি তাঁর অনুসন্ধানকে নানান মাত্রায় প্রভাবিত করে। ক্ষেত্র বিশেষে দখলও করে। স্থানিক এবং কালিক মানদণ্ডের কোনো তোয়াক্কা না করে ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন সব নাম-পরিচয় (যেমন- বঙ্গ, বাঙলা, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা, ভারতবর্ষ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয় যা কোনো দিক থেকেই যৌক্তিক অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ নাম-পরিচয়গুলোর প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিতের কোনো উল্লেখ থাকে না। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন বাঙলা কিংবা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে গিয়ে অনেক সময় বর্তমান বাংলাদেশ কিংবা বর্তমান ভারতকে বুঝানো হয়। প্রতিটি ধর্মের যে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপ রয়েছে তার যথাযথ প্রতিফলন ইতিহাসের গবেষণায় থাকা একান্ত দরকার। ইতিহাসের কোনো বয়ানে ভাষা ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো মানুষকেই ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ ইতিহাসে নেই। কাউকে হেয় করে কোনো মন্তব্য করাটা ইতিহাসের সরাসরি ব্যত্যয়।

বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে অস্বীকার করতে গিয়েই আমরা ইতিহাসে সাধারণিকরণের সংকটে পড়ি। এই সংকট থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বের হতে হবে।

পরিচয়, পেশা, শ্রেণি, শিক্ষা, কাজের ধরন, পোশাক, কথা বলা, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো কারণেই কাউকে আলাদা মনে করা ঠিক নয়। কারণ, একটা বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, ভিন্নতা আছে বলেই আমাদের পৃথিবীটা এতো সুন্দর। একবার ভেবে দেখি, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ভিন্ন গাছ না থেকে যদি শুধু এক প্রকারের গাছ থাকতো তবে কি পৃথিবী এখনকার মতো এতো সুন্দর লাগতো? তাই ভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যকে আমাদের সবসময় সমান চোখে নিজেদের মতো করেই দেখতে হবে। আমাদের আজকের সমাজে হয়তো এর চর্চা পুরোপুরিভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা জানি, আমাদের হাত ধরেই বৈচিত্র্যকে বরণ করে নেয়ার সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের দেশে এবং দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর সবখানে চালু হবে।

draft copy

ভারতীয় উপমহাদেশ, বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস এবং ইতিহাসের কালবিভাজন

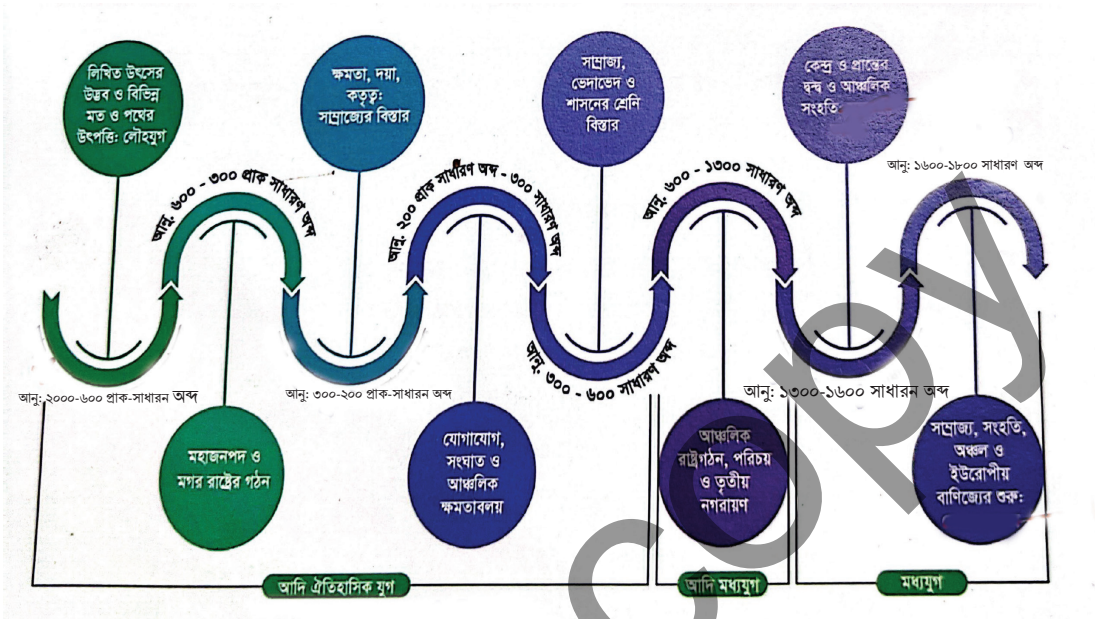

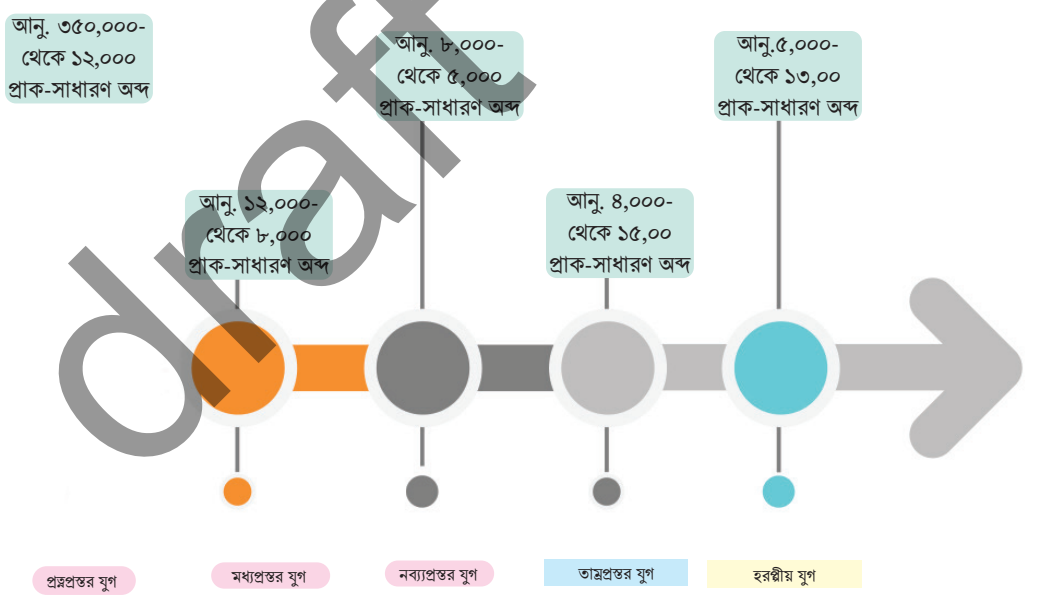

draft copy

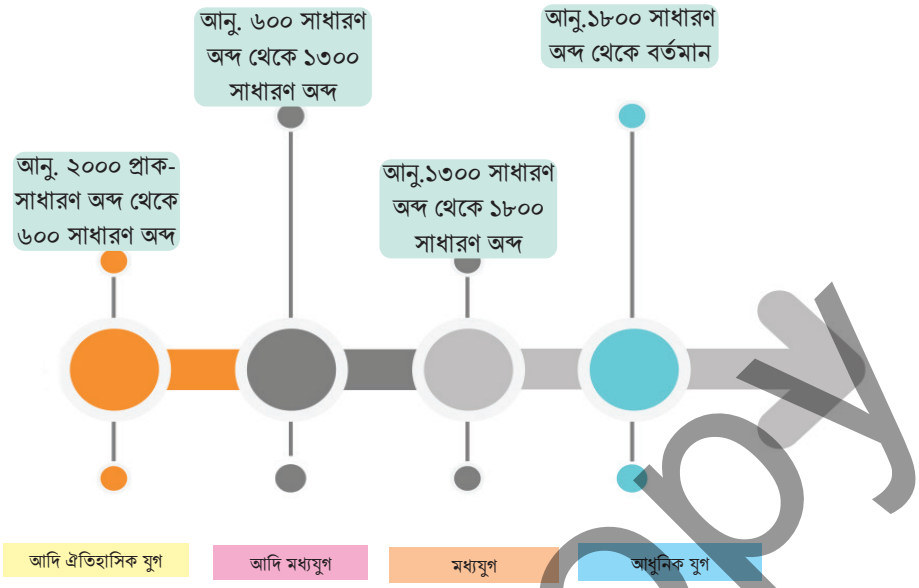

ইতিহাসে যুগ বা কাল বিভাজনের সমস্যা: ইতিহাসের যেকোনো আলোচনায় যুগ বা কাল বিভাজন বা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগ বা কাল বিভাজনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে একাধিক সময় কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত করা হয়। তোমরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে জেনেছ যে, ভারতীয় উপমহাদেশ বা এর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করে পড়ানো হয় - প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। ইউরোপের ইতিহাসেও এরকম কালবিভাজন রয়েছে। কালবিভাজন করা হয় মূলত এমন কোন ঐতিহাসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিস্থিতির ভিত্তিতে যা কিনা একটি ভূ-খণ্ডের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে যুগান্তকারী কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তরকে ইঙ্গিত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের যত অর্জন, পরিবর্তন বা রুপান্তর সেটি সব অঞ্চলে একই সময়ে হয়নি। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা ঘটেছে। তাই ইতিহাসের কাল বিভাজনও ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য।

লিখিত উৎস বা উপাদান প্রাপ্তি এবং তার পাঠোদ্ধারের ভিত্তিতে ‘ঐতিহাসিক যুগ’ শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। লিপি আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময় ‘প্রাগৈতিহাসিক কাল’ বা যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগকে কেউ কেউ সেই সময়ের রাজা বা শাসকদের নামে কিংবা তাদের বংশের নামে ডাকেন। কেউ বলেন, রাজাদের বংশের নামে যুগের নাম না হয়ে এমন কোনো নাম হোক, যা সকল মানুষের ইতিহাসের কথা বলবে। তাই মৌর্য বংশের নামে মৌর্য যুগ, গুপ্ত রাজবংশের নামে গুপ্ত যুগ, পাল রাজবংশের নামে পাল যুগ, সুলতানদের শাসনকালকে সুলতানি আমল, মোগল রাজবংশের শাসনামলকে মোগল যুগ ডাকার পরিবর্তে অনেকেই প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও ব্রিটিশযুগ বা আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। সাধারণভাবে ভারতবর্ষ ও বাংলা অঞ্চলের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের আলাপে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ যুগ বলার নামে প্রকারান্তরে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলিম যুগ ও আধুনিক যুগ-কেই বোঝানো হয়ে থাকে। প্রথম

draft copy

দুটি যুগ বিভাজন ধর্মের নামে করা হলেও ব্রিটিশরা নিজেদের সময়কে খ্রিস্টান যুগ না বলে আধুনিক যুগ বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং তোমরা অনুধাবন করতে পারছ যে, কাল বা যুগ বিভাজন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের কাল বিভাজন দিয়ে অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কাল বিভাজন বা নির্ধারণ করা একেবারেই ইতিহাসসম্মত নয়, যৌক্তিকও নয়।

জেনে রাখা ভালো

জেমস মিল। একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ। ১৮১৭ সালে তিনি লিখেছিলেন 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'। এই গ্রন্থেই তিনি প্রথমবার হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ, মুসলিমযুগ ইত্যাদি কাল বিভাজন ব্যবহার করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নিজেদের সময়কে তিনি খ্রিস্টানযুগ না বলে লিখেন ব্রিটিশযুগ। রোমিলা থাপার স্পষ্ট করে বলেন, কাল বিভাজন নিয়ে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশদেরই সৃষ্টি। ভারত এবং বাংলাদেশের একশ্রেণীর ইতিহাসবিদ এখনও এই কাল বিভাজন অনুসরণ করেই ইতিহাস চর্চা করেন যা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নয়, ইতিহাসসম্মত একেবারেই নয়।

যুগ বিভাজন চিরন্তন কোনো জ্ঞান নয়। বাংলা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির আলাপে প্রায়শই সাধারণ অব্দ ত্রয়োদশ বা ১৩ শতক পর্যন্ত প্রাচীন যুগ এবং ১৩ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগ বলে চালানো হয়। এরপর ব্রিটিশদের স্বঘোষিত আধুনিক যুগ। ভারত এবং বাংলার ইতিহাসে সাধারণ অব্দ ১২০৪, ১৭৫৭ এবং ১৯৪৭ সালকে কাল বিভাজনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এই কাল বিভাজনের প্রধান কারণ রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। কিন্তু তোমরা জেনে রাখবে, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি আর রাজনীতি এক নয় এবং এগুলো একরৈখিক গতিতে চলেও না। অর্থনৈতিক ইতিহাসের কাল বিভাজন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কাল বিভাজন তাই কখনই এক হতে পারে না। একটি ভূ-খণ্ডের মানুষের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ইতিহাসের ধরন ও ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। কাল বিভাজন বা নির্ধারণও তাই আলাদা হতে বাধ্য। তোমাদেরকে সব সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেকোনো যুগের শুরু ও শেষ কিন্তু সব স্থানে এক নয়। ইতিহাস যারা জানার চেষ্টা করেন তারা নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগের শুরু ও শেষও নতুন করে চিন্তা করার কথা বলেন। অন্য সকল বিষয়ের মতন ইতিহাস লেখাও বদলাতে থাকে। আমরা যদি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ও রূপান্তরের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এমতাবস্থায় একটি অঞ্চলে শতকের হিসেবে যুগ বা কাল নির্ধারণের মাধ্যমে ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

যাহোক, কেবল রাজনৈতিক অথবা কোনো বিশেষ ভাষা বা জাতিকে গুরুত্ব দিয়ে কাল বিভাজন কিংবা অনেক সময় ধর্মের মহত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কালক্রম নির্ধারণ করা সঠিক নয়। একই কারণে 'হিন্দু যুগ', 'বৌদ্ধ যুগ', 'মুসলিম যুগ'-এর নামে কাল বিভাজন ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য নয়। পৃথিবীতে মানুষের কয়েক লক্ষ ধর্ম-বিশ্বাস রয়েছে। প্রতিটি ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে আবার নানান ধারা-উপধারা এবং ভিন্ন ভিন্ন তরীকা। মূল কথা হলো, মানুষকে মুখ্য না করে ধর্ম অথবা ভাষা অথবা কোনো জাতিগোষ্ঠীর কৃতিত্বের মহিমা-কীর্তনের নামে যে কাল বা যুগ বিভাজন করা হয় তা প্রকৃত ইতিহাস নির্মাণ করতে পারে না, বরং তা কোনো গোষ্ঠী, ভাষা বা ধর্মকে নিয়ে অপ-রাজনীতি করারই নামান্তর।

তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যে, যীশু খ্রীষ্টের জন্মসালকে ভিত্তি বছর ধরে এর পূর্বের সময়কালকে বলা হয়েছে খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং পরের সময়কাল পরিচিতি পেয়েছে খ্রীষ্টাব্দ নামে। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ ইতিহাসের কাল বা যুগ বিভাজনকে কোন বিশেষ ধর্মের প্রভাব থেকে বের করে এনে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি প্রদানের জন্য ভিত্তিসাল

draft copy

শূণ্যকে সাধারণ সাল (অব্দ) ধরে নতুন কালক্রমের ধারণা চালু করেছেন। একারণেই খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হয়েছে সাধারণ পূর্বাব্দ বা প্রাক-সাধারণ অব্দ এবং খ্রীষ্টাব্দ হয়েছে সাধারণ অব্দ। মজার ব্যাপার হলো, যীশুখ্রিষ্টের জন্মসালকে ভিত্তি ধরেই কিন্তু তথাকথিত এই নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

উপরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে যখন ইতিহাস চর্চা করা হয় তখনই কেবল ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য, নৈর্ব্যক্তিক এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান ও চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান কাজ হলো, উৎস বা উপাদানগুলোকে নানানভাবে প্রশ্ন করা, উৎসের স্রষ্টা, বিষয়বস্তু, রচনার সময়কাল ও উদ্দেশ্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং উৎসে প্রাপ্ত সকল তথ্য সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস অনুসন্ধান করতে পারা একজন পেশাদার ইতিহাসবিদের প্রধানতম যোগ্যতা।

অনুসন্ধানী কাজ

ইতিহাস জানার ও লেখার পদ্ধতিগত বিষয় সম্পর্কে আমরা জানলাম। ইতিহাসে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকতে হবে নিচের ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো আবারও অনুসন্ধান ও অনুধাবন করি-

প্রথমত	
দ্বিতীয়ত	
তৃতীয়ত	
চতুর্থত	

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের অংশ হিসেবে আমরা নতুন নতুন অনেক কিছুই শিখছি। এসব শিখতে গিয়ে পুরোনো দিনের অনেক বিষয় এবং তথ্য জানতে পেরে নিশ্চয়ই অনেক অবাকও হচ্ছি! অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ বড় বড় শিক্ষাবিদ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, তারাও ইতিহাস পড়তে গিয়ে, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ঠিক আমাদের মতোই অবাক হন। কেন অবাক হন জানো? কারণ, আমরা প্রত্যেকেই বাস করি নিজ নিজ সময়ে, বর্তমানে। আর বর্তমানে থেকে যখন অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে যাই তখন দেখা যায়, এখনকার অনেক কিছুর সাথেই অতীতের কোনো মিল নেই। একই বিষয় বা ধারণা অতীতে ছিল এক রকম আর পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় অন্যরকম। বর্তমানে বসে অতীত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাই একজন ইতিহাসবিদকে বেশ বেগ পেতে হয়।

একটু গোলমেলে ঠেকছে, তাই না? একটা উদাহরণ দিয়ে বললেই খুব সহজে বুঝতে পারবে। আমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'বিদেশী' বলতে কী বুঝায়? আমরা চোখ বন্ধ করে বলবো, বিদেশী হলো তারাই যারা আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে থেকে এই দেশে এসেছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে যদি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো 'বিদেশী' কে? তাহলে তিনি কী বলতেন জানো? তিনি বলতেন, অপরিচিত কোনো

draft copy

ব্যক্তি যে আমাদের গ্রামে বা অঞ্চলে থাকে না, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ নয়, তিনি বা তারাই বিদেশী। আবার ধরো, আমরা যে বললাম বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আসবেন তারাই বিদেশী। এখন এই বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝি, তা কি প্রাচীনকালে একই রকম ছিল? না, ছিল না। একেক সময়ে বাংলা অঞ্চল ছিল একেক রকম। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে অঞ্চল বা দেশের সীমানা পাল্টে গেছে, বদলে গেছে মানচিত্র। মানচিত্রের কথা যখন এলোই, চলো প্রাচীন বাংলার একটা মানচিত্র দেখে আসি। এই যিনি মানচিত্র তৈরী করেন তাকে মানচিত্রকার বা Cartographer বলা হয়।

এই যে দেশী, বিদেশী, স্থানীয়, বহিরাগত ইত্যাদি শব্দ বইয়ের পাতায় আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি, এগুলো দিয়ে আমরা আসলে কী বুঝাই? পৃথিবীর বুকে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠার পূর্বের যেকোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনায় এই শব্দগুলোর রাজনৈতিক অপ-ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। কেউ দেশী, কেউ বিদেশী, কেউ বা স্থানীয় আর কেউ বা কেনো বহিরাগত হবেন? কোনো একটি ভূ-খণ্ডে সকলেই তো হতে পারেন বসতি স্থাপনকারী।

স্থান ও কালের ভিন্নতায় ইতিহাসের ভিন্নতা হতে বাধ্য। সময়ের সাথে সাথে সম্পর্ক, চিন্তারও বদল হয়। আর এই বদলে যাওয়াটা ভাষা, শব্দ, সংস্কৃতি, অভ্যেস, জীবন-যাপন থেকে শুরু করে সবকিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কথা হলো এই বদলে যাওয়ার সাথে আমাদের আজকের পাঠের সম্পর্ক কোথায়? আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম 'ইতিহাস জানা যায় কীভাবে'? শিরোনাম পড়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছো যে, আদি ঐতিহাসিক কাল, আদি মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলা অঞ্চলে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কেমন ছিল, একে অপরের সাথে বা এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গার মানুষের সাথে কীভাবে মিশতো এবং এই মিশতে গিয়ে কী কী নতুন ধারণা বা বিষয়ের সাথে পরিচিত এবং অভ্যস্থ হতো, সেসবের যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য বয়ান ইতিহাসে কীভাবে স্থান পেতে পারে তা নিয়েই আমাদের আলাপ। আর এই আলাপের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে বদলে যাওয়া ইতিহাস, সংস্কৃতি, মিশ্রণ এবং নতুন ধারণার উৎপত্তির বয়ান তৈরি হয় কীভাবে? এই বয়ান কারা তৈরি করেন? কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি বয়ান তৈরির পেছনে কি কোনো অপ-রাজনীতি কাজ করে? ইতিহাস জানার উপায় নিয়ে আমাদের এই চলমান আলাপের প্রধান কারণ হলো, যেকোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য, অপ-তথ্য কিংবা কু-তথ্য থেকে সতর্ক থাকতে এবং সঠিক তথ্য খুঁজে বের করতে শেখা। ইতিহাসে কীভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তা অনুধাবন করতে পারাও এই আলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অপ-তথ্য আর কু-তথ্যের কবলে ইতিহাস: আন্তর্জালিক দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে ইতিহাস এক নতুন সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। ডিজিটাল এবং স্মার্ট বাংলাদেশে ইতিহাসের অনেক উৎস বা উপাদান বা তথ্য এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে সংগ্রহ করতে হয়। অনেক সময় উৎসগুলো অসৎ উদ্দেশ্যে বিকৃত করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া হয়। ইতিহাসের উৎস এবং তথ্যগুলো অপ-ব্যবহারের বিপদের মুখে পড়ে। অপ-তথ্য কিংবা কু-তথ্য সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা তাই আমাদের সকলের জন্য খুবই জরুরি।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,,আমাদের সমাজ নতুন এক বিশে^র সাথে পরিচিত হচ্ছে। ক্রমশই ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করছে মানুষ। এর ইতিবাচক দিক হচ্ছে- যোগাযোগ, প্রযুক্তি, মত প্রকাশ, জ্ঞান আহরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, উৎপাদন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল বিপ্লব শুরু হয়েছে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, তথ্য-প্রযুক্তির নানামাত্রিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝতে পারলেও নাগরিকরা

draft copy

প্রস্তুতি সহকারে ও নিয়ম মেনে চর্চার ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে আছেন। টেলিফোন হয়ে সমাজ সেলফোনের জগতে প্রবেশ করেছ,ে পরে স্মার্ট ফোন ও সর্বস্তরে ইন্টারনেট এসে সর্বব্যাপী যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ও সামাজিক যোগাযোগের গতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে স্বাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-গরিব প্রায় সবাই এর ব্যবহার করছেন।

ইতোমধ্যে-

- দেশে অনলাইন বিপ্লব ঘটে গেছে।
- নবীন-প্রবীণ, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে সেলফোন ও স্মার্টফোন।
- অনেকের কাছেই আছে কম্পিউটার-ল্যাপটপ-ট্যাব।
- নিরক্ষর মানুষও এখন এই প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক ডিজিটাল ল্যাব তৈরি হয়েছে।
- অনলাইনে যুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি।
- প্রায় পাঁচকোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত।

তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার, অন্যদের সাথে যোগাযোগ কিংবা অনুভূতি আদান প্রদান করতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া। এটি এমন তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম যেখানে এর ব্যবহারকারীরা মিলে ভার্চুয়াল কমিউনিটি (আর্ন্তজালকি সম্প্রদায়) বা অনলাইন সমাজ গড়ে তোলেন। অনলাইন বা ইন্টারনেট সংযোগ নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়াগুলোও বিভিন্ন ধরনের। কোনটি ওয়েবসাইট নির্ভর, কোনটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নির্ভর। সোশ্যাল মিডিয়ার মূল কনসেপ্ট হল শেয়ারিং। শেয়ার করার কারণে তা দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

আমরা অনেকেই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানি না। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতিও আমাদরে নেই। ফলে বিভিন্ন সময় কেউ কেউ কু-তথ্য, গুজব, ভুল-তথ্য, কূট-তথ্য ও মিথ্যা ছড়িয়ে সমাজে চিরায়ত ঐক্য, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিনষ্ট করছে। ক-ুতথ্য ছড়ানোর কারণে মানুষের মধ্যে একমাত্র আত্ম-পরিচয় (ওফবহঃরঃু) বা একপাক্ষিক মনস্তত্ত্বi তৈরি হয় বলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। এ পরিস্থিতিকে সুস্থ-স্বাভাবিক বলা চলে না। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির। রাষ্ট্র হবে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। সামাজিক মাধ্যমে অপ-তথ্য বা ক-ুতথ্য মানুষের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কেবল নিজ-জাতি, নিজ-বর্ণ, নিজ-ধর্ম, নিজ ধর্মের মধ্যে নিজ-ধারার আলোকে সব কিছু বিচার করার প্রবণতা বাড়াচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রযুক্তির বদৌলতে পাওয়া মত প্রকাশের এই সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহার হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধহীন, গণতন্ত্রবিরোধী, বিভেদকামী ব্যক্তি ও গ্রুপগুলোর স্বার্থ হাসিলের বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে কু-তথ্যের উপস্থিতির কারণে বহু মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

draft copy

যে কোনো নতুন নিয়মের মতো ভার্চুয়াল মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইচ্ছার সাথে এর পদ্ধতি ও ব্যবহারিক নিয়ম-কানুন জানা বোঝা ও সক্ষমতা প্রয়োজন। দরকার নৈতিকতার চর্চা। ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার সম্পর্কে মনোজগতে ইতিবাচক চিন্তা দরকার। সমাজ আর আগের মতো নেই, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই পুরোনো ধারণা, সংস্কার ও নিয়মের রূপান্তর জরুরি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময় ও চর্চার মাধ্যমে চিন্তার ইতিবাচক রূপান্তর করা সম্ভব।

এর জন্য দেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণ দরকার। বিশেষ করে যুবসমাজের সক্রিয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারাই সকল ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোক্তা ও কর্মী। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, আটষট্টি-উনত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ের গণতন্ত্রের সংগ্রামে তারা অগ্রনায়ক। সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগে তারাই সবার আগে এগিয়ে আসে ও কাজ করে। যুবরাই নতুন ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ছড়িয়ে দেয়। তারাই সমাজের শক্তি। আজও তারা নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিষ্কার এবং তথ্যপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে এগিয়ে আছে। খেলাধুলা, বিতর্ক ও গণিতসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তারা সক্রিয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনছেন।

কু-তথ্য প্রতিরোধে তাই আজ শিক্ষার্থীদেরকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নয়, কু-তথ্যের বদলে সঠিক বা সু-তথ্য প্রচারের দায়িত্ব নিতে হবে। পশ্চাদপদতা থেকে সমাজকে বাঁচাতে এবং বিভেদ, বৈষম্য, দূরত্ব ঘুচাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিপরীতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন তথ্য যাচাই বাছাই ছাড়া শেয়ার বা পোস্ট করা যাবে না। কোন ঘটনা শেয়ার করার আগে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা-বোঝা বা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এজন্য যুবদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের অনেক কিছু করার আছে। এসব ক্ষেত্রে দেশের নীতিনির্ধারক, সরকার, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি এবং গণমাধ্যমের সর্বাত্মক ও ইতিবাচক সহায়তা ও উদ্যোগ দরকার।

১। অপ-তথ্য কিংবা কু-তথ্য প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হতে পারে?

২। পোস্টার প্রদর্শনী

৩। বিতর্ক

৪। দেয়াল পত্রিকা

draft copy

বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করবো আজ আমরা। দীর্ঘ এই আলাপের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করবো কীভাবে রাষ্ট্র নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছে, কী ধরণের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। আমরা আরও দেখার চেষ্টা করবো, রাষ্ট্র ও শাসক শ্রেণির সঙ্গে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং কী ধরণের প্রতিকূলতা ও সুবিধা মানুষ মোকাবেলা ও গ্রহণ করেছে।

বাংলা অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব- এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুসন্ধান করবো। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই তোমরা দেখতে পাবে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের রাজ্য, এখনকার রাষ্ট্র- এগুলো গড়ে উঠেছিল মানুষের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেবার নামে। রাজা-বাদশাহদের উদ্ভব হয়েছে ইতিহাসের আদিতে সমষ্টিগতভাবে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় আমরা দেখবো, সম্পদ দখল আর নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন বেশিরভাগ শাসক। মানুষের মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যপর্বে মানুষের উপরেই তারা দখলদারিত্ব চালিয়েছেন। মানুষকে রক্ষার পরিবর্তে করেছেন অনিষ্ট। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে রাজনৈতিক বিপর্য ও নানান প্রতিকূলতার রূঢ় বাস্তবতা। সকল অন্যায় শষন আর অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ বিপ্লব করেছে, বিদ্রোহ করেছে। সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সেইসব বিপ্লব আর বিদ্রোহে জনমানুষের অনেক নেতাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। বহুদূরের ভূখন্ড থেকে আগত শাসক আর শোষকের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করেছেন। হাজার বছরে গড়ে ওঠা রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের হাত ধরেই এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের জীবন পর্যন্ত তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছেন। বাঙলা অঞ্চলে হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নানান উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাঙলা অঞ্চলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ এবং দৃষ্টান্তমূলক এই ঘটনার যিনি রূপকার তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্নভাবে রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা আর রাজ্যের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সম্রাট, রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব উপাধীধারীরা ছিলেন অভিজাত এবং নিজেদের নাম, যশ, খ্যাতি, আর গৌরব প্রচারে ব্যতিব্যস্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চাভিলাষী অভিজাত যোদ্ধাদের অনেকেই বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন, ভূখন্ড ও সম্পদ দখল করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য না দিয়ে তাদের ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি এখানকার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন মৌর্য রাজা, গুপ্ত রাজা, সেন রাজা, খলজী রাজা, হোসেন শাহ সুলতান, নবাব মুর্শিদ কুলী খান, বৃটিশ এবং পাকিস্তানি শাসক। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বাংলা অঞ্চলের কাদা-মাটি, নদী-নালা, বিল, হাওর-বাওর, বৃষ্টি আর সবুজের ভেতর দিয়ে উঠে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলার ইতিহাসে এই ভূ-খন্ড থেকে উঠে আসা আর কোনো নেতা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যে, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে জীবন বাজি রেখে কাজ করেন নি। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান শেখ মুজিবই সর্বপ্রথম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সফল

draft copy

হয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি কীভাবে নতুন নতুন রাজশক্তি, জনধারা, নতুন নতুন ভাষা ও ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষ এসে বাংলা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে তার কিছুটা ধারণা তোমরা পেয়েছো। দখলদারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে অনেকেই অবশ্য প্রতিরোধের মুখে পরেছে। এই সব অভিজাত উচ্চাকাংখী মানুষের অনেক বাঁধার মুখেও এখানকার সকল মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার বছর যাবত মিলে-মিশে জীবন কাটিয়ে চলেছে। অনেক বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে সাধারণ মানুষ নিজের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি নির্মাণ করেছে।

অনুশীলনী

বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বহু দূরের ভূখন্ড থেকে আগত উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা আর শাসকেরাও বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রাজক্ষমতা দখল করে মানুষের সম্পদ লুটে নিয়েছে। ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন করেছে। আবার দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও ইতিহাসের একেক পর্বে একেক রকমের শাসক ও শোষক শ্রেণির দেখা পাওয়া যায়। চলো আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধানের শুরুতেই আমাদের বিদ্যমান জ্ঞান ও জানাশোনার আলোকে বিভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থা, ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী শাসকদের নাম ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে লিখে রাখি। নতুন এই অধ্যায়গুলো পাঠের পর আরও যেসব নতুন তথ্য জানতে পারবো তার সাথে এই তথ্যগুলো মিলিয়ে নেবো।

বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ

দক্ষিণ এশিয়া

বিশ্ব

---

draft copy

বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন জনপদঃ রাজনীতির সূচনা

নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের, প্রাগৈতিহাসিককালে মানুষের জীবন ছিল গোত্রভিত্তিক। একেবারে প্রথমদিকে গোত্রগুলো গড়ে উঠেছিল ছোট আকারে। হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় একদিকে গোত্রগুলো বড় হতে থাকে, অন্যদিকে কৃষির আবিষ্কারের পর কৃষিজমি, চারণভূমি ও অরণ্যভাগের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত হতে থাকে। কখনও সংঘাত থেকে বাঁচার জন্যে কোন একটি শাক্তিশালী গোত্রের নেতাকে নিজেদের সেনাপতি হিসেবে মেনে নিয়ে অন্যান্য গোত্রগুলোও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। এইভাবেই ধীরে ধীরে এককেটি অঞ্চলে এক বা একাধিক জনধারার মানুষ নিয়ে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে আজ থেকে দুই-তিন হাজার বছর আগে একক ও ঐক্যবদ্ধ কোন রাজ্য বা রাষ্ট্র ছিল না। ছোট ছোট অনেকগুলো ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একক ছিল। এগুলোকে বলা হয় জনপদ। জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমনের বহু আগেই। প্রাচীনকালে লিখিত বৌদ্ধ ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা যেকটি জনপদের নাম জানতে পারি তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটির পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

draft copy

বঙ্গ

বঙ নামক কোন একটি কৌম বা জনগোষ্ঠীর হাত ধরে বঙ্গ জনপদের জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। এই শব্দের অর্থ 'জলাভূমি' বা 'কাপাস তুলা'। তবে বাংলার মতো জল-কাদা ও জঙ্গলের ভূ-খন্ডে মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ে এই জনগোষ্ঠী বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। মহাকবি কালিদাসের লেখা থেকে জানা যায়, নৌযুদ্ধে বঙ্গীয়েরা ছিল খুবই দক্ষ। বাংলার জলভিত্তিক সক্রিয় ব-দ্বীপ এলাকা তথা, বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা-ফরিদপুরের বৃহত্তর এলাকায় প্রাচীন বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল। এর সীমানা কখনো কখনো পশ্চিমদিকেও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রধান অংশটি অতীতের বিভিন্ন কালপর্বে বঙ্গ-এর আওতাভুক্ত ছিল।

পুন্ড্র

পুন্ড্র বাংলার আরেকটি প্রাচীনতম জনপদ। পুন্ড্র নামের একটি জনগোষ্ঠীর থেকেই এই জনপদের উৎপত্তি। এই জনপদের কেন্দ্র ছিল পুন্ড্রনগর। এই পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে প্রাপ্ত প্রত্নস্থল বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। পুন্ড্র জনপদেরই একটি অংশের নাম প্রাচীনকালে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিল। তোমরা জেনে আনন্দ পাবে যে, প্রাচীনকালে এই পুন্ড্র শব্দটির অর্থ ছিল ইক্ষু বা আঁখ।

রাঢ়

বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের এক বিস্তৃত জনপদ হিসেবে ছিল এর অবস্থান। দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল। এই রাঢ়েই আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বছর পূর্বে তাম্র-প্রস্তর যুগের সূচনা ঘটেছিল। অজয় নদের তীরে পান্ডু রাজার ঢিবি নামে পরিচিত স্থানে বাংলার আদি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি রচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার রাঢ় এলাকাতেই আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে তাম্রলিপ্তি নামে একটি নৌ এবং সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছিল। বাংলার সবচাইতে পুরানো এই বন্দর ধরে বাংলার শস্য, বস্ত্র, সুগন্ধি মশলা গ্রিস সহ বর্তমান ইউরোপের নানান স্থানে রপ্তানি হতো।

সমতট

সমতট ছিল বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের জনপদ। মেঘনা নদীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম এবং ভারতের ত্রিপুরার প্রধান অংশ নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) নামে একজন চৈনিক পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র। এখানে তিনি অনেক স্থাপনা দেখেছিলেন। এই স্থাপনাগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারগুলোতে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুরা বসবাস করতেন, ধর্ম এবং জ্ঞান চর্চা করতেন।

draft copy

চীনের বিভিন্ন সূত্রে আঁকা জুয়ান-জ্যাংয়ের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। পরিব্রাজক জুয়ান-জ্যাংয়ের তেমনই একটি প্রতিকৃতি।

সুয়াং জাং ছিলেন সপ্তম শতকের একজন বিখ্যাত চৈনিক তীর্থযাত্রী। ইতিহাসের অনেক বইয়ে তাকে হিউয়েন সাং নামেও লিখা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থানগুলো ঘুরে দেখার জন্যে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে সুয়ান জাং চীন থেকে মগধে আসেন। সেখান থেকে আসেন বাংলায়। তোমরা মনে রাখবে, তিনি যখন এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন তখন এর নাম কিন্তু বাঙলা বা বেঙ্গল বা বাংলাদেশ ছিল না। ছিল খণ্ড খণ্ড কয়েকটি জনপদের সমষ্টি। আধুনিককালে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা নাম-পরিচয়ের উদ্ভব ঘটেছে। যাহোক, সিয়ান জাং বাংলার কয়েকটি বিহার পরিভ্রমণ করেন। পুণ্ড্রনগর, সমতট এবং তাম্রলিপ্তি বন্দর ভ্রমণ করেন। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সুয়ান জাং তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা সপ্তম শতকের বাংলা ও ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। বিশেষ করে যদি এইভাবে বলি তাহলেও অত্যুক্তি হবে না যে, সুয়ান জাং-এর বর্ণনার ভিত্তিতেই আমরা প্রাচীন বাংলার হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি খুঁজে পেয়েছি।

draft copy

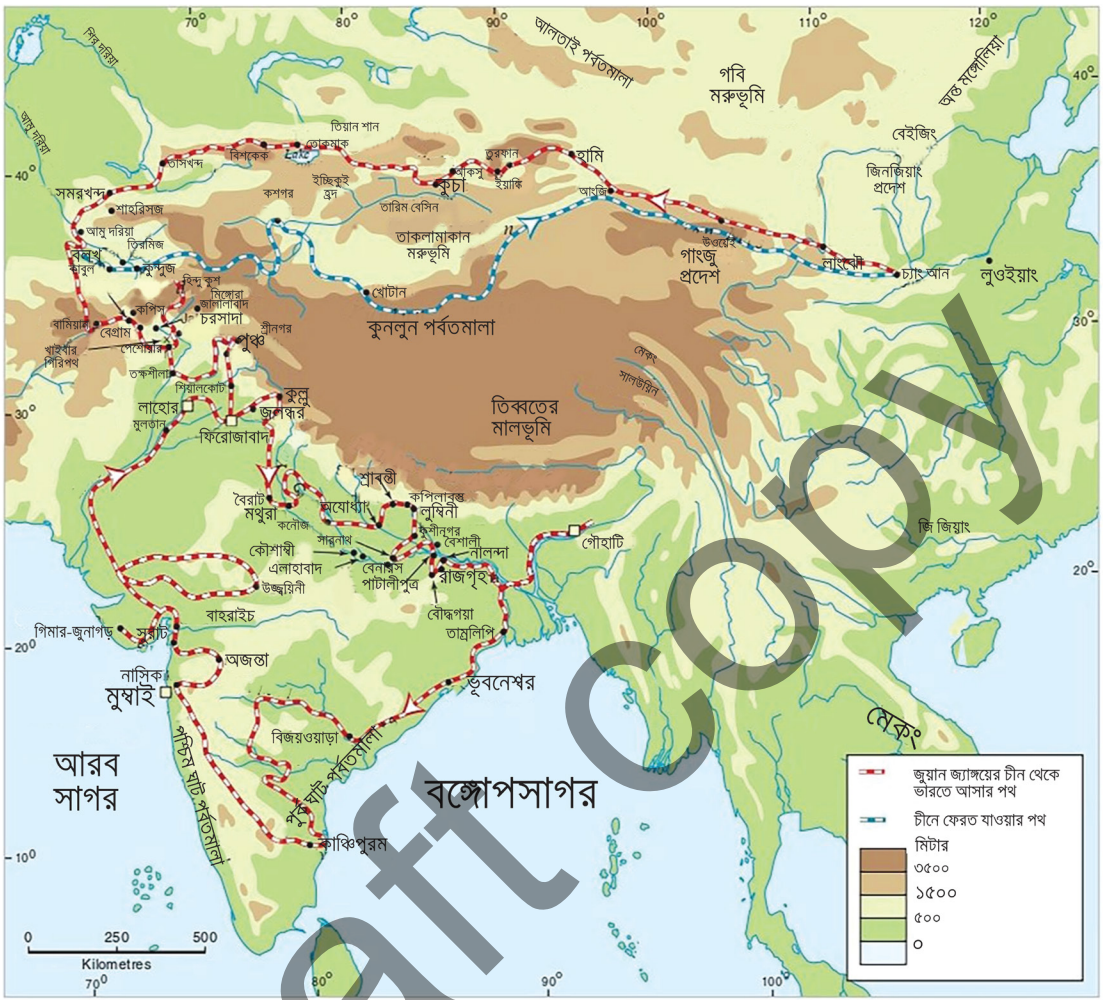

বাংলার প্রাচীন এই জনপদগুলোর কথা আমরা জানতে পারি প্রধানত বৈদিক সাহিত্য থেকে। বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল আর্য ভাষার মানুষের হাতে। এইসব গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন জনপদের কথা আসলেও খুব সম্মানজনকভাবে আসেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্গ-পুণ্ড্র জনপদের মানুষদের 'দস্যু' এবং 'অসভ্য' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কেন এইরকম বলা হয়েছে জানো? পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যখন আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করছে তখন এই অঞ্চলে অনেক আগে থেকে যারা বসবাস করছিলেন তাদের বাঁধার মুখে তাঁরা পড়েছিলেন। আধিপত্য বিস্তারে এই দ্বন্দ্বের কারণেই সেই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলা অঞ্চলের মানুষদের তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে।

তোমরা আগেই পড়েছো যে, আর্য ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ। ভারতবর্ষে আর্যরাই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ধর্মের রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থ, নিজস্ব সংস্কৃতি। সেকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষেরা নিজ সমাজের বাইরের সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। তারা নতুন অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে

draft copy

প্রবলভাবে। আর্য ভাষাভাষী মানুষের হাতে রচিত মহাভারতে বাংলার প্রাচীন দুইটি জনপদ 'বঙ্গ' এবং 'পুণ্ড্র'-এর নাম পাওয়া যায়। আর্য ভাষাভাষীদের রচিত অন্য কয়েকটি গ্রন্থে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের মানুষদেরকে 'দস্যু', 'অসভ্য', 'নিচু' শ্রেণীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলেই কি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে এইভাবে হেয় করা যায়? সকলেই তো আমরা মানুষ। মানুষ পরিচয় সবার আগে। আভিজাত্য, ক্ষমতা এবং ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির বড়াই করে কাউকে হেয় বা অসম্মান করা একেবারেই অনুচিত। আর্য ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো সব সময়ই নিজেদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'শ্রেষ্ঠ' এবং অনার্য ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিকে 'ছোট' দৃষ্টিতে দেখেছে। অথচ এই অনার্য ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরাই বাংলা অঞ্চলে সুসংগঠিত সমাজ ও সভ্যতা রচনা করেছিল। যার প্রমাণ পাণ্ডু রাজার ঢিবি, যা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু তোমরা দেখবে, বাংলার দূরবর্তী ভূ-খণ্ড থেকে যখনই নতুন কোনো ভাষা, রাজশক্তি এবং ধর্ম ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তখনই সেখানকার মানুষদেরকে অনার্য বলে হেয় করেছে, অসম্মান করে তাদের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেছে। অভিজাত শ্রেণীর আর্য ভাষাভাষী কতিপয় মানুষের এই বড়াই ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, আর্যদের মধ্য থেকেই এক সময় মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে। এইসব রাজশক্তির হাত ধরে বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এইসব জনপদের নগরকেন্দ্রিক মানুষের উপরও আর্য ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

অনুশীলনী

চলো, বাংলা অঞ্চলের একটি মানচিত্র অংকন করে বাংলার প্রথম সুসংগঠিত মানববসতির প্রমান হিসেবে পাণ্ডু রাজার ধিবির অবস্থান চিহ্নিত করি। একই সঙ্গে চিহ্নিত করি প্রাচীন জনপদগুলোর অবস্থান। জনপদগুলো বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবাংলা প্রদেশের কোন কোন জেলাজুড়ে বিস্তৃত ছিল তা সনাক্ত করে মানচিত্রের নিচে টীকা আকারে বর্ণনা করি।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে বাংলা

বাঙলা অঞ্চলে মৌর্য ও গুপ্তদের রাজনীতি ও ক্ষমতা বিস্তার

বাংলা অঞ্চলে আর্য ভাষাভাষী কতিপয় অভিজাত মানুষের গৌরব আর বড়াই করার তথ্য তোমরা জানলে। আরো জানলে প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জনপদভিত্তিক এই রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রথম আঘাত আসে সাধারণ পূর্বাব্দ তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে যখন মৌর্য নামের একটি সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির উত্থান ঘটে। যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল মৌর্য সম্রাটরা। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি (মহাস্থান বাহ্মীলিপি) থেকে জানা যায়, বাংলার প্রাচীনতম জনপদ পুণ্ড্র মৌর্য সাম্রাজ্যের দখলে ছিল। সামরিক অভিযানের মাধ্যমেই মৌর্য শাসকরা বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব অংশ দখল করে নিয়েছিলেন, এ কথা তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের এই বিস্তৃতির ফলে বাংলার উত্তর অংশ থেকে জনপদভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর অবসান ঘটে। প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি কলোনি বা উপনিবেশে পরিণত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক ছিলেন মৌর্য বংশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান সম্রাট। পরের অধ্যায়ে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা মৌর্য শাসকদের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানার জন্য

draft copy

অনুসন্ধান করবো।

মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌর্যদের মতো গুপ্তরাও সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। চতুর্থ শতকের মাঝমাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বাংলা অঞ্চলে সৈন্য অভিযান পরিচালনা করে বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ দখল করে নেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে সমতট পর্যন্ত গুপ্তদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বলে গুপ্তদের বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায়।

এইসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শাসনকেন্দ্র ছিল বাংলার বাইরে। শাসনকাজ পরিচালনার জন্যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে সম্রাট বড় বড় যোদ্ধা এবং সেনাপতিদের পাঠাতেন। উচ্চপদস্থ এই প্রশাসকরা বাইরে থেকে এসে বাংলা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এদের পাশাপাশি আসতো নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি আর অনেক বিদ্বান, পুরোহিত, ব্যবসায়ী মানুষজন। রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারেও তারা কাজ করতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল চলতে থাকে। কোনো এক সময় কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে কিংবা সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা অঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। বাংলা অঞ্চলে যেসব রাজার নাম তোমরা পাবে তাদের অধিকাংশই দেখবে বাংলা ভূ-খণ্ডের সীমানার বাইরে বহুদূর থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। তার মানে কি জানো? তার মানে হচ্ছে, বাংলায় আদি যে অধিবাসীরা ছিলেন রাজক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। তারা ছিলেন সাধারণ। প্রতিকূল প্রকৃতি আর হিংস্র জীব-জন্তু হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে জীবন-ধারণ করাই ছিল তাদের জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা অঞ্চলে তাই যখনই কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসা এলিট/ অভিজাত প্রশাসক অথবা উচ্চাভিলাষী কোনো যোদ্ধা।

অনুশীলনী

উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী মৌর্য এবং গুপ্ত শাসকদের পূর্ব ভারত তথা বাংলা অঞ্চলে আগমন ও দখলের কারণ কী ছিল? উপরের পাঠের আলোকে চলো নিজের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করি এবং ভারতবর্ষ এবং বাঙলা অঞ্চলের একটি মানচিত্র অংকন করে সাম্রাজ্যসীমা চিহ্নিত করি।

বাংলা অঞ্চলঃ গুপ্ত পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কেন্দ্র থেকে দূরের রাজ্যগুলো তখন আবারও স্বাধীন হতে শুরু করে। এই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-সত্তা গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। বঙ্গ তেমনই একটি রাজ্য-সত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। বঙ্গ রাজ্যের উত্থান হয়েছিল গোপচন্দ্র নামে একজন শাসকের হাত ধরে ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। রাজ্যটির কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। আর খুব সম্ভবত বিস্তৃত ছিল গঙ্গা নদীর দুই স্রোতোধারা অর্থাৎ পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগের প্রধান অংশে। এই হিসেবে বঙ্গ রাজ্যের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোরের বৃহত্তর এলাকা এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিমবাংলার দক্ষিণাংশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদ বিএন মুখার্জী গবেষণা করে জানিয়েছেন। গোপচন্দ্র ছাড়াও ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব, দ্বাদশাদিত্য, সুধন্যাদিত্য ছিলেন বঙ্গ রাজ্যের ৫

draft copy

জন রাজা। তাঁদের জারি করা তাম্রশাসন ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে এই সকল রাজা বঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

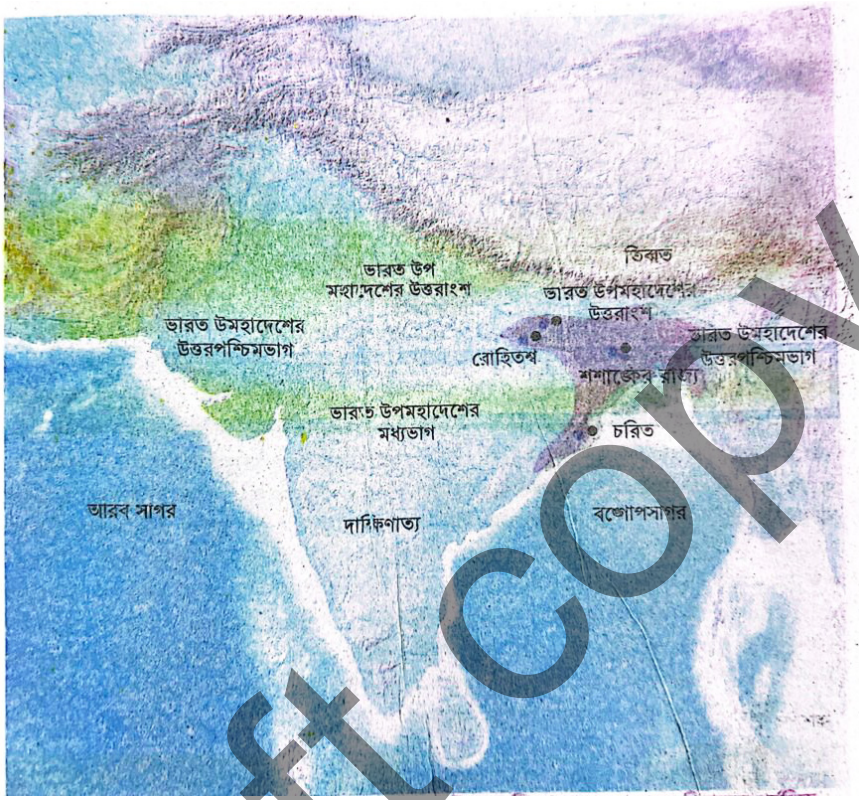

শশাঙ্কের রাজত্বের আনুমানিক বিস্তার।

গৌড় নামে আরেকটি রাজ্যসত্তার উত্থান ঘটেছিল সপ্তম শতকের শুরুর দিকে রাজা শশাঙ্কের হাত ধরে। গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা এখন বর্তমান ভারতের পশ্চিমবাংলা প্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গৌড় রাজ্য-সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাঙলা অঞ্চলের উত্তরাংশ এবং পশ্চিমাংশের বিস্তৃত এক এলাকা যার মধ্যে ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরের এলাকাসমূহ এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং বিহারের অংশবিশেষ। তবে হ্যাঁ, বঙ্গ এবং গৌড়ের সীমানা যে সব সময় একই ছিল তা কিছুতেই বলা যাবে না। রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমানাও বদল হয়ে যেতো। কখনও এইসব রাজ্যের রাজারা অভিযান চালিয়ে নতুন এলাকা দখল করেছেন, আবার কখনও অন্য এলাকার রাজাদের আক্রমণের ফলে নিজ রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়েছে। যাহোক, গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের শাসনকালে উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন ছিলেন মৌর্য এবং গুপ্তদের মতোই একজন উচ্চাভিলাষী শাসক। নিজের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার আর শক্তি প্রদর্শনের জন্যে গৌড় দখলের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। হর্ষবর্ধনের মতো একজন বড় শক্তিশালী সম্রাটের সরাসরি বিরোধিতা মোকাবেলা করেও শশাঙ্ক গৌড়ের পৃথক রাজ্য-সত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কৃতিত্বের পাশাপাশি শশাঙ্ক নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্যে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা-কেন্দ্র মগধ, উৎকল এবং কঙ্গোদের দিকেও সৈন্য

draft copy

পরিচালনা করেছিলেন বলে তাম্রশাসন, মুদ্রা এবং অন্যান্য সাহিত্যিক উৎস থেকে জানা যায়। শশাঙ্ককে বাংলা অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শাসক বলা যেতে পারে। নিজের রাজ্যের বাইরে উত্তর ভারতের দিকে সৈন্য পরিচালনার মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেছিলেন। শশাঙ্কের পর বাংলার পাল বংশের শাসক ধর্মপাল এবং দেবপালও একইভাবে সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছিলেন। মগধ এবং কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধি এবং গৌরব প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন।

মাৎস্যন্যায় ও পাল রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলে শক্তিশালী কোন শাসক ছিল না। এর ফলে বাংলায় বহিঃশক্তির আক্রমণ শুরু হয়। বাংলার অভ্যন্তরেও সামন্তরাজারা একে অন্যকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। এর ফলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রায় একশ বছর ধরে চলমান এই অরাজকতা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে মাৎস্যন্যায়। শব্দটি প্রথম কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। যাহোক, এই অরাজকতার অবসান হয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজন শাসকের হাত ধরে বাংলায় পাল বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে। এই বংশের রাজারা সাধারণভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বাঙলা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নানান তরিকার বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা করতেন। এর মধ্যে মহাযান আর তন্ত্রযান রীতি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

পাল বংশের শাসকদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, ১ম মহীপাল এবং রামপালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ সালে তাঁর পুত্র ধর্মপাল ক্ষমতায় আরোহন করেন। পাল বংশের অন্যতম ক্ষমতাধর রাজা বলা হয় তাকে। ধর্মপালের রাজত্বকালে পাল বংশ এতোই ক্ষমতাবান হয়ে উঠে যে, উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ক্ষমতা প্রদর্শন ও আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াই ইতিহাসে 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল প্রতিপক্ষের উভয়ের কাছেই পরাজিত হলেও পরে কিছুকালের জন্যে বারাণসী এবং প্রয়াগ দখল করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলার রাজ্য সীমানা বিস্তৃত করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় বসেন। পিতার মতো দেবপালও ছিলেন নাম, যশ, খ্যাতির প্রত্যাশী। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেবপালও উত্তর ভারত, উড়িষ্যা এবং কামরূপের দিকে সৈন্য পরিচালনা করে সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ নেন। দেব পালের সময়েই পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

কৈবর্ত বিদ্রোহ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের আধিপত্য ক্রমশ কমে আসতে থাকে এবং তাদের রাজ্যসীমাও হ্রাস পেতে শুরু করে। এমনই এক দুর্বল শাসকের সময়ে বাংলার উত্তরাংশে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্তদের একটি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। কৈবর্ত শব্দের মানে হচ্ছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্যোক ছিলেন একজন সামন্ত জমিদার। দিব্যোকের নেতৃত্বে পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এই কৈবর্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। এই সময়েই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র ধারণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য সামন্ত শক্তির সমর্থন থাকলেও দিব্যোক মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়েই বরেন্দ্র দখল

draft copy

করেছিলেন।

বরেন্দ্র থেকে ক্ষমতা হারালেও পাল শাসনের অবসান হয়নি। বরেন্দ্র এলাকায় যখন কৈবর্ত শাসন বিদ্যমান তখন রামপাল নামে একজন পালবংশীয় রাজা ক্ষমতায় বসেন। রামপাল তাঁর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকূট, মগধ, রাঢ় সহ চৌদ্দটি রাজ্যের রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য ও অস্ত্র সহায়তা নিয়ে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। বরেন্দ্রের শাসনক্ষমতায় তখন দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম। ভীম এবং রামপালের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ভীম পরাজিত ও নিহত হন। বরেন্দ্র আবারও পাল সাম্রাজের অধীনে চলে আসে। তবে এই রামপালই ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা। এরপর মদনপালের সময় পালবংশের পতন ঘটে।

চিত্র-১৯ : পাল সাম্রাজ্যের মানচিত্র

দেব ও চন্দ্র রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

পাল রাজবংশের উত্থান হয়েছিল বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে বরেন্দ্র এলাকায়। এদের ক্ষমতার কেন্দ্রও ছিল উত্তর-পশ্চিম অংশে এবং মগধের অংশবিশেষে। আঞ্চলিক বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকে যখন পাল রাজাদের শাসন চলছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তখন অনেকগুলো পৃথক ও স্বাধীন রাজবংশের শাসন চলছিল। এঁদের মধ্যে ভদ্র বংশ, খড়্গ বংশ, দেব বংশ এবং চন্দ্র বংশের শাসকেরা নদী দিয়ে বিভাজিত বাংলার খানিকটা অংশে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে রাজত্ব করেন। রাজবংশগুলোর রাজধানী ছিল যথাক্রমে কর্মান্ত-বসাক, দেবপর্বত এবং বিক্রমপুর। দেব বংশের রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল দেবপর্বত। ক্ষীরোদা নামের একটি নদীকে আশ্রয় করে প্রাচীন দেবপর্বত নগরী গড়ে উঠেছিল। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের কোনো একটি স্থানে ছিল দেবপর্বতের অবস্থান। শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব, ভবদেব ছিলেন দেব বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। এদের ক্ষমতা কেন্দ্রভূমি ছিল প্রধানত প্রাচীন সমতট এলাকা। বাংলা অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ধরা হয় চন্দ্র বংশকে। দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চন্দ্র বংশের রাজারা ক্ষমতায় ছিলেন। এই বংশের উল্লেখযোগ্য দুইজন রাজা হলেন, ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং

Draft copy

শ্রীচন্দ্র। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের রোহিতগিরি ছিল চন্দ্র বংশের রাজাদের উত্থানের কেন্দ্র। এখান থেকেই তারা বঙ্গ ও সমতট এলাকায় ক্ষমতা বিস্তার করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র ক্ষমতায় বসেন। শ্রীচন্দ্রের সময় চন্দ্র বংশের উত্তর-পূর্ব দিকে কামরূপ এবং উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচন্দ্র কামরূপে দখল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রাচীন শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট) ছিল চন্দ্র বংশের রাজ্যভুক্ত। পাল এবং চন্দ্র বংশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল বলে জানা যায়। শ্রীচন্দ্রের সময়ে চন্দ্র বংশের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর। তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, দেব এবং চন্দ্র রাজারাও বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তরিত কোনো তরিকায় বিশ্বাস করতেন।

সেন রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আঞ্চলিক বাংলার একটি অংশে (রাঢ এবং গৌড়) সেন রাজবংশের উত্থান ঘটে। সেন রাজাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে যারা সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে রামপালকে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিজয় সেন। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বিজয়সেন বাংলার কিছু অংশ দখল করে নেন। বিজয়সেন একদিকে পাল বংশের রাজা মদনপালকে পরাজিত করে বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং অন্যদিকে বর্ম রাজাকে পরাজিত করে দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দখল করে নেন। এছাড়াও কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা আক্রমণ সহ নানান স্থানে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ক্রমেই আঞ্চলিক বাংলার প্রায় সবটুকু অংশের উপর নিজের অধিকার আরোপ করেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ জয় করার পর বিজয়সেন বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে সেন রাজবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দেওপাড়া প্রশস্তিলিপি থেকে বিজয়সেনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বহু তথ্য জানা যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ লিপিটি সম্পর্কে তোমরা পূর্বের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে জেনেছো।

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন বংশানুক্রমে সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শুরু এবং লক্ষ্মণসেনের শাসনকালের শেষদিকে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা বখতিয়ার খলজি ভারতবর্ষের পূর্বদিকে আক্রমণ পরিচালনা করে সেন সাম্রাজ্যে ভাঙনের সূচনা ঘটান। সেনদের ক্ষমতা বিক্রমপুরে সীমিত হয়ে পড়ে আর বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ তুর্কি খলজিদের দখলে চলে যায়।

তুর্কি-আফগান খলজিদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে ভাগান্বেষী তুর্কি-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাত ধরে নতুন এক রাজনীতি আর ক্ষমতা দখল ও বিস্তারের ইতিহাস গড়ে ওঠে। বখতিয়ার খলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কিক এবং আফগানিস্তানের গরমসির এলাকার অধিবাসী। গজনী ও দিল্লিতে চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি অযোধ্যায় আসেন। এখানে কিছুদিন চাকরি করার পর অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীনের অধীনে আধুনিক উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ভিউলী ও ভাগত নামের দুটি পরগণার জায়গীর লাভ করেন। ভিউলী এবং ভাগতে বসেই বখতিয়ার কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জমিদারি এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হন। আকস্মিক আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের নীতি অনুসরণ করেই বখতিয়ার একদিন গোপনে প্রস্তুতি ও খোঁজখবর নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেন রাজার প্রাসাদ অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। বলা হয়ে থাকে, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বখতিয়ার এত দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করেন যে তাঁর সাথে মাত্র সতেরো-আঠারোজন সৈন্য রাজপ্রাসাদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

draft copy

বহু দূরবর্তী ভূ-খন্ড থেকে আগত একজন উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা এভাবেই আমাদের বাংলা অঞ্চলের একটি অংশ দখল করে নিয়েছিলেন। একটি বিহার ধ্বংস এবং রাজা লক্ষণসেনকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশের শাসন। লখনৌতিতে স্থাপিত হয় তাদের রাজধানী। খলজি রাজাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ছিল ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি থেকে একেবারেই ভিন্ন। খলজি যোদ্ধা এবং রাজারা ছিলেন তুর্কিস্থান এবং আফগানিস্তানে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম এবং জনপ্রিয় লোকধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী। প্রাতিষ্ঠানিক সবগুলো ধর্ম এখানে নানান রীতি-নীতি আর তরিকা অনুসরণ করতো। ধীরে ধীরে পীর, সুফি, দরবেশ ও সুলতানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় প্রচলিত ইসলামি সংস্কৃতি বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেন। এঁদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ কোরান অনুসৃত ইসলাম প্রচার করেন। দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জংগলে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। তাঁদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে 'লোকজ ইসলাম' বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে রিচার্ড ইটন, অসীম রায় এবং মমতাজুর রহমান তরফদার সূত্রে জানা যায়। পরবর্তীকালে আরো নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। হাজার বছর পূর্বে এই ভূমিতে প্রথম বসতি স্থাপনের সময় যে রীতি-নীতি প্রথা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষ তা কখনোই সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেনি। এই কারণেই দেখা যায়, বাংলা অঞ্চলে নানান ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ভূমির সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম – সবাই মানবতার জয়গান করেছেন। মধ্যযুগের কবির ভাষায়,

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'!

তোমরা যখন আরও বড় হয়ে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে, তখন উৎসের গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক সত্য খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কেবল রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি - সবই জানতে হবে। তোমরা দেখবে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হচ্ছে। উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বিপরীতে চলছে ভারতেরই বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চল দখলকারী শাসকদের সঙ্গেও চলেছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাংলার একেকটি অংশে আলাদা রাজবংশ শাসন করেছে। বাইরে থেকে বিশাল যোদ্ধার দল এসে দখল করে নিয়েছে বাংলার ভূ-ভাগ। এইভাবেই কালক্রমে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন মেরুকরণ ঘটেছে। বাঙলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির গঠন ও রূপান্তরে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন।

যাহোক, মধ্য এশিয়া থেকে আগত যোদ্ধরা পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্থ ছিলেন। জল-জঙ্গল বেষ্টিত বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যুদ্ধ পরিচালনা করার সক্ষমতা তাদের ছিল না। বখতিয়ার তাই পূর্ব দিকে (যেখানে বর্তমান বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে) সেন শাসিত এলাকায় প্রবেশ না করে তিব্বতের দিকে পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হন। এরপর বখতিয়ারের সেনাপতি আলী মর্দান খলজি লখনৌতির সিংহাসন দখল করে নেন। আলী মর্দানের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে বখতিয়ারের অপর দুই সেনাপতি শীরান খলজি এবং গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির বিবাদ শুরু হয়। ত্রি-পক্ষীয় এই দ্বন্দ্বে শীরান

draft copy

এবং মর্দান দুইজনেই এক সময় নিহত হন। লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। দিল্লির শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবাক ও গজনীর সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর প্রতি মৃত্যু অবধি আনুগত্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন। লখনৌতিকে প্রথম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজের নামে খুৎবা প্রচার ও মুদ্রা জারি করেন আলী মর্দান খলজি। গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি ক্ষমতায় আরোহন করার পর মর্দানের পন্থা অনুসরণ করেন। তিনি দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ১২১২ থেকে ১২২৭ পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর লখনৌতি শাসন করেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। ১২২৭ সালের দিকে ইওজ খলজি যখন বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের জন্যে সেন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করেন। ইওজ খলজি তা প্রতিহত করতে দ্রুত ছুটে যান লখনৌতির দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি দিল্লির সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন ও সপরিবারে নিহত হন।

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন অন্যান্য বহু আঞ্চলিক রাজ্যের মতো লখনৌতি রাজ্য দীর্ঘকালের জন্যে দিল্লির সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অধীনে চলে যায়। লখনৌতির শাসনকর্তা প্রেরিত হয় দিল্লি থেকে। দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন লখনৌতির শাসকরা। আনুগত্যের বদলে কেউ বিদ্রোহ করলে এবং যথাযথ রাজস্ব প্রদান না করলে কেন্দ্রীয় শাসকেরা সৈন্য প্রেরণে করে স্থানীয় শাসকদের উচ্ছেদ করে নতুন শাসক নিয়োগ দিতেন। এ সময়কালে লখনৌতি রাজ্যে যারা শাসনকর্তা হিসেবে আসেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন দিল্লির শাসকদের ক্রীতদাস। এজন্যে এই সময়কে অনেকে 'দাস শাসন' বা 'মামলুক শাসন' বলেও অভিহিত করে থাকেন।

বাঙলা অঞ্চলে ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

দিল্লি এবং লখনৌতির শাসকদের উভয়েই মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে চলেছে ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই লখনৌতির বিদ্রোহী শাসকগণ সুযোগ পেলেই লখনৌতির দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমর অভিযান পরিচালনা করে রাজ্য সম্প্রসারণ করতেন। এইসব অভিযানের ফলে বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ অংশ লখনৌতির শাসকদের দখলে চলে যায়। ১৩৩৮ সালের মধ্যে লখনৌতির পাশাপাশি বাংলায় আরও দুটি শক্তিকেন্দ্র তৈরি হয়। একটি হচ্ছে, লখনৌতির দক্ষিণদিকে সাতগাঁ, অন্যটি দক্ষিণপূর্ব দিকে সোনারগাঁ। দিল্লির সুলতানগণ লখনৌতির পাশাপাশি বাকি দুইটি কেন্দ্রেও শাসনকর্তা নিয়োগ দিতেন।

সোনারগাঁ

draft copy

বাংলার পৃথক তিনটি শাসনকেন্দ্র দখল করে প্রায় সমগ্র বাংলা অঞ্চলের শাসক হিসেবে স্বাধীন সুলতানি শাসনকালের সূচনা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ১৩৪২ সালে লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথমে লখনৌতির দক্ষিণের শাসনকেন্দ্র সাতগাঁ দখল করেন। এরপর নেপাল ও ত্রিহুত আক্রমণ করে প্রচুর ধনসম্পদ দখল করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন এবং গাজি শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁ দখল করে নেন। তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্র দখলের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সিংহভাগ জায়গা তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আনতে সক্ষম হন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক ইলিয়াস শাহকে উচ্ছেদ করার জন্যে বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে একডালা নামে একটি দুর্গে আশ্রয় নেন। বাংলার বৈরী আবহাওয়া, বর্ষার জল, জঙ্গল ও মশার উপদ্রবে দিল্লির সৈন্যরা বেশিদিন টিকতে পারেনি। ফিরোজ শাহ তুগলক বাধ্য হয়েই দিল্লি ফিরে যান।

বিজয়সেনের মতো শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহও বাংলা অঞ্চলের প্রায় সমুদয় অঞ্চল দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিল্লির সভা-ইতিহাসবিদ শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর লেখা একটি গ্রন্থে ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালাহ' বলে উল্লেখ করেছেন। 'বঙ্গ' থেকে উদ্ভূত 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালীয়ান' শব্দ দুটি সমুদয় বাংলা অঞ্চল ও অঞ্চলের সকল মানুষের পরিচয় নির্ধারণে খুব সম্ভবত সেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নাম-পরিচয় নির্ধারণের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ অঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ প্রজাদের কোন সম্পর্ক ছিল বলে কোনো উৎস হতে জানা যায় না।

সুলতান ইলিয়াস শাহের বংশধরেরা অনেকদিন বাংলা শাসন করেন। ইলিয়াসশাহী বংশের দুইজন উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন সিকান্দর শাহ এবং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সময় বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খন্ডের প্রধান একটি অংশে আবারও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এই সময় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের পরিবেশ তৈরি হয়। সুলতান আজম শাহের রাজত্বকালেই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন। সুলতান আজম শাহ নিজেও ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রালাপ ছিল বলে জানা যায়।

ইলিয়াসশাহী বংশের পর বাংলার ইতিহাসে আরেকটি রাজবংশের শাসন দেখা যায়। এটি হলো হুসেনশাহী বংশ। আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসদের একটি দল বাংলার শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। চারজন হাবসী ক্রীতদাস প্রায় ছয় বছর বাংলার রাজ ক্ষমতায় ছিল। একেকজন শাসককে হত্যা করে অন্য একজন শাসক ক্ষমতায় আসছিলেন। হাবসী ক্রীতদাসদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে ১৪৯৩ সালে সিংহাসন দখল করেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। বহু দূরের ভূখণ্ড থেকে তিনি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ বাঙলা অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার অধিবাসী। যাহোক, ক্ষমতা অধিকার করে হুসেন শাহ গোলযোগ সৃষ্টিকারী হাবসি ক্রীতদাস ও আমীরদের অনেককেই হত্যা করেন এবং বাকিদের বিতাড়িত করেন। রাজ কাজে সহায়তার জন্যে তিনি তথাকথিত উচ্চ বংশ, অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান এবং হিন্দুদের নিয়োগ করেন। হুসেন শাহ একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে তিনি কামরূপ, কামতা, বিহার ও উড়িষ্যার দিকে বারংবার যুদ্ধ করেন।

হুসেন শাহী শাসনামলে বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। এই সময় বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্য নামে একটি সাহিত্যধারা জন্ম হয় মূলত এই সময় থেকেই। আলাউদ্দীন হুসেন শাহী শাসনামলে গৌড়ের

draft copy

'ছোট সোনা মসজিদ', 'বড় সোনা মসজিদ', 'বারোদুয়ারি মসজিদ' সহ অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ ও তোরণ নির্মিত হয়।

আফগান ও মুগল শক্তির রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়ে বাংলা অঞ্চল

খেয়াল করে দেখবে, বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ একটি অংশে যেসকল শাসনকর্তা শাসন করেছেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব ও পারস্যের ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী অভিজাত মুসলমান। এরা একদিকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, অন্যদিকে দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই নিজেদের শাসন ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। ক্ষমতার এই ভাগ বাটোয়ারায় বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কোনো ভূমিকা ছিল না তা বলাই বাহুল্য। বাংলার মানুষের জীবিকা ছিল কৃষি ও মাছ ধরা। অতীতের মতোই বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অন্ন সংস্থান এবং অস্তিত্ব রক্ষাই ছিল সাধারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান-পতনে তাদের অংশ না থাকলেও চলমান যুদ্ধ-সংঘাতে যে অস্থিরতা তৈরি হতো তা ঠিকই তাদের জীবনে বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিতো।

দিল্লিতে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর দিল্লির সিংহাসন নিয়ে আফগান শাসক শেরশাহ শূর এবং মুগল শাসক হুমায়ুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের ঢেউ এসে বাংলার সিংহাসনেও লাগে। শেরশাহ এবং হুমায়ুন উভয়েই কিছুকালের জন্য আঞ্চলিক বাংলার প্রধান অংশে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন রাজধানী গৌড় দখল করে রাখেন। হুমায়ুনকে দিল্লির সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে শেরশাহ বাংলাকেও দিল্লির অধীন নিয়ে যান। শেরশাহ ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত শাসক। শেরশাহের সূত্র ধরেই বাংলার শাসনক্ষমতা কিছুদিনের জন্যে আফগানদের হাতে চলে যায়। দিল্লিতে মুগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও বাংলায় আফগান শাসক সোলায়মান কররানী এবং দাউদ কররানীর শাসন চলতে থাকে। ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রেরিত মুগল সৈন্যদের সাথে আফগানদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ কররানী পরাজিত ও নিহত হন। বাংলায় মুগল শক্তির রাজনীতি ও শাসন সম্প্রসারণের সূত্রপাত ঘটে। আফগান শাসক দাউদ কররানীকে পরাজিত করার পর মুগল শাসকরা বাংলা শাসন করার জন্যে সুবাদার প্রেরণ করেন। কিন্তু সুবাদারদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার। এই জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে মুগল সুবাদারদের বাঁধা প্রদান করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জমিদারি এলাকা শাসন করতে থাকেন। ইতিহাসে এই জমিদারগণ বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। বারভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁয়ের জমিদার ঈসা খান এবং তাঁর পুত্র মুসা খান। ঈসা খানের মিত্র হিসেবে মুগল বিরোধী যুদ্ধে আরও যেসকল জমিদার যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে ভূষণার চাঁদরায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার জমিদার বাহাদুর গাজী, শ্রীপুরের লক্ষণ মাণিক্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুগল শাসক জাহাঙ্গীরের সময় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন ইসলাম খান। ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে পরাজিত করেন। এরপর অন্যান্য জমিদারদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি বাংলা অঞ্চলের বিরাট একটি অংশকে মুগল শক্তির দখলে নিয়ে যান। মুগল সুবাদার ইসলাম খানই প্রথম ১৬১০ সালে সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায় এবং এর নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

বাঙলা অঞ্চলে সুবাদারি ও নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা

তোমরা সকলেই জানো যে, মুগল শাসকগণ তাদের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর নাম দিয়েছিলেন সুবা। প্রতিটা সুবায় শাসনকাজ পরিচালনার জন্য একজন করে সুবাদার নিয়োগ করতেন তাঁরা। শাহ সুজা, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা

draft copy

খান ছিলেন বাংলার উল্লেখযোগ্য সুবাদার। কথিত আছে যে, শায়েস্তা খানের সময়ে বাংলায় এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। এই ধরণের সাধারনিকরণ তথ্য সম্পর্কে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নানান উৎসকে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

বাংলার মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি, প্রধান শস্য ছিল ধান। বাংলার কৃষকেরা উদয়াস্ত খেটে যে ফসল ফলাতেন তার ন্যায্য মূল পেতেন কিনা তা নিয়ে এখন তাই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। তবে বাংলার সুবাদাররা যে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব ও উপঢৌকন দিল্লিতে পাঠাতেন তা বিভিন্ন উৎস থেকেই জানা যায়। মুগল শাসকদের যে অগাধ জৌলুষ আর বিলাসী জীবনের গল্প শোনা যায়, সেই বিলাসিতার পেছনে বাংলার খেটে খাওয়ার মানুষদের উৎপাদিত ফসল, শ্রম ও ঘামের দাগ থাকলেও তার মূল্যায়ন কখনোই কেউ করেনি।

১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদকুলি খান এবং কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকাজ পরিচালনা শুরু করেন। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে শুরু হয় বাংলার নবাবি শাসনকাল। সুবাদারি শাসনের আগে থেকেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং বাণিজ্য তৎপরতা শুরু হয়। কলকাতা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী, চট্টগ্রাম, সাতগাও প্রভৃতি এলাকা ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ, ফরাসি বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। বাণিজ্যকেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি এদের অনেকেই বাংলায় লুণ্ঠনকাজও পরিচালনা করতো। এইসব অপতৎপরতার কারণে সুবাদার এবং নবাবদের সাথে বিভিন্ন সময়েই পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এইরূপ বহুমুখী বিবাদের ফল হিসেবেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজ ক্ষমতায় আসীন হয়।

ইংরেজ ও পাকিস্তানি শাসনে বাংলা অঞ্চলে 'মানুষ'-এর স্বাধিকার আন্দোলন

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করলে দেখা যায় ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে অভিজাত এলিটরা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছেন। অনুসন্ধানে তোমরা আরো দেখেছো যে, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাজ ক্ষমতা থেকে পুরনো শাসকদের বিদায় করে নতুন শাসক এলেও সাধারণ মানুষের জীবনে অধিকাংশ সময়েই তার প্রভাব ছিল পরোক্ষ এবং ধীর গতিসম্পন্ন। রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবেও নতুন শাসকেরা নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতেন। কিন্তু বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। কোম্পানির শাসকেরা ছিলেন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করা। এর ফলে অধিকৃত এলাকার মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বুঝে উঠার আগেই তারা শোষণ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এই শোষণ প্রক্রিয়া রাজকোষ থেকে শুরু করে বাংলার একেবারে প্রান্তিক কৃষক, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এর ফলে দেখা যায়, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নবাবি শাসনের অবসান হলেও শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন থেমে যায় নি।

শোষিত মানুষেরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এইসময়ই ব্যাপকভাবে রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনও অস্ত্র ছাড়াই নিয়ে লড়াই করতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য

draft copy

ধারার শিক্ষার বিস্তার ঘটে, কতিপয় দেশীয় এবং ইউরোপীয় সমাজ সংস্কারক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত নতুন সমাজ নির্মাণে ব্রত হন। এর ফলে মানুষের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার বোধ আরও প্রবল হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ বিপ্লবী আন্দোলন- এই দুই ধারাতেই এখানে মানুষের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। ধারাবাহিক আন্দোলন, বিপ্লব, মিছিল ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলের মানুষ এক সময় সত্যিকার অর্থেই শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ

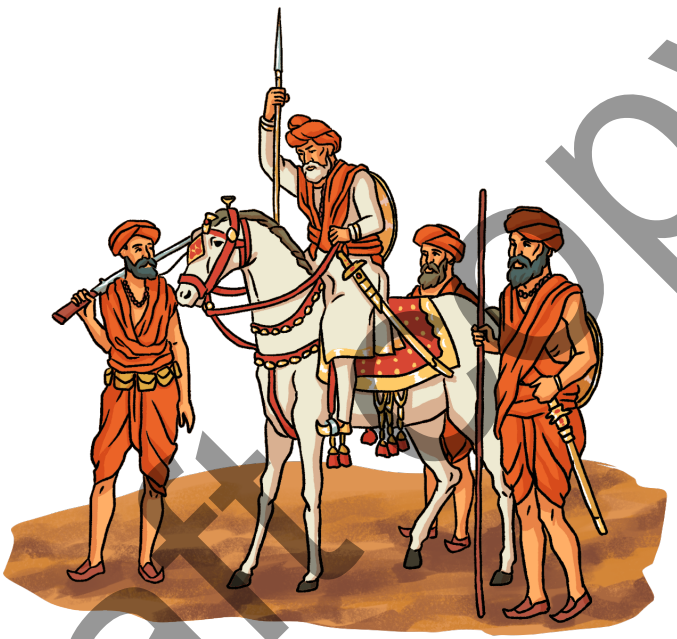

কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেন এদেশের ফকির-সন্যাসীরা। ফকির-সন্যাসীরা সাধারণত খানকাহ এবং আখড়াতে বসবাস করতেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে ধর্মভিত্তিক জীবন যাপন করতেন। কোম্পানির শাসকগণ এমন কিছু আইন করে যার ফলে ফকির-সন্যাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যাহত হয়। মানুষের কাছ থেকে মুষ্টি-ভিক্ষা গ্রহণে বাঁধা এবং তীর্থস্থানের উপর কর আরোপ করে কোম্পানি সরকার। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলেও অভিহিত করা হয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ১৭৬০ হতে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলার ফকির-সন্যাসীরা কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন পরিচালনা করেন। সন্যাসীদের পক্ষ থেকে ভবানী পাঠক নামে একজন ব্রাহ্মণ মজনু শাহের সাথে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়। মজনু শাহের সাথে এই আন্দোলনের বাংলার সাধারণ প্রজাগণও যুক্ত ছিলেন। ফকির-সন্যাসী বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় ১৭৬৩ সালে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সরকারের বাণিজ্যকুঠিগুলো। বর্শা, তরবারি, বল্লম, বন্দুক, অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র, কামান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিদ্রোহীরা রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ঢাকা, পাটনা, কুচবিহার, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন ইংরেজ কুঠিতে আক্রমণ পরিচালনা করে লুণ্ঠন করতেন। যুদ্ধে সৈন্যদের খাদ্য, গোলাবারুদ ও রশদ বহনের জন্য মজনু শাহ উট এবং ঘোড়া ব্যবহার করতেন। সুপরিকল্পিতভাবে

draft copy

পরিচালিত একেকটি যুদ্ধে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফকির-সন্যাসী যোদ্ধা যোগ দিতেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে সাধারণ কৃষক আর প্রজাগণও ছিলেন। ফকির-সন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে ইংরেজ কুঠিয়াল সহ অনেক সৈনিকের মৃত্যু হয়। মজনু শাহের মৃত্যুর পর মুসা শাহ, পরাগল শাহ, কৃপানাথ, শ্রীনিবাস প্রমুখ ফকির ও সন্যাসী নেতা আরও বহুদিন এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থলিপ্সা এবং লুণ্ঠনের মানসিকতায় জর্জরিত হয় বাংলার আপামর প্রজাগণ। ইতিপূর্বে যেকোন ধরনের দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের সময় বাংলার স্থানীয় জমিদার ও শাসকগণ প্রজাদের খাজনা মওকুফ সহ নানা সুবিধা দিয়ে থাকতেন। মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে আমরা দেখেছি, দুর্যোগের সময় প্রজাদের সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য থেকে খাদ্য শস্য ও অর্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ পরিচালিত কোম্পানির সরকার অনাবৃষ্টির কারণে কৃষকরা ফসল ফলাতে পারেনি জেনেও পূর্ব বছর পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব আদায় করে। পরের বছর আবারও অনাবৃষ্টির কারণে ফলন খুবই কম হয়। যেটুকু শস্য উৎপন্ন হয়েছিল তাও রাজস্ব বাবদ কোম্পানির লোকেরা নিয়ে যায়। মানুষের জন্যে ত্রাণ বা রাজস্ব মওকুফের কোন ব্যবস্থা রাখে না। এর ফলে সমস্ত দেশ জুড়ে বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরেজি ১৭৭০ সন এবং বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়। বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বাস্তব চিত্র

draft copy

নীলকর বিদ্রোহ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনক্ষমতা লাভের পর বাংলার প্রান্তিক কৃষক ও রায়তদের জীবনে যে চরম দুর্দশা নিয়ে এসেছিল তার আরেকটি অন্যতম নজির হচ্ছে নীল চাষ। ইউরোপে শিল্প কারখানাগুলোতে কাপড়ে রঙ করার জন্য নীল এর দরকার হতো। ইউরোপে নীলের দাম ও চাহিদা ছিল প্রচুর। বাংলার কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করিয়ে ইউরোপে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের নীল নকশা করে কোম্পানির সরকার। বাংলার কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিগুলো তারা নীল চাষ করার জন্যে দাগিয়ে দিতে থাকে। জোর করে কৃষকদের হাতে চাষের খরচ বাবদ কিছু অর্থও তুলে দেয়। একে বলা হতো দাদন। এই দাদনের টাকা সুদ সমেত আদায় করে নিতো নীল সংগ্রহের মাধ্যমে। কৃষকরা বছরের পর বছর নীল চাষ করেও জোর করে ধরিয়ে দেওয়া দাদনের ঋণ থেকে মুক্তি পেতো না। কোন কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাকে কাচারিবাড়িতে ধরে নিয়ে ভয়ংকর রকমের নিপীড়ন করতো। বাংলার কৃষকদের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলোতে খাদ্য শস্যের পরিবর্তে নীল চাষ হতে থাকে। সাধারণ কৃষকরা অপরিমেয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। এক সময় বাধ্য হয়েই তারা বিদ্রোহ শুরু করে। নীল চাষের বিরুদ্ধে সংঘটিত বাংলার সাধারণ কৃষদের এই বিদ্রোহ ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৮৫০ সনের পর থেকেই তৎকালীন ফরিদপুর, যশোর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া এলাকার কৃষকরা সংগঠিত হয়ে স্থানীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় নীলকর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। যশোরে নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ননী মাধব ও বেনী মাধব, হুগলিতে বোইদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার, নদীয়ায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত কৃষকদের জয় হয়। ব্রিটিশ সরকার এই তীব্র আন্দোলনের মুখে নতুন একটি আইন করে। জোর করে কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করানোর প্রক্রিয়াকে সেই আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তিতুমিরের আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলন

সাধারণ কৃষক, তাঁতি, জেলে, তেলি প্রমুখ বাংলার নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা এবং ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় নীল-বিদ্রোহের সমসাময়িক আরও দুইজন মানুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের একজন হলেন তিতুমির, অন্যজন ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে দুটি ধারায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হাজী শরীয়ত উল্লাহ এবং তিতুমির বাংলার নিপীড়িত রায়ত, কৃষক, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইংরেজ, জমিদার ও নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচারে পীড়িত মানুষদের সংগঠিত করে তাঁরা সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ শুরু করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজ সরকার তিতুমিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। তিতুমির একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে সেখানে কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত লাঠিয়াল বাহিনীর সৈন্য সমাবেশ করেন। ইংরেজরা কামান-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করলে তিতুমির দেশিয় লাঠি, বর্শা, বল্লম, তরবারি নিয়েই পাল্টা আক্রমণ করেন। অসম এই যুদ্ধে তিতুমির নিহত হলেও তার এই সাহস মানুষকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছে।

draft copy

হাজি শরীয়ত উল্লাহ

মীর নেসার আলী তিতুমির

অন্যদিকে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহও তিতুমিরের মতো লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৪০ পর্যন্ত প্রতিবাদ লড়াই অব্যাহত রাখেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষক, রায়ত ও নিপীড়িত প্রজাগণ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় অংশ নিচ্ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গণ মানসিকতা তৈরিতে এই আন্দোলন বিদ্রোহ যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে, একথা বলাই বাহুল্য।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে আরেকটি বড় আকারের বিদ্রোহ হয় ইতিহাসে যা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসকরা শাসনকাজ পরিচালনা করার জন্যে এক সময় বাংলা ও ভারতবর্ষ থেকে সৈনিক নিয়োগ দিতে শুরু করেন। সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশীয় এই সৈন্যরাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মাতৃভূমি থেকে হটিয়ে দেশীয় শাসকবর্গের হাতে রাজ ক্ষমতা তুলে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশীয় সিপাহী এবং ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে অনেকগুলি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই সময়। উভয় পক্ষেরই রক্তক্ষয় হয়। সিপাহীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। বিদ্রোহের দায়ে অসংখ্য সিপাহীকে ইংরেজ সরকার ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের মধ্য থেকে স্বাধীনতার চেতনা কিছুতেই তারা দমাতে পারেনি।

draft copy

সিপাহী বিদ্রোহ

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন, ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। এর ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের সাথে আলাপ করে মানুষের অধিকার আদায়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহের মতো অন্ধকার প্রথাগুলো সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা হয়। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারমূলক এইসব কাজে ইংরেজ গর্ভনরদের সম্মতি এবং সহায়তাও এই সময় পরিলক্ষিত হয়। নারীদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ না রেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে বেগম রোকেয়া এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে সমাজের সবাইকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। চিন্তায় ও মননে বাংলার তরুণদের সংস্কারমুক্ত করতে দেশীয় মনীষীদের পাশাপাশি ডিরোজিও নামে একজন ইউরোপীয় পন্ডিত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ইংরেজ শাসনের অবসান পর্ব

শিক্ষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবি আদায়েরও ভাষা তৈরি হচ্ছিল মানুষের মধ্যে। ব্রিটিশ শাসকদের

draft copy

সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নামে দুইটি রাজনৈতিক দল কাজ করছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি, মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার হত্যা, পরিকল্পিত আক্রমণ ছিল বিপ্লবী যোদ্ধাদের আন্দোলন পরিচালনার বিশেষ নীতি। সশস্ত্র এই আন্দোলনে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন, কারারুদ্ধও হন। কিন্তু আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হননি। এইসব আন্দোলন সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামের নতুন দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষেরা হাজার বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাধীনতা আর মুক্তির প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন। মুসলিম লীগের এলিট রাজনৈতিক নেতারা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে বাংলার পূর্ব অংশকে পাকিস্থানের সাথে জুড়ে দেয়ার রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে কয়েক হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে যেভাবে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সত্তার বিকাশ ঘটেছিল তা ভেঙ্গে যায় এবং একটি অংশ ভারতের সাথে যুক্ত হয়, অন্যটি পাকিস্থানের সাথে। পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী বাংলার পূর্ব অংশের মানুষের জীবনে নতুন এক ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো চাপিয়ে দেয়। পাকিস্থানের সাথে যুক্ত হবার পর বাংলার পূর্ব অংশ আবারও 'পূর্ব পাকিস্থান' 'পূর্ব বাংলা' নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্থান রাষ্ট্রের সাথে বাংলার পূর্ব অংশকে জুড়ে দেওয়া যে একটি ঐতিহাসিক ভুল ছিল তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালেই যখন পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুভাষী এলিট শাসকেরা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থী ও বিদ্বজ্জনেরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপা হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এমাসেরই শেষ দিকে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও পরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব জানান। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিন। গণপরিষদের ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া এবং মুদ্রা ও ডাক টিকিটে বাংলার বদলে উর্দু ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকা শহরে ধর্মঘট, মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষও তখন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী-জনতার সাথে একাত্ম ঘোষণা করে রাস্তায় নেমে আসে। আন্দোলন দুর্বার রূপ লাভ করলে পাকিস্তানী সরকার বিপ্লবী নেতাদের উপর পুলিশী হামলা এবং গ্রেফতার তৎপরতা চালায়। এইদিন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান নিয়ে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-মিছিল করতে গিয়ে যারা গ্রেফতার হন তার মধ্যে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম।

ভাষা আন্দোলনে বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলনের সংযোগ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তোমরা আগের শ্রেণিতে বিস্তারিত পরিসরে অবগত হয়েছো।

draft copy

বাঙলা অঞ্চলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং তার সমাপ্তি হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। বাংলার মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের এই লড়াইয়ে যে অনিবার্য নামটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষার্থী নেতা। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠকদের একজন। ভাষার দাবিতে ধর্মঘটে অংশ নেবার কারণে পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে। জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই তিনি ১৯৪৯ সনে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদকের তিনটি পদের মধ্যে একটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে একীভূত করার লক্ষ্যে মুজিবের উদ্যোগে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতেই পূর্ববঙ্গের মানুষ তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং ব্যাপকভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হচ্ছিল। শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে নতুন এই শোষণকাঠামো থেকে বের করে নিয়ে এসে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। শেখ মুজিবের এই আন্দোলন পূর্ববাংলার তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষার্থী-জনতা এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন এক জাগরণের সৃষ্টি করে। বাংলার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখে আসছিল শেখ মুজিব সেই আশাকেই বাস্তবায়িত করার জন্যে পাকিস্তানী শাসকদের সাথে নিজের জীবন বাজি রেখে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার মানুষের 'মুক্তির সনদ' সনদ হিসেবে খ্যাত ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরেন। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলার গণমানুষের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে এবং ছয়দফার দাবি যেন পাকিস্তানী সরকার মেনে নেয় সেই লক্ষ্যে দেশজুড়ে গণ আন্দোলন শুরু করে। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার দাবি থেকে বিচ্যুত করার জন্য গণ-নেতা মুজিবকে বারবার কারারুদ্ধ করা হলেও আন্দোলন সংগ্রাম থেকে পিছু হটাতে পারেনি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয় লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন পাকিস্তান সরকার জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের হাতে শাসনভার তুলে দেবার বদলে নানা তালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষের বিশাল এক জনসমাবেশে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব বাংলার মানুষকে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

draft copy

৭ই মার্চের ভাষনরত বঙ্গবন্ধু

বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে একটি নৃশংস হত্যাযজ্ঞে নামে। ঢাকা ক্যান্টনমেনটে সাজোঁয়া যান প্রস্তুত থাকে; যাদের গন্তব্য ছিল রাজারবাগ, ধানমন্ডি , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পিলখানা। রাত ১০ টা ৩০ মিনিটে ফার্মগেটের সামনে সজ্জিত সেনাবাহিনীর কনভয় ব্যারিকেডের সামনে বাঁধার মুখে পড়ে , আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ছাত্র জনতার একটি অংশ এই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জয়বাংলা শ্লোগানে ফার্মগেট এলাকা মুখরিত করে তোলেন। পাকিস্তানি ঘাতকেরা ফার্মগেটের প্রতিরোধের মুখে পড়ে আরও সতর্ক হয় এবং ব্যারিকেড ভেঙে বাংলামোটর হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে ঘুমন্ত মানুষের উপর গোলা বর্ষন করে ও গনহত্যা শুরু করে। সেই রাতেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অভিযোগ এনে বিচারের জন্যে শেখ মুজিবকে সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হবার আগেই ২৫ মার্চ

draft copy

রাতে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান। ঘোষণায় তিনি বলেন,

'এইটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহবান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যাকিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই নির্দেশনা অনুসরণ করেই বাংলার আপামর মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে।

শুরু থেকেই তোমরা দেখেছো, কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলের মানুষের উপর ভূ-মধ্যসাগরের আশে-পাশের অঞ্চল, পারস্য (ইরান), আফগানিস্তান এবং ভারতেরও অন্যান্য অংশের অভিজাত শ্রেণী দখলদারিত্ব এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য প্রায় সব সময়ই বহু দূরের ভূ-খণ্ড হতে আগত সুবিধাবাদী অভিজাত শ্রেণী নির্ধারণ করেছে। এই ভূ-খণ্ডের অনার্য ভাষা-সংস্কৃতির মানুষেরা বারবার শোষিত হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা অবস্থান করেছে তারা কেবল নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি ও সুবিধা লাভের চিন্তায় থেকেছে বিভোর। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। ক্ষমতালিপ্সু অভিজাত সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম-কে ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রয়োজনে।

এর প্রমাণ পাওয়া যাবে পাল, সেন যুগের রাজকীয় দলিলে, সুলতান ও মোগল শাসকদের ভূমি কেনা-বেচা ও লেনদেনের দলিলে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের সরকারি দলিলপত্রে। ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ করে ফেরত চলে যায়, তখন এখানকার অভিজাত রাজনীতিবিদগণ বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে কেবল ধর্মের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভূ-খণ্ডের আদিকালীন নাম 'বঙ্গ' হারিয়ে যায় কতিপয় এলিট রাজনীতিবিদের সুবিধাবাদী রাজনীতির অন্ধকারে। অথচ 'বঙ্গ' নামটির হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নির্দিষ্ট একটি ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এবং বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার এই ভূ-খণ্ডের মাটি-পানি-কাদা থেকে উঠে আসা অতি সাধারণ ঘরের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটে।

draft copy

আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ

নবম শ্রেণির মাহমুদের বাবা একজন কৃষক। পূর্বপুরুষের পেশা তিনি ধরে রেখেছেন। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষিপণ্য উৎপাদন করেন, পরিবারের ভরণ-পোষণে তাঁর কোনো রকম বেগ পেতে হয় না। মাহামুদের পরিবারের জীবনযাপনের মান অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ সচ্ছল। অন্যদিকে ওদের কৃষি খামারে আরো কয়েকজন কৃষক কাজ করেন, বলা যায় মজুরি খাটেন। দেশের প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় তাঁরা পারশ্রমিক বাবদ যা আয় করেন তাতে পরিবারের ভরণ-পোষণে বেশ কষ্ট হয়। খামারে দিনমজুরে কাজ করেন যে কৃষক দল, তাঁদের মজুরি প্রদানে মাহামুদের বাবা ঠিক ঠিক নিয়ম মেনে চলেন, কিন্তু বেশ ভালো আয় করলেও তিনি বাড়তি কোনো সাহায্য করেন না।

মাহামুদরা তিন ভাই-বোন। তাদের মা ছাড়াও ওদের বাড়িতে মাহমুদের দুই চাচাত ভাইও থাকেন। বাড়ির সকলের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির উপযুক্ত আয়োজনে তিনি খুব উদার। গ্রামে মাহমুদের বাবার অনুপ্রেরণায় অনেকে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষি খামার করছেন। বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত পেশার মাধ্যমে জীবন জীবিকায় সাচ্ছন্দ্য আনতে তাঁরা সকলে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে মাহামুদের বাবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন।, তিনিও এই সব খামারীদের ব্যাপারে খুব সহযোগী মনোভাবাপন্ন। গ্রামে এই কথা চালু হয়েছে যে, মাহামুদের বাবার কারণেই দুই দশকের ব্যবধানে এদের গ্রামের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হয়েছে।

এই শ্রেণিরই অন্য আর এক শিক্ষার্থী প্রবীরের বাবা নিকটবর্তী শহরে একটি বড় এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ শাখার শাখা-প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তাঁর কাজে তিনি বেশ দক্ষ, অনেক লোকজন তাঁর শাখায় কাজ করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বোর্ড তাঁর কাজে খুবই সন্তুষ্ট। কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত রাসভারী ও কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলেন বলে তাঁর সুনাম। তাঁর শাখায় কর্মরত সকলেই তাঁকে বেশ ভয় পান ও সমীহ করে চলেন।

এই মানুষটি যখন বাড়িতে আসেন, খুব ক্লান্ত থাকেন। বেশি সময় দিতে পারেন না পরিবারকে। কিন্তু ছুটির দিনে তিনি সবটুকু পুষিয়ে দেন। প্রবীরের ছোট ভাই ও ওদের মাকে নিয়ে নানা রকম আনন্দের ব্যবস্থা রাখেন। তিনি নিজেও অংশ নেন। কখনও কোনো ব্যাপারে বকাঝকা করেন না। বাড়ির কেউ তাঁকে একদম ভয় পায় না।

উপরের বর্ণনা থেকে দুইজন পরিবার প্রধানের আচরণের কিছু ধারনা পাওয়া যেতে পারে। যেমন মাহামুদের বাবা বাড়িতে বেশ উদার প্রকৃতির মানুষ হলেও নিজের খামারের কমর্মচারী-মজুরদের ক্ষেত্রে তিনি অন্য আচরণ করেন। প্রবীরের বাবাও কর্মক্ষেত্রে খুব কঠোর প্রকৃতির হলেও বাড়িতে তিনি খুব আমুদে হাসিখুশি আচরণের মানুষ। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে মানুষের আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিকতা নিয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জেনেছে। প্রয়োজনে তারা শিক্ষকের সহায়তায় পরিচয়ের বহুমাত্রিকতা ভালো করে জেনে নেবে। শিক্ষক এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাও নিজেদের আচরণ নিয়ে শ্রেণিতে শিক্ষকের সঞ্চালনায় আলোচনা করবে। তারা শ্রেণিতে শিক্ষার্থী হিসেবে (শিক্ষকের উপস্থিতিতে) কী আচরণ করে, বাড়িতে পরিবারের সদস্য হিসেবে কেমন আবার বিদ্যালয়ের বাইরে সহপাঠীদের সঙ্গে বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে ইত্যাদি এই আলোচনার বিষয়বস্তু। এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় একজন পরিচিত জন এবং একজন সহপাঠীর আচরণের প্যাটার্ন তৈরি করবে।

draft copy

১। নাম ও সাধারণ পরিচয়:	
পরিচয়ের ভিন্ন রূপ	আচরণের ধরন বা প্যাটার্ন
শিক্ষার্থী	
পরিবারের একজন	
সহপাঠী	
.....	
.....	
২। নাম ও সাধারণ পরিচয়:	
সাধারণ/পেশাগত পরিচয়	
অন্যপরিচয় ১	
অন্যপরিচয় ২	
অন্যপরিচয় ৩	

বাঙালির যুদ্ধযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা তোমাদের অনেকেরই পড়া আছে নিশ্চয়। কবিতাটির নাম ‘দুরন্ত আশা’। কবিতার এক জায়গায় তিনি বাঙালিত্বের কিছু অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন-

অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব’সে!র
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,

draft copy

মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি,
গৃহের প্রতি টান-
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে-ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

বাঙালিকে এভাবে বিদ্রূপ করে কবি তার পরে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সেই রকম একটি জাতিকে যাদের মধ্যে দৈহিক জোর ও স্বভাবে তেজস্বিতা আছে-

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন-
বর্শা হাতে, ভর্সা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল-বাধাহীন।

আরবের বেদুয়িনদের প্রতি কবির পক্ষপাত অস্পষ্ট থাকে না। তিনি তাদের ঘোড়সওয়ারি জীবনে মরুঝড় তুচ্ছ করে যুদ্ধবিদ্রোহে লিপ্ত যে জীবন তার পৌরুষের তেজকে বাহবা দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে তুলনায় বাঙালি যেন বড্ড ঘরকুনো, অলস, তেজহীন ভীরু জাতি।

draft copy

চলো এবার আমরা আরবের বেদুয়িন ও বাংলার কৃষকের জীবনের পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করি-

আরবের বেদুয়িন	বাংলাদেশের কৃষক

এই রকম ছক তৈরি করে বাংলাদেশ ও আরবের ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রকৃতির পার্থক্যগুলো নির্ণয় কর।

আরবের বেদুয়িন	বাংলাদেশের কৃষক

কিন্তু এতটুকুতেই কি কথা শেষ হয়? একবার ভাবো মুক্তিযুদ্ধের কথা। তার আগে সেই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে এদেশের মানুষ জেগে উঠেছিল। তোমরা তো সে ইতিহাস পড়েছ। তোমরা জান সেদিন বাঙালি ছাত্র-তরুণ-জনতা পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র, এবং সকল শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে শক্তভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। মানুষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। দেশের আপামর মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেদিন মানুষ সব ভেদাভেদ তুচ্ছ করে কেবল ঐক্যবদ্ধ হয় নি, হয়ে উঠেছিল সাহসী। তাদের এ নবজাগরণের প্রকাশ ঘটেছিল সত্তরের নির্বাচনে জয়বাংলা শ্লোগান নিয়ে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ে। তারপরও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র থেমে থাকে নি। তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এদেশের মানুষ তো তখন আর বিভক্তও নয়, ভীরুও নয়। তখন তারা সাহসী, তারা ঐক্যবদ্ধ, তারা ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা ছেড়ে এক মহান স্বপ্নে উজ্জীবিত। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ

draft copy

কায়েমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

একই কবিতায় কবি যেমনটা বলেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটেছিল সেদিন বাংলায়-

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে-
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয় মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্ব-মাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের-
ঝঞ্ঝা-মাঝে ধায় সে প্রাণ,
সিন্ধু-মাঝে লুটে।

প্রশ্ন হল বাঙালির এই রূপান্তর কীভাবে ঘটল? কীভাবে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত অলস, ভীরু, পোষ-মানা ক্ষীণ প্রাণ এই মানুষগুলো বীরের জাতিতে রূপান্তরিত হল? দুটি কারণে এমনটা ঘটেছে।

আমরা জানি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালি ধীরে ধীরে জাগছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে একদিকে একাগ্রতার অভাব, সাহস ও ত্যাগের অভাব আর অন্যদিকে নানারকম দোলাচল ও সুবিধাবাদের ফলে ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন সত্ত্বেও দেশ এগুতে পারে নি। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিজের জাতীয় পরিচয় নিয়ে সংকট ছিল। সদ্যই তখন ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে তিন টুকরো হয়েছিল, যার দুই প্রান্তের দুই টুকরা নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং মাঝখানের হিন্দু রাষ্ট্র ভারত। যার ফলে অনেকে কেবল ধর্মের কারণে দীর্ঘ কালের আবাসভূমি ছেড়ে দেশ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তখনকার চলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুও হতাশা প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৪-র ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরেও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র থেমে থাকে নি এবং মাত্র নয় মাসের মাথায় পাক সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদেশের নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তখন এটি ঠেকানো ও এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে নেতাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লিখেছেন-

'এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনো দিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৭৩)

এখন আমরা বলব ১৯৭১-এ বাঙালির রূপান্তর এবং এক বীর জাতিতে উত্তরণের পেছনে বড় কারণ হল উপযুক্ত নেতার সঠিক নেতৃত্ব। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে সেদিন রবীন্দ্র-বর্ণিত তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু

draft copy

নিদ্রারসে ভরা বাঙালি রূপান্তরিত হয় এক বীরের জাতিতে। প্রকৃত বীর কেবল লড়াই করে না, প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগেও প্রস্তুত থাকে। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সেই নির্ভরযোগ্য সাহসী দৃঢ়চেতা নেতাকে পেয়ে দেহ-মনে জেগে উঠে মৃত্যুস্রোত ডিঙিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল।

১৯৭২ সনের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এসে সোহরাওয়ার্দি উদ্যোনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু কবির আরেকটি কবিতার কথা উল্লেখ করে আনন্দাশ্রুতে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছিলেন- বিশ্বকবি তোমার কথা ভুল প্রমাণিত করে বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে, সে বাঙালির এক স্বাধীন দেশ কায়েম করেছে।

কবি একটি কবিতায় লিখেছেন- 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি' বঙ্গবন্ধুর ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি প্রমাণ দিয়েছে সে সত্যিকারের মানুষ হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির কি কি রূপান্তর ঘটেছে তা খুঁজে বের করা জরুরি। কারণ তা বাঙালির চিরাচরিত পরিচয় মুছে দিয়ে এক নতুন পরিচয় দাঁড় করিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বাঙালির পরিচয় ও আচরণের রূপান্তর বা নতুন পরিচয় তালিকাবদ্ধ করতে তোমরা দলে ভাগ হয়ে কাজ করবে-

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি	বাঙালি চরিত্রের পরিবর্তন

তোমাদের পাঠ্যবই থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রচিত বিভিন্ন বই ও উৎস ব্যবহার করে প্রত্যেকের অভিমতের ভিত্তিতে নিবন্ধ তৈরি করতে পার।

বাংলার মানুষের পরিবর্তনের কারণগুলো দলে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে।

বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে মানুষের জন্যে কোন নতুন পরিচয়, কোন নতুন চেতনা, কোন নতুন স্বীকৃতি, নতুন পেশা, নতুন গুণাবলি, নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্যেও দলে ভাগ হয়ে প্রকল্প ভিত্তিক কাজ করা যায়।

একদিন শ্রেণিকক্ষে এসে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বিদ্যাসাগর চরিত' থেকে শেষ অংশটুকু পড়ে শোনালেন। তোমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জানো, তবুও কবি সাধারণ বাঙালির সাথে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের পার্থক্য তুলে ধরে এই মনীষীর যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা বিশেষভাবে

draft copy

বোঝা দরকার। কবি লিখেছেন-

“আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।”

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে, ১৮২০ সনে। বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভগবতী দেবী। দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবে খুব ডানপিটে ছিলেন। লেখাপড়া শুরু গ্রামের পাঠশালায়। ৮ বছর বয়সে বাবার সাথে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন, পথে মাইলফলক দেখে দেখে সংখ্যা শিখে ফেলেন। পরের বছর সংস্কৃত কলেজে ভরতি হয়ে টানা বারো বছর পড়াশুনা করেন। প্রতিষ্ঠানের নাম কলেজ হলেও সেকালে এখানে স্কুলের ক্লাসও হত। বিদ্যাসাগর প্রায় সব বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দেন।

এরপর থেকে শিক্ষকতায় যুক্ত হন। নিজ চেষ্টায় ইংরেজি শেখেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি, নির্দিষ্ট দৈনিক রুটিন, বার্ষিক বিভিন্ন ছুটি ইত্যাদি প্রবর্তন করে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনেন। একই সাথে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্যের অন্যতম রূপকার। তাঁকেই বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী আখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছেন, ‘বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। -তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ... তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। ... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।’ (বিদ্যাসাগরচরিত পৃ. ৮-৯)

ছোট বেলা থেকে সংসারে ও সমাজে মেয়েদের যেসব বিড়ম্বনা সইতে হত তা তাঁকে খুবই কাতর করত। নারীর শিক্ষা ও নারীর স্বাধীনতার পক্ষে বিদ্যাসাগর আজীবন কাজ করেছেন। এর মধ্যে স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে শতাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা যেমন রয়েছে তেমনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রথাও তাঁর কাজ। চাকুরি জীবনে খোদ ইংরেজ বড় কর্তাদের সাথে মতপার্থক্য হলেও বিদ্যাসাগর কখনও মাথা নোয়ান নি। আজীবন ধূতি, চাদর পরে ও সাধারণ চটি পায়ে এ মানুষটির মাথা ছিল উঁচু, চরিত্র ছিল বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব ছিল তেজে ও দয়ায় গঠিত।

তাঁর অনেক জীবনী যেমন রচিত হয়েছে তেমনি তাঁকে নিয়ে গবেষণা গ্রন্থও রয়েছে বিস্তর। তোমরা সময় সুযোগ করে কিছু কিছু পড়বে।

draft copy

বিদ্যাসাগরের খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বস্তুত পক্ষে এই বাউণ্ডুলে কবি-মানুষটির বিপদে সবসময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মধুসূদন এই মনীষীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে "The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother".
আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের সময়, আমরা আপামর বাঙালি ওপরে বর্ণিত অনেক দুর্বলতা ও দোষ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি।

এবারে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুসারে বিদ্যাসাগরের চরিত্র তথা পরিচয় নির্মাণে উদ্যোগী হতে পারে।

কালান্তরের বাংলাদেশ

এই পর্যায়ে আমরা আরেকবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধের কথা বলব। এটির নাম কালান্তর। এ লেখায় কবি বলেছেন ইংরেজের আগমনে ও তাদের সংস্পর্শে এসে এদেশে যেন এক কালান্তর ঘটেছে। ইংরেজের আগে বাইরে থেকে যে আফগান, ইরানি, তুর্কি, আরবরা এসেছিল তারা যে সভ্যতা নিয়ে এসেছিল তাতে নতুনত্ব থাকলেও কবির ভাষায়, 'সেও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়'। ফলে তাতে স্থানীয় ও বহিরাগত সভ্যতার মধ্যে যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব হয়েছে তা ছিল 'এক চিরপ্রথার সাথে আর এক চিরপ্রথার। এক বাঁধা মতের সাথে আর এক বাঁধা মতের।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজ এলো 'নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীক রূপে।' সে কেমন? আমরা জানি চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যেমন তেমনি মানুষের জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ। এ সময়ে তারা সন্ধান পায় প্রাচীন গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের। তারও কিছু আগে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানচর্চা শুরু হয়।

পৃথিবী ও তার প্রাণজগৎ নিয়ে শুরু হয় বিস্তর গবেষণা, মহাকাশ ও সৃষ্টিরহস্য নিয়েও যুগান্তকারী সব সত্যের সন্ধান মেলে। তারই সাথে সমুদ্র বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদ আবিষ্কার, চাষাবাদে উন্নতি মিলিয়ে আর্থিক সমৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। শিল্প-সাহিত্যসহ কলাচর্চায় ঘটেছে বিপ্লব। রেনেসাঁসের প্রথম স্ফূরণ ঘটে ইতালিতে। এ রেনেসাঁসের নায়করা হলেন চিত্রশিল্পী ও বহুমুখী প্রতিভা লেওনার্দ দ্য ভিঞ্চি, চিত্রকর ও ভাস্কর মাইকেলেঞ্জেলো, বিজ্ঞানী কেপলার ও গ্যালিলিও, কবি সাহিত্যিক দান্তে ও পেত্রার্ক প্রমুখ।

draft copy

বিজ্ঞানী কেপলার

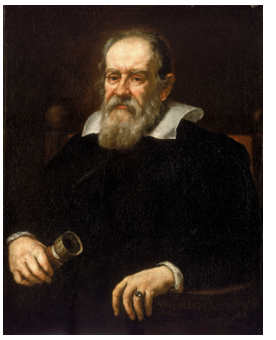

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও,

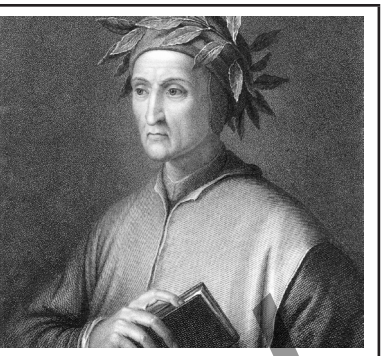

কবি সাহিত্যিক দান্তে

কবি সাহিত্যিক পেত্রার্ক

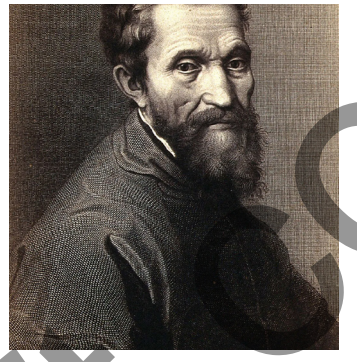

চিত্রকর ও ভাস্কর মাইকেলেঞ্জেলো

চিত্রকর লেওনার্দ দ্য ভিঞ্চি,

তারপরে ঘটেছে আরেক যুগান্তকারী ঘটনা- ১৭৭৬ সনে ইংল্যান্ডে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার। এর মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ঘটানোর মত উপলক্ষ- শিল্প বিপ্লব। এর প্রথম সুফল পায় ইংল্যান্ড। তারপরে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ইঞ্জিন চালিত জাহাজে চলাচলের গতি বাড়ে, কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কৃষির বাইরে শিল্প শ্রমিকের জীবন শুরু হয়, কারখানা ও শ্রমিক বসতি নিয়ে গড়ে ওঠে নগর। এ নগরের জন্যে প্রয়োজন হয় নাগরিক সুযোগ সুবিধা যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক, এবং জটিল জীবনে শৃঙ্খলা আনার জন্যে প্রয়োজন হয় নতুন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা। আগেকার গোত্রবদ্ধ সমাজ, সামন্তযুগের আত্মীয় সমাজ ভেঙে গড়ে উঠতে থাকে নাগরিক সমাজ। চিকিৎসার উন্নতিতে মানুষের আয়ু বেড়েছে, নগরে এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ভাষা, শিল্প, সঙ্গীতে যেমন তেমনি চিকিৎসা ও জীবনযাপনের সব ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটতে থাকে। এই হল নতুন ইউরোপের বারতা। একচেটিয়া বাণিজ্য ও একতরফা শোষণের বিপরীতে এরই চিত্তপ্রতীক হয়ে এদেশে এসেছে ইংরেজ। ইংরেজ এদেশের শাসন ভার নিয়েই প্রতিষ্ঠা করে নতুন নগরী কলকাতা।

কলকাতা নগরী হয়ে ওঠে তাদের রাজধানী, সব কাজের কেন্দ্র। ফলে এখানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন ও দপ্তর এবং ইংরেজ বণিক ও প্রশাসকদের বসতি। তাদের ঘিরে তৈরি হয় এদেশীয় শিক্ষিত সমাজ। এখানে গড়ে ওঠে নতুন বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র, সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ এবং এক সময় প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আশেপাশে গড়ে ওঠে কলকারখানা, শহরে তৈরি হয় নানান

draft copy

ধরনের সওদাগরি অফিস।

ফলে ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষ তৈরি হতে থাকে কলকাতায়। ধীরে ধীরে সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি ভাষাসহ বিজ্ঞান ও অন্যান্য আধুনিক সেক্যুলার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার মত স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে এক পর্যায়ে সারা বাংলা থেকে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিদ্যানুরাগী পরিবারের সন্তানরা কলকাতায় আসতে থাকে। কলকাতা হয়ে ওঠে বাংলার প্রথম আধুনিক নগরী। এখানে পৌর কর্পোরেশন স্থাপিত হয়, মেয়র নির্বাচন শুরু হয় এবং এভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সূত্রপাৎ ঘটে।

ফলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনকে কালান্তর আখ্যা দিয়ে ঠিকই করেছেন। এই কালান্তর আমাদের চিরায়ত গ্রামীণ কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। এ সময় থেকে ধীরে ধীরে সবার জন্যে নাগরিক জীবন গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে, ইংরেজিভাষা এবং নতুনভাবে সৃষ্ট প্রমিত বাংলা গদ্য শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে ওঠে। খাদ্যাভ্যাসে, জীবনযাপনে, ঘরবাড়ি, আসবাব ও তৈজস, এমনকি পোশাকে ও কথাবার্তায়, ব্যবহার ও আচরণেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনের দূত ইংরেজ, তবে এর পেছনে কাজ করেছে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্টের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পবিপ্লবের ফসল নানা ভোগ্যপণ্য এবং দুইয়ে মিলে মানসজগতের প্রসার ও রূপান্তর। এসবের সম্মিলিত প্রভাব পড়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। একেই কালান্তর বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার (পূর্ববাংলা) জাগরণ

প্রত্যুষের মনে প্রশ্ন জাগল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার যেসব অগ্রণী ব্যক্তিত্বের নাম শোনা যায় তাতে কোনো মুসলিম নাম পাওয়া যায় না কেন। অথচ তৎকালীন অখণ্ড বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি তো মুসলিম। তার মনের এই ভাবনাটা সে শিক্ষককেও জানাল।

শিক্ষক জানালেন এমনটা ঘটার একটি মুখ্য এবং কিছু গৌণ কারণ আছে। মুখ্য কারণটাই আগে জানা দরকার। ইতিহাস পড়ে তোমরা জান যে ইংরেজরা প্রথম বাংলা অধিকার করে। তখন কারা শাসন করেছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায়?

অনেকেই একযোগে উত্তর দিল- নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

তাঁরা ছিলেন জাতিতে তুর্কি, ধর্মে মুসলমান। পরে সারা ভারত যে ইংরেজ তার শাসনের আওতায় এনেছিল তা-ও ছিল এরকম সব বিদেশাগত মুসলিম শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে। দিল্লিতে তারা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে, অযোধ্যায় নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে, দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানকে পরাস্থা করেছিল তারা।

তখন জামাল বলল, ওহ্, মুসলমানদের তারা শত্রু মনে করত!

স্যার বললেন, ওরা মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখত। আর মুসলমানরা রাজ্য হারানোর জন্যে ইংরেজকে দায়ি করে তাদের বয়কটের পথ ধরেছিল।

এটা তো যুক্তিযুক্ত কাজ - বলল আশা ও আয়শা।

স্যার একটু মৃদু হাসলেন।

তখন নুসরাত বেশ জোর দিয়ে বলল, তাতে মুসলমানদের সমস্যা কী হল? এবার স্যার লুফে নিলেন কথাটা।

draft copy

বললেন, মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা নিতে চায় নি, ইংরেজের অধীনে চাকরিতে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু ঐ যে রবীন্দ্রনাথের কালান্তরে পড়েছ যে ইংরেজের মাধ্যমে এক নতুন যুগের নতুন জীবনের সূচনা হতে চলেছে সেইখানে তখন মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। অর্থাৎ নিজেকে বঞ্চিত করে বা নিজের ক্ষতি করে পরের অগ্রগতি বন্ধ করা যায় না। সে তার মত চলবে। অবশ্য ধীরে ধীরে মুসলমান নেতারাও বুঝতে পারেন যে ইংরেজি শিক্ষা এবং গণিত, বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ও পড়া যুগেরই দাবি। কিন্তু এই বিলম্বের জন্যে মুসলমান প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি আধুনিক পেশাজীবী তৈরিতে সময় লেগেছে। কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দু ততদিনে এসব পদে এগিয়ে গেছে। এবারে তামান্না আর সুব্রত গোমেজ একসাথেই বলল, তবে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গেই তো বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। সেটা কেমন করে হল?

স্যার এবার বললেন, তোমরা তো উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিদায় এবং ভারতবর্ষ ভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রর স্বাধীনতার কথা পড়েছ। এ স্বাধীনতা এসেছিল হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, প্রাণক্ষয়, দুই দিকেই হিন্দু ও মুসলমানের দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিসেবে পূর্ববাংলা ছিল পাকিস্তানের অংশ, পরে এর নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। তারপরে কী ঘটেছিল সে কথা তোমরা জান। ওরা সমস্বরে বলল, ভাষা আন্দোলন।

স্যার বললেন, ভাষা আন্দোলনকেই বলা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সোপান। মানে এ থেকেই বাংলাদেশের পথে আমাদের যাত্রা শুরু হল। তবে তা রাতারাতি হয় নি, একটি মাত্র আন্দোলনেও নয়। তারপর থেকে যুগপৎ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলেছিল এই সময় থেকে। তোমরা তো ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ জেনেছ, এমনকি অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নানা চক্রান্তের কথাও জেনেছ। জেনেছ বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বের কথা।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রী ও শিক্ষিকা

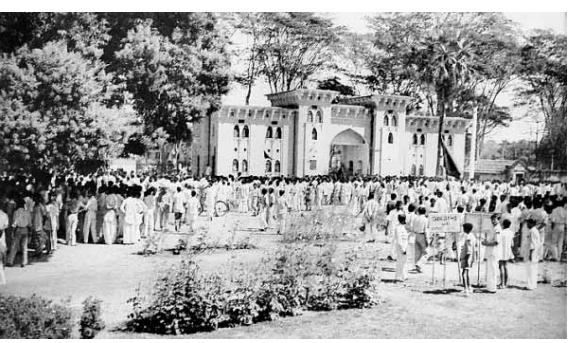

ভাষা আন্দোলনে জমায়েত সর্বসাধারণ

এইখানেতোমরা তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রধান ঘটনাগুলো জেনে নিতে পার।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় কার্জন হলে 'দুদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' আয়োজন করা হয়। যদিও এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার তবুও এতে অংশগ্রহণ করে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেকেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কোনা রকম ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধতা করেন।

draft copy

ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি এবং তিনি সভাপতির ভাষণে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তখন বাংল হরফের বদলে আরবি হরফে বাংলা লেখার কথাও উঠেছিল। এ বিষয়ে ড. শহীদুল্লাহ বলেন, "আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়াত পারা যায় না।... আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্যভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।" এ ছাড়া হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়েও তিনি অত্যন্ত মানবিক স্মরণীয় বক্তব্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী।... মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-

দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।' এ নিয়ে তখন সরকারি ও রক্ষণশীল মহলে প্রতিক্রিয়া হলেও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও লেখক-সাহিত্যিক তাঁর বক্তব্যকে স্বাগত জানান। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সনের মার্চ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন', ১৯৫২ সালের আগস্টে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেল', ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে মূলত তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

কাগমারি সম্মেলনে বক্তৃতারত মজলুম জননেতা
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি

এসব সম্মেলন এবং ১৯৬১ সনে সামরিক শাসন উপেক্ষা করে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সারা প্রদেশের শিক্ষিত মানুষ ও ছাত্র-তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বর্ষীয়ান গবেষক ও পুঁথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মানবিক ঐতিহ্য এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার মানবিক ধারার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেদিন বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যবিশারদ অনেক কথার মধ্যে বলেছিলেন, 'সর্বমানবের সংস্কৃতি আপনারা গড়ে তুলুন। ... চারশত বছরের সংস্কৃতির সম্পদে আজ আপনারা ঐশ্বর্যশালী।' পরবর্তীকালে প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন উমর এই অশীতিপর মনীষীর ভাষণটির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় বিশ বৎসর কাল ধরে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই অভিভাষণকে সেই আন্দোলনের ঘোষণা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।'

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃ. ৯৭

draft copy

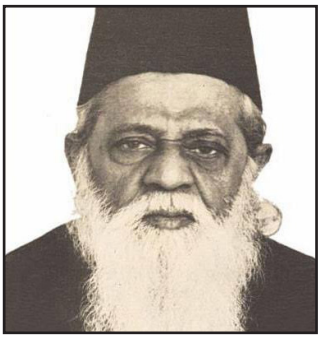

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

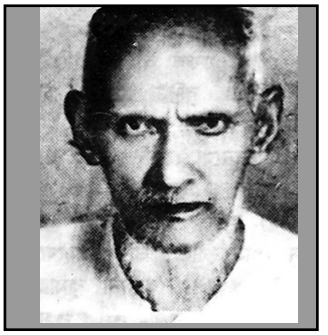

আব্দুল করীম

draft copy

গুরু সদয় দত্ত

সেই গানই আজ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। ওই চলচ্চিত্র ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি মহলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ওই গানও মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত। আরো একটু অনুসন্ধান করলেই তোমরা এ সময়ের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজের সন্ধান পাবে। এই সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে ছিলেন কবি বেগম সুফিয় কামাল, চিত্রকর পটুয়া কামরুল হাসান বর্ণমালা বৃক্ষ তৈরি ও বর্ণ দিয়ে শাড়ি বানিয়ে আন্দোলনে অন্য রকম দ্যোতনা এনেছিলেন। কবি শামসুর রাহমান লেখেন আসাদের শার্ট দুঃখিনী বর্ণমালার মত সমকালীন ভাবাবেগ নিয়ে স্মরণীয় কবিতা। এভাবে সব সৃষ্টিশীল মানুষও এ আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। তাতে মানুষের মধ্যে সার্বিকভাবে বাঙালিত্বের চেতনা ও গৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল। মানুষ পোশাকে, খাদ্যে, উৎসবে, নামকরণে, কাব্য ও সাহিত্য চর্চায়, সঙ্গীতে এমনকি নাটক ও চলচ্চিত্রেও জায়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় জেগে উঠেছিল। তা জোরদার হয়ে এক লক্ষের দিকে ধাবিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ছয়দফার আন্দোলনের ভিত্তিতে।

কবি সুফিয়া কামাল

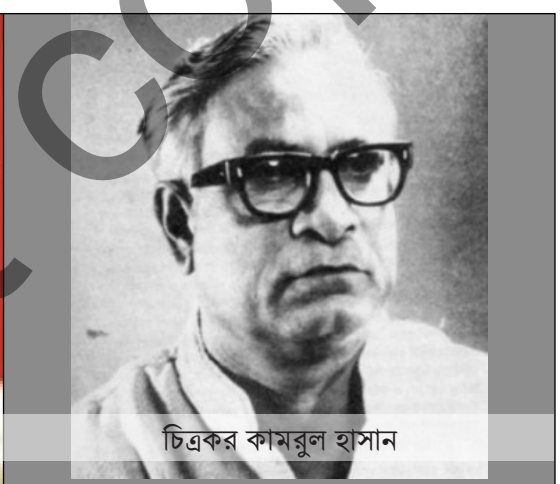

চিত্রকর কামরুল হাসান

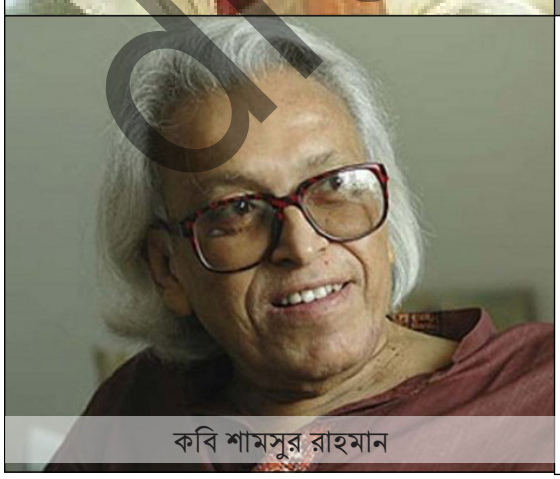

কবি শামসুর রাহমান

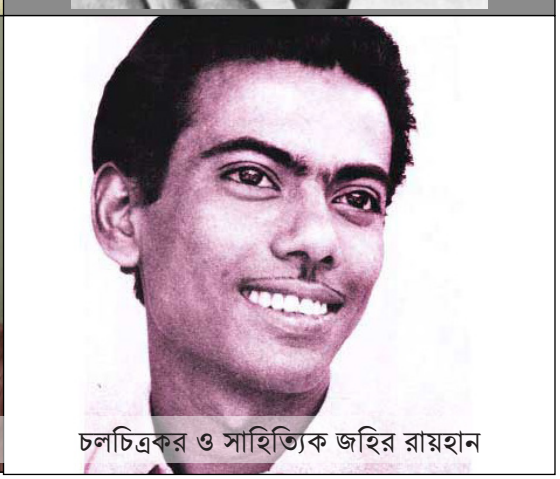

চলচিত্রকর ও সাহিত্যিক জহির রায়হান

draft copy

এই জাগরণের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন মনে করেন গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এক নবজাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণের ফসল হল আমাদের স্বাধীনতা।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট ও জটিলতা নিয়ে নানা মত ও বিতর্ক চালু আছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বলা হয় তিন হাজার বছর আগে আর্যদের আগমন থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত নানা জাতির এদেশে আগমন ঘটেছিল। তারা নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছে।

এদের মধ্যে একদল এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজ সংস্কৃতির সমন্বয়ে নতুন সংস্কৃতি ধারন করে এদেশেরই মানুষ হয়ে বাস করেছে। আর এক দল রাজনৈতিক উদ্দেশে এসে কিছুকাল থেকে আবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের অংশ হিসেবে চলে গেছে বা বিতারিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে ভারত ভাগ হয়েছে মানুষের ধর্মের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। ভারত ভাগের আগেই ধর্মীয় বিদ্বেষ ছাড়ানোর জন্যে অনেক ইতিহাসবিদ ঔপনোবেশিক শাসকদেরই দায়ী করেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা উশকে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টার কথা এবং এর ফলে বাংলা অঞ্চলের ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার কথাও শোনা যায়। বাংলার ইতিহাসে ধর্মীয় বিদ্বেষের চেয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতির কথাই নানা ভাবে প্রমাণিত। ভৌগোলিক দিক থেকে বলা হয় যে, বাংলা অঞ্চলের বেশ বড় এক অংশ পলিগঠিত বা বদ্বীপ অঞ্চল, যার অনেকটাই দু-তিন হাজার বছরের চেয়ে পুরানো

নয়। মানুষের সংস্কৃতি (এখানে স্বভাব বা আচরণ) বিনির্মাণে প্রাকৃতিক, তথা ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন মানুষের শক্ত সাংস্কৃতিক শিকড়ে জন্যে আরো বেশি সময় দরকার। নদীর ভাঙন এই দেশের মানুষকে একটি অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাসের সুযোগ দেয়নি বলে সংস্কৃতি অধিকতর বৈচিত্র্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

draft copy

দক্ষিণ এশিয়া: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্বাংশের যে অংশটুকু ইতিহাসবিদ এবং ভূগোলবিদের কাছে বাংলা অঞ্চল নামে পরিচিতি পেয়েছে, সেই অংশের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা বাংলার শাসক ও শাসনকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের শাসকদের নানামুখী দ্বন্দ্ব-সম্পর্কের কথা জেনেছি। উত্তর ভারত ও দিল্লিকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নানান কালপর্বে তৎকালীন উচ্চাভিলাষী শাসকেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের উপর আগ্রাসন ও দখল অভিযান চালিয়েছেন। কখনও তাঁরা সফল হয়েছেন, কখনও ব্যর্থ। আবার অনেক সময়েই উত্তর ভারতের শাসকেরা ভারতের বিভিন্ন অংশ দখল করে সেখানে তাদের অনুগত প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করেছেন। এইসব যোদ্ধা এবং শাসকদের কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়ে উপ-আঞ্চলিক ক্ষমতা বলয় তৈরি হয়েছে, একই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যায় কয়েক হাজার বছর আগে থেকে। তবে এর বিপরীতে আঞ্চলিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসকদের তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। উচ্চাভিলাষী আর ক্ষমতালোভী শাসক ও যোদ্ধাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে কেবলই বয়ে এনেছে নানান বিপর্যয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-ধারা ব্যাহত হয়েছে। তাদের টিকে থাকার পথে নানান চ্যালেঞ্জ এসেছে। এই সবকিছুর মোকাবেলা করেই দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে। ক্রমেই সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছে রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে।

অনুশীলনী কাজঃ

বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠের সময় আমরা বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশের রাজা, সম্রাট ও সুলতানদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বের কথা জেনেছি। চলো এখানে পূর্বের পাঠের আলোকে দুইটি অঞ্চল শাসনকারী কিছু রাজবংশ ও শাসকের নাম লিখি এবং এই অধ্যায়ের বাকি অংশ পাঠ করার সময় তাদের কার্যকলাপসমূহ গভীরভাবে খেয়াল করি। বাংলা কিংবা দক্ষিণ এশিয়া- পটভূমি ভিন্ন হলেও ক্ষমতালোভী শাসকদের আচরণ বলতে গেলে প্রায় একই রকম, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

উপরের অনুশীলনী কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা উচ্চাভিলাষী শাসকদের ক্ষমতাবিস্তারের নমুনা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ ও পরিণতি খানিকটা বৃহত্তর ক্যানভাসে অনুসন্ধান করার সুযোগ পাবো। আমরা দেখবো কেবল বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনেই নয়, ক্ষমতালোভী শাসক ও যোদ্ধাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে নানান রকম অস্থিরতা তৈরি করেছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারায় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। রাজাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ বিনাকারণে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যুগে যুগে যে শাসনকাঠামো তৈরি করেছে, মানুষ কখনও তা মেনে নিয়েছে, কখনও বিরোধিতা করেছে। কখনও নিজেদেরকে সংযুক্ত করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে এগিয়ে গেছে, রাজনৈতিক অধিকার সচেতন হয়েছে। আবার কখনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে নিজেরা বিযুক্ত থেকেছে। এই নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বিপুল

draft copy

সংখ্যক মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মতোই বাঙলা অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ার মানুষেরাও একসময় অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। জন-বিদ্রোহ করেছে। অনেক সময় বিপ্লবী কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। দূরের ভূ-খন্ড থেকে আগত অর্থ ও ক্ষমতালোভী শাসকদের বিতাড়িত করে বাঙলা এবং ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

দক্ষিণ এশিয়া পরিচিতি

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত আটটি দেশকে দক্ষিণ এশিয়া বলা হয়। প্রাচীনকালে অঞ্চলটি ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। কখনও কখনও প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমানা আরো বেড়েছে, কখনও কমেছে। সীমানার এই হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করতো রাজার ক্ষমতার উপর। রাজার ক্ষমতাই কোনো একটা ভূ-খন্ডে বসতি স্থাপনকারী সাধারণ মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করতো। হাজার বছরের কাল পরম্পরায় ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার সীমানা যেমন বেড়েছে-কমেছে, তেমনি ঐ সীমানার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের পরিচয়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। যাহোক, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ভূখন্ডে বর্তমানে আটটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে, এগুলো হলো- ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ। প্রাগৈতিহাসিক কালে শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এখানে মানুষের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। নগর ও জনপদ ব্যবস্থার ভিত মজবুত হয়েছে।

ধীরে ধীরে উত্থান ঘটেছে কয়েকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির। উচ্চাভিলাষী রাজা ও যোদ্ধারা শক্তি খাটিয়ে, সৈন্য পরিচালনা করে একেকটি অঞ্চল বা এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। সেই অনুসারে নাম-পরিচয় তৈরি হয়েছে। মূলত এভাবেই প্রাচীন গোত্র জীবন থেকে জনপদ, জনপদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার কাল পেরিয়ে অঞ্চলটি বর্তমান নাম-পরিচয়ে এসে পৌঁছেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা এই অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সৃষ্ট রাজনৈতিক সত্তা, সংগঠন, পরিচয়-নির্মাণের ধাপগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করবো।

আর্য ভাষাভাষী মানুষের কথা

সাধারণ পূর্বাব্দ ৩৫০০ থেকে ১৪০০ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ায় যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কথা তোমরা পড়েছো, সেখানে কিন্তু শাসক শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করতেন উচুঁ দুর্গের ভেতরে। প্রশাসনিক বাড়ি-ঘরও এসব দুর্গের মধ্যেই ছিল। ধারণা করা হয়, দীর্ঘ সময় ধরে এসব দুর্গ থেকেই প্রশাসনিক শাসনকর্তারা জনগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমনের আগেও স্থানীয় অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে দশ গোত্রের সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। আর্য ভাষাভাষী মানুষেরা আনুমানিক সাধারণ পূর্বাব্দ ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত বা তারপরেও বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন-মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আগমন করে। আর্যদের আগমনের পর আর্য এবং অনার্য উভয়ের মধ্যেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ লেগে থাকতো। নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ, নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাত জন্য নেতা বা শাসকের উদ্ভব হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের মতে, ঋকবেদের যুগের রাজারা ছিলেন প্রধানত: যোদ্ধাদের নেতা। রাজপদ বংশানুক্রমিক হলেও রাজতন্ত্রের কথা জানা যায় না।

ষোড়শ মহাজনপদের কথা

draft copy

কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের ফলে প্রাক-সাধারণ অব্দ সপ্তম শতক থেকেই দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারার সৃষ্টি হয়। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ইউনিট গড়ে উঠে। এগুলো ছিল রাজ্য বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি প্রাথমিক রূপ। আলাদা আলাদা গোত্র, জনগোষ্ঠী এবং বংশকে কেন্দ্র করে একেকটি অঞ্চলে গড়ে উঠা এই ইউনিটগুলোকে বলা হতো মহাজনপদ। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ ষোলটি মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল বলে এদেরকে ষোড়শ মহাজনপদ নামেও ডাকা হয়। প্রাচীন বাংলা অঞ্চল এবং বর্তমান ভারতের বিহারের প্রদেশের একটি অংশ নিয়ে মগধ এবং অঙ্গ নামের দুইটি মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল।

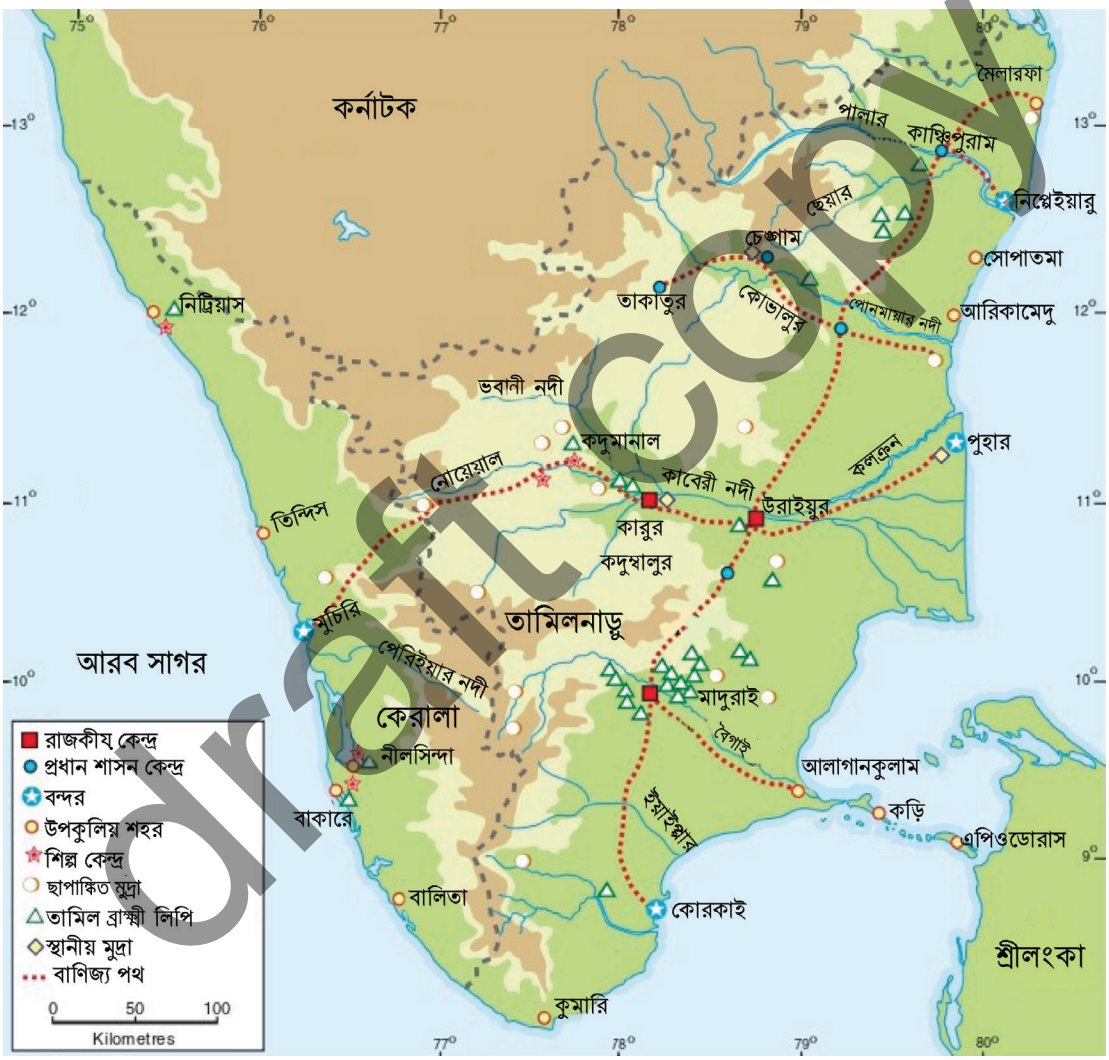

এই মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল মূলত আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হাত ধরে। এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন অভিজাত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির মানুষেরা। মহাজনপদের সাধারণ মানুষের জন্যে এরাই নানান নিয়ম-কানুন তৈরি করতেন। আর্য ভাষাভাষী মানুষেরা বহুদূরের ভূখণ্ড থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে নিজেদের আধিপত্য এবং দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বহুকাল আগে থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করা

draft copy

মানুষকে আর্য ভাষাভাষী মানুষেরা 'নিচু জাত' বলে হেয় করতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন মহাজনপদের অভিজাত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মগুরুরা।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতবর্ষের মহাজনপদভিত্তিক শাসনকাঠামোর অবসান ঘটে প্রাক-সাধারণ অব্দ তৃতীয় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের মধ্য দিয়ে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামের একজন শাসক। তিনিই প্রথম দক্ষিণ এশিয়ায় এককেন্দ্রিক রাজত্বে ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের মগধকে কেন্দ্র করে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান হয়। মগধের রাজধানী ছিল পাটালীপুত্র। এটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনায় অবস্থিত। মৌর্য শাসকেরা সুবিশাল সৈন্যবহর তৈরি করে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, বাংলার প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্র পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। মৌর্য বংশের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন সম্রাট অশোক। সম্রাট অশোকও ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালোভী শাসক। বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে অশোক মৌর্য সামাজ্যের সীমানা বহুদূর বৃদ্ধি করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন 'নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু' শাসক। নিজের সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির নেশাতেই কলিঙ্গ নামে একটি রাজ্য আক্রমণ করেন। বর্তমান ভারতের উড়িষ্যার রাজ্যের একাংশ ছিল প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অশোকের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে কলিঙ্গের সৈন্যরা অশোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি। ইতিহাসের নির্মমতম যুদ্ধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কলিঙ্গ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ কলিঙ্গবাসী অশোকের সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারান। যুদ্ধে বন্দী হন হাজার হাজার মানুষ। যুদ্ধের এই বিভীষিকা এতোই বেশি ছিল যে, মানুষের মৃত্যু আর রক্তপাত দেখে সম্রাট অশোক নিজেই শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই যুদ্ধের নির্মমতা দেখে সম্রাট অশোক রাজ্য বিস্তার নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও সকল জীবকে ভালোবাসার নীতি গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর নতুন যে ধর্ম ও রাজ্যপরিচালনা নীতি গ্রহণ করেন তা এক ধরনের স্তম্ভ লিপি বা প্রস্তর লিপির মধ্যমে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্তম্ভ লিপি হচ্ছে, পাথরের স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা লিপি। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্রাট অশোক তাঁর বাণী খোদাই করে এসব লিপি স্থাপন করেন। এই লিপিগুলোকে অশোকে ধম্ম লিপিও বলা হয়। প্রাকৃত ভাষায় ধর্মকে ধম্ম বলা হতো। অশোক তাঁর লিপিগুলোতে মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করা, মতের মিল না হলেও পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ এবং সহিষ্ণুতা বজায় রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

draft copy

সম্রাট অশোকের সময়ে স্থাপিত একটি স্তম্ভে লিখিত লিপি

অনুশীলনীঃ উপরের পাঠে আমরা সম্রাট অশোক এবং তাঁর কলিঙ্গযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা জানলাম। সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবতা সম্পর্কে ধারণা পেলাম। চলো এইবার নিচের শিরোনামটি পড়ি এবং তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করি-

সম্রাট অশোক ও কলিঙ্গ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

মৌর্য শাসকগণ তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যে শাসনকার্য পরিচালনা এবং আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বিচারক, রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদমর্যাদায় আসীন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলার পুণ্ড্রনগরের মতো দূরের এলাকাগুলোতে শাসনকাজ পরিচালনার জন্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হতো। প্রাদেশিক শাসকেরাও নিজেদের সুবিধার্থে আরও ছোট ছোট এলাকার জন্যে ছোট ছোট প্রশাসনিক পদধারী যোদ্ধা ও শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। এইভাবে কেন্দ্র থেকে শুরু করে একদম গ্রাম

draft copy

পর্যন্ত মৌর্য শাসকদের শাসনবলয় বিস্তৃত ছিল। মৌর্য শাসকদের একজন রাজকীয় উপদেষ্টা ছিলেন কৌটিল্য। তিনি চানক্য নামেও পরিচিত। কৌটিল্যের লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে "অর্থশাস্ত্র"। গ্রন্থটি থেকে মৌর্য শাসকদের শাসন-ব্যবস্থা, সমকালীন রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

দক্ষিণ এশিয়া বা প্রাচীন ভারতবর্ষে মৌর্য শাসকদের হাত ধরে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শুরু হয় তা পরবর্তীকালে কুষাণ, গুপ্ত, পুষ্যভূতি, চালুক্য, প্রতিহার, পাল, সেন, চোল, তুর্কী, খলজি, তুঘলক, লোদী, আফগান, মুঘল প্রভৃতি বংশ ও উপাধীধারী শাসকদের হাত ধরে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন রাজবংশের এসকল উচ্চাভিলাষী রাজাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই মূলত ভারতবর্ষে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ হয়। ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকারী এসব রাজাদের জাত, ধর্ম, ভাষা যাই হোক না কেন, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তারা নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি প্রচার ও বিস্তার করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ও দখলদারিত্ব চালিয়ে গেছেন।

মৌর্যদের পর দীর্ঘ সময় বংশানুক্রমিক শাসন ছিল গুপ্ত বংশীয় শাসকদের। সাধারণ অব্দ তৃতীয় শতকের দিকে গুপ্ত বংশের উত্থান হয়। গুপ্ত বংশীয় শাসকদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌর্য শাসকদের মতো গুপ্তরাও আক্রমণ ও দখল কার্য চালিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিরাট অংশ নিয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। পূর্বদিকে গুপ্তদের ক্ষমতা বাংলার সমতট এলাকা বা বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত শাসকেরা তাঁদের সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্যে প্রতিটি প্রদেশের মধ্যে ভুক্তি, বিষয়, বীথি, গ্রাম নামে ছোট ছোট প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তুলেছিলেন। স্তরবিন্যস্ত এই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের ক্ষমতাকে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত সুগম করেছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত শাসকদের মুদ্রা এবং ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে। এইসব মুদ্রা ও তাম্রলিপিগুলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

draft copy

গুপ্ত আমলের তাম্রলিপি। জমি বিক্রির দলিল।

মৌর্য এবং গুপ্ত শাসকদের উত্থান ঘটে মূলত প্রাচীন মগধ এবং উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলেও ঠিক এমনই কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশের উত্থান এবং বিকাশ লক্ষ করা যায় সাধারণ অব্দ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এর মধ্যে পাল, সেন, দেব ও চন্দ্র বংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পূর্বদিকে বরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার উত্থান হলেও পাল বংশের শাসকেরা এক সময় উত্তর ভারতের সৈন্য পরিচালনা করে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান এবং কনৌজ্য আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

ভারতের পূর্বাংশে রাজত্বকারী পালবংশের অন্যতম আগ্রাসী এবং ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন ধর্মপাল এবং দেবপাল। অষ্টম শতকের শেষেরদিকে উত্তর ভারতে দখল প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পাল বংশের শাসক ধর্মপাল এবং দেব পাল ছিলেন ত্রিমুখী সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি। চলো এই সংঘর্ষের প্রধান তিনটি পক্ষের নাম আরো একবার জেনে নেই- পূর্ব ভারতের পাল, ভারতের দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশ। তিনটি শক্তিশালী রাজবংশ মধ্য-ভারতের কনৌজ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্যে পরস্পর বিরোধী সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং অনেকগুলো রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধের যোগদান করে। এইসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার এবং সম্পদ লুণ্ঠনের লোভে নানান রকমের দ্বন্দ্ব সংঘাত আর আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। এইসব যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠতো বিপর্যস্ত।

draft

উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী এইসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের নাম-যশ প্রচারের জন্যেও অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। এবং সেই যুদ্ধের কথা অতিরঞ্জিতভাবে সগৌরবে প্রচারও করে বেড়াতেন। পাল বংশের রাজা ধর্মপালের খালিমপুর নামে একটি তাম্রলিপিতে অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় অতিরঞ্জিত বাক্য ও শব্দ দিয়ে উত্তর ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের কথা বলা হয়েছে।

খালিমপুর তাম্রলিপিতে ধর্মপালের রাজ্যবিস্তার, আগ্রাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে দখল অভিযানের প্রশংসা করা হয়েছে এইভাবে:

রাজা ধর্মপাল তাঁর মনোহর ভ্রুভঙ্গী বিকাশে (অর্থাৎ চোখের ইঙ্গিতে) কনৌজের রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন! ভোজ, অবন্তী, যদু, মৎস্য, মন্দ্র, কুরু, যবন প্রভৃতি রাজ্যের রাজা ও প্রশাসকেরা মাথা নত করে সাধু সাধু আওয়াজ করে এই ঘটনা সমর্থন করেছিলেন!

খালিমপুর লিপির কথা সত্য হলে ধরে নিতে হয় যে, পাল বংশের রাজা ধর্মপাল উপরে উল্লিখিত সকল রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর দখলে ছিল। কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেননি। ইতিহাসের পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করেও ধর্মপালের এই দাবির শতভাগ সত্যতা খুঁজে পাননি। উচ্চাভিলাষী রাজাগণ নিজেদের খ্যাতি প্রচারের মোহ থেকেই এইভাবে গৌরব প্রচার করে বেড়াতেন। খালিমপুর লিপি এই গৌরব প্রচারেরই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপরের পাঠের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করি-

- সাম্রাজ্যবাদী রাজাগণ কেন যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করতেন?
- নিজেদের গৌরব প্রচারের জন্যে রাজারা কী করতেন?
- উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী রাজারা যখন যুদ্ধ ও রক্তপাতে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন, সাধারণ প্রজাদের জীবনকে তারা কীভাবে প্রভাবিত করতো?
- রাজাদের গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখের থাকার কোন সম্পর্ক ছিল কী? তোমার কী মনে হয়?

দ্বাদশ শতকের শেষদিকে ঘুর বংশের শাসক মুহাম্মদ ঘুরী বর্তমান আফগানিস্তান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী শাসক। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ জয় করে নিজের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্যে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে নানানভাবে আক্রমণ ও দখল অভিযান পরিচালনা করেন। বারবার চেষ্টা করে জয়-পরাজয় এবং রক্তপাতের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে ১১৯২ সালে মুহাম্মদ ঘুরী ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য এবং কয়েকজন বাছাই করা সেনাপতি নিয়ে ভারতের তরাই প্রান্তরে উপস্থিত হন। মুহাম্মদ ঘুরী এক বছর আগেও তরাইন পর্যন্ত সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। দিল্লির অধিপতি রাজপূত যোদ্ধা পৃথ্বীরাজ চৌহান তাঁর এই আগ্রাসনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘুরী ভারত জয়ের আশা ত্যাগ করেননি। ১১৯২ সালে তাই আরও ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নেন। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। আগের বছর যুদ্ধের ময়দান থেকে ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দেন। এরফলে ঘুরীর সৈন্যরা যুদ্ধে জয়ের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে। ১১৯২ সালে তরাইনের প্রান্তরে দিল্লির শাসক পৃথ্বীরাজ চৌহানের সাথে মুহাম্মদ ঘুরীর আবারও যুদ্ধ বাঁধে।

draft copy

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ইতিহাসে এই যুদ্ধ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন। মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবাককে দিল্লীর শাসনকতা হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ ও মানুষের উপর তুর্কিদের আক্রমণের দরজা খুলে যায়। লক্ষ লক্ষ তুর্কি সৈনিক ও যোদ্ধা দিল্লিতে এসে কুতুবউদ্দিনের সৈন্যদলে যোগ দেয়। এইসব সৈন্যদের নিয়ে দিল্লির শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও দখল অভিযান পরিচালনা করেন। ১৩ শতকের গোঁড়ার দিকে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া এবং গৌড় আক্রমণ ছিল মূলত কুতুবউদ্দিন আইবকের দিল্লি-সাম্রাজ্য দখলেরই একটি ধারাবাহিকতার ফল।

তুর্কী যোদ্ধাদের হাত ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে মুসলিম রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই মুসলমানদের মধ্যেও ছিল নানান দল-উপদল, নানান তরীকা ও মতানৈক্য। এর ফলে দেখা যায়, দিল্লি থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে মুসলমান শাসকদের শাসনকার্য শুরু হলেও দিল্লির শাসকদের সাথে শুরু হয় নতুন এক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

দিল্লির মুসলিম শাসকদের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর মুসলিম শাসকদের দ্বন্দ্ব সংঘাত ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উচ্চাভিলাষী চাহিদা আর অর্থলিপ্সা দ্বারাই পরিচালিত। দিল্লির শাসকগণ চাইতেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য শাসকেরা সবাই দিল্লির অনুগত থাকুক, দিল্লির শাসকের নামে মুদ্রা জারি এবং খুৎবা পাঠ করুক, বেশি বেশি সম্পদ ও রাজস্ব প্রদান করুক। কিন্তু বাংলার মতো দূরবর্তী অঞ্চলের শাসকেরা দিল্লি শাসকের এই লোভকে কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। তারা নিজেরাও ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজেদের নামে মুদ্রা জারি, খুৎবা পাঠ করতেন। ধন-দৌলত সংগ্রহ করে বিলাসী জীবনযাপন করতে চাইতেন। এর ফলে প্রায়শই দিল্লি থেকে সৈন্য অভিযান পরিচালিত হতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রক্তপাতের ঘটনা ঘটতো। দিল্লির শাসকদের মধ্যে ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, ফিরুজশাহ তুঘলক, শেরশাহ, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ছিলেন শক্তিশালী উচ্চাভিলাষী শাসক। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক এবং নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আর ধন-দৌলত লাভের লোভে বাংলায় দখল অভিযান পরিচালনা করেছেন। বাংলার শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেও এইসব অভিযানে বাংলার সাধারণ প্রজারা চরম ভোগান্তি এবং দুর্ভোগের শিকার হতেন।

তুর্কি, খলজি, তুঘলক, লোদী, আফগান, মুঘল প্রভৃতি রাজবংশের শাসকেরা ভারতীয় উপমহাদেশের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। কিন্তু এতেও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না। এর ফলে দেখা যেতো, একজন শাসকের মৃত্যুর পর সিংহাসনের মালিকানা নিয়ে তাঁর পুত্র-কন্যারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমীর-অমাত্যরাও এই দ্বন্দ্ব এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দিতেন। এর ফলে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হতো।

মূলত নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি, উচ্চাভিলাষ, আর ক্ষমতার লোভেই শাসকগণ রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নানান নিয়ম-নীতি গ্রহণ করতেন। আইন-কানুন তৈরি, রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি এবং বাইরের আক্রমণ থেকে নিজের রাজ্য ও রাজ্যের প্রজাদের সুরক্ষিত রাখার উদ্যোগ নিতেন। এর ফলে নানান ধরণের প্রশাসনিক পদ ও দায়িত্বের সৃষ্টি হতো। রাজস্ব ও প্রশাসন সংক্রান্ত এইসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সাধারণ প্রজা, কৃষক, শ্রমিকদের সঙ্গে সাম্রাজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হতো। হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা এইসব প্রথা-পদ্ধতির মধ্য দিয়েই উপমহাদেশের মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিভিন্ন শাসক বিভিন্ন সময়ে একেকটি এলাকা দখল করে নতুন নাম-পরিচয় দিয়ে রাজ্য শাসন শুরু করেন। সে অঞ্চলের অধিবাসীরাও সেই নাম পরিচয়ে পরিচিত

draft copy

হয়ে উঠতে থাকেন। এভাবেই মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য এবং পরিচয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর দখলদার শাসক ও যোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য বা পরিচয় তৈরিতে প্রায় তেমন কোন ভূমিকাই রাখতে পারেননি। তারা ছিলেন শাসকশ্রেণির মানুষের হাতের খেলনার মতো। ১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাংলা এরপর প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। এইসময়েই প্রথম উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ এবং নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণে সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই সচেতনতার পেছনে ইংরেজ শাসকদের অতিমাত্রায় শোষণ নীতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে পশ্চিমা শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অনুসন্ধানী কাজ
দিল্লির শাসকদের সঙ্গে বাংলার মতো দূরবর্তী অঞ্চলের শাসকদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল শাসকশ্রেণির মানুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থবিত্ত লাভের লোভ এবং নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারের নেশা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উভয় শাসকের ধর্ম কিংবা ভাষা এক হওয়া সত্বেও তাঁরা যুদ্ধ আর দখলদারিত্ব চালাতেন। উপরের পাঠের আলোকে চলো বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সামনে একটি দলগত আলোচনার আয়োজন করি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুক্তিগুলো তুলে ধরি।

প্রতিরোধ আন্দোলন

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসকরা দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি একচেটিয়া রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিজেদের প্রয়োজনেই ইংরেজ শাসকরা এখানে পশ্চিমা শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষজন পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়।

আঠারো শতকে শেষ দিকে এসেই দক্ষিণ এশিয়ায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তমনা একদল মানুষের উত্থান ঘটে। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে ইউরোপ থেকে আগত অনেকেই তখন কেউ শিক্ষকতায় যুক্ত থেকে, কেউ সংগঠন করে, কখনও আবার পত্রিকা প্রকাশ এবং লেখালেখি করে সক্রিয় তৎপরতা চালিয়েছেন। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এমনই একজন ইউরোপীয় কবি, যুক্তিবাদী চিন্তক ও দার্শনিক। কোলকাতার হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও। শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, ডিরোজিও বিভিন্ন সংগঠন করে, সমমনাদের সাহায্যে পত্রিকা ছাপিয়ে, দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয়েছিলেন। আবার অক্টাভিয়াম হিউম ভারতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর বহুবিচিত্র প্রভাব পড়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তথা রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ অব্দ উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন, মুক্তমনা এই গোষ্ঠীটিই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়ের পর সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। পরবর্তী সময়ে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার প্রবর্তনের পাশাপাশি তাদের ইচ্ছামতো

draft copy

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের ছবি

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ফরাসি মিত্রদের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশী নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাই পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ সালের জুনের ২৩ তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সূচিত হয়। যুদ্ধটি কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মাইল) উত্তরে এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে, তৎকালীন বাংলার রাজধানী (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায়) হুগলি নদীর তীরে পলাশিতে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধকারীরা ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বাংলার শেষ নবাব এবং সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার নবাবী ক্ষমতা লাভ করার পর সিরাজউদদৌলা ইংরেজদের তাদের দুর্গের সম্প্রসারণ বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ নবাবের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে ঘুষ দেন এবং তাকে বাংলার নবাব করার প্রতিশ্রুতিও দেন। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে পলাশীতে সিরাজ-উদ-দৌলাহকে পরাজিত করেন এবং কলকাতা দখল করেন। সিরাজউদদৌলার পর প্রথমে মীর জাফর এরপর মীরকাশিমকে বাংলার নবাব করা হয়। ইংরেজদের হাতে ধরে নবাবী ক্ষমতা পেলেও মীর কাশিম ছিলেন একন স্বাধীনচেতা মানুষ। দক্ষিণ এশিয়া থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা লাভের স্বপন দেখেছিলেন মীর

draft copy

কাশিম। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম-এর সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে সাথে নিয়ে মীর কাশিম ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সাথে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালেমীর কাশিমের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাথে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। মীর কাশিম এই যুদ্ধে পরাজিত হন। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম পুনরায় ইংরেজ শিবিরে আশ্রয় নেন। সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান এবং অযোধ্যা ইংরেজ বাহিনীর পদানত হয়। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ছিল ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের ক্ষমতালাভ ছিল নিতান্তই আকস্মিক ও অনিশ্চিত। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং প্রায় দুইশো বছরের এক পরাধীনতার কালের দোয়ার উন্মোচিত হয়।

শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। প্রায় ১০০ বছর পর ব্রিটিশ ক্ষমতার ওপর প্রথম অতর্কিত এবং ভয়াবহ আঘাত হানে সিপাহী বিপ্লব। শত বছরের অন্যায় নিয়ম ভেঙে চুরমার করে দেবার প্রয়াস চালায় ভারতীয় সেনারা।

সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহ বা সৈনিক বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে শুরু হওয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সিপাহিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। ক্রমশ এই বিদ্রোহ গোটা উত্তর ও মধ্য ভারতে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তর মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লি অঞ্চল) ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, মহাবিদ্রোহ, ভারতীয় বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও ১৮৫৮ সালের গণ-অভ্যুত্থান নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় নির্মমভাবে। বহু নিরপরাধ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

কোম্পানি শাসিত অঞ্চলগুলো নিরব থাকলেও অযোধ্যার মতো কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহীরা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চূড়ান্ত দেশপ্রেমের নিদর্শন স্থাপন করে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈ, তুলসীপুরের রানি ঈশ্বরী কুমারী দেবী প্রমুখেরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লোকনায়কে পরিণত হন। অন্যান্য প্রধান নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন নানা সাহেব, তাতিয়া তোপি, কুনওয়ারসিং প্রমূখ ইত্যাদি সামন্ত রাজা ও সৈনিকেরা। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন তারা কোনো উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে ভারতে কোম্পানি-শাসনের অবসান ঘটে, ব্রিটিশরা সেনাবাহিনী, অর্থব্যবস্থা ও ভারতীয় প্রশাসন পুনর্গঠনে বাধ্য হয়। ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটেনের রানির শাসনের অধীনে আসে।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অংশ। স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। আন্দোলনের রণকৌশলের অন্তর্গত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন। স্বদেশী আন্দোলনের উৎস ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। এটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত চলেছিলো

আইন অমান্য আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলন হচ্ছে অনৈতিক আইন ও শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহী আচরণ।

draft copy

এই ব্যবস্থাটি ভারতের অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন। আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়। এটি ছিল মূলত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এ আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেসও এবছরকে 'পূর্ণ স্বরাজ' এবং ২৬ জানুয়ারিকে পূর্ণ স্বরাজ দিবস' হিসেবে পালন করে। এজন্য আইন অমান্য আন্দোলনকে চূড়ান্ত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত সমস্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আইনগুলি অমান্য করে পরবর্তীকালে ভারত থেকে ব্রিটিশদের গদি উপড়ে ফেলেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

"ভারত ছাড়ো"- এই স্লোগান রচনা করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতা ইউসুফ মেহের আলি। উনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভারতের স্বাধীনতার জন্য উনি আটবার জেলে গিয়েছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ব্রিটিশ আমলাদের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচার এই আন্দোলনের আগে চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। আপামর ভারতবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তাঁদের বিক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগের কাজটা করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের একজন মহান নেত্রীর নাম হল মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর সাহস ছিল অপরিসীম। তিনি "গান্ধীবুড়ি" নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁকে আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আপামর ভারতবাসী।

ইংরেজ ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলত একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ এশিয়ায় রাজ ক্ষমতা দখলের পর তারা তাই ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও নীতি লঙ্ঘন করে বাণিজ্য সুবিধা নিতে শুরু করে। বাংলার কৃষকদের দিয়ে জোর করিয়ে নীল চাষা করানো, বাংলা থেকে রপ্তানি করা বস্ত্রের উপর অধিক হারে কর ধার্য সহ নানান বৈষম্যমূলক নীতি তারা গ্রহণ করে। এর ফলে নীল বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের জনযুদ্ধ গড়ে উঠে। এইসব আন্দোলনে এখানকার সামান্য কৃষক এবং শ্রমিক থেকে শুরু করে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগ দেয়। সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখের মাধ্যমে বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনও শুরু হয়। ইংরেজ শাসক ও লুঠেরাদের হত্যা করে ভর দেখিয়ে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায় বিপ্লবীরা। অন্যদিকে কংগ্রেস সহ কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি থেকে ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতা খর্ব করে মানুষের অধিকার আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া পেশ করতে শুরু করে।

ব্রিটিশ বিরোধী অসংখ্য আন্দোলন, বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা দমন নীতি প্রয়োগ করে এসব আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। তবে, একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, অন্যদিকে ভারতবর্ষ জুড়ে এসব আন্দোলন-সংগ্রাম, জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্রিটিশদের মনে ভয় ধরিয়েছিল, তাদেরকে ভাবিত করেছিল। ফলে প্রায় ২০০ বছরের লুণ্ঠন এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের সাথে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান ঘটে। একই সাথে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের হাজার বছরের, হাজারো শাসকের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও সমন্বয় ঘটে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়।

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় যে আটটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে তা মূলত হাজার বছরের রাজনৈতিক আগ্রাসন, দখল অভিযান, বিভিন্ন রাজ-শক্তির উত্থান-পতন এবং এ অঞ্চলের মানুষের অধিকার আদায়ের ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামেরই ফল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলেও

draft copy

রাজনীতি এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে এখনও মানুষের অধিকার পূরণ এবং কল্যাণ সাধনে শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে বলা যাবে না। বিভিন্ন সময়েই সামরিক শাসকদের উত্থান, বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। এতকিছুর পরেও মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেকবেশি অধিকার সচেতন। রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে মানুষের অংশগ্রহণও এখন সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানুষেরা একটি সুষ্ঠ ও জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রেখে আর্ত-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

চলো, ব্রিটিশ শাসনামলে সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর উপর একটি প্রতিবেদন লিখি। এইসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছে, প্রতিবেদনে তা সময়ের ক্রম অনুসরণ করে তা সনাক্ত করার চেষ্টা করি।

ব্রিটিশ ভারতের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ

---

draft copy

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুঃ মানবতা ও মানুষের মুক্তির প্রতি অঙ্গীকার

বাংলা অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস কত হাজার বছরের পুরনো? নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগেও যে বাংলা অঞ্চলে মানুষের বিচরণ ছিল তা আমরা ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলো পাঠ করে ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছি। আদিকালে বাংলা অঞ্চলে নানান স্থানের নানান রকমের মানুষ একের পর এক বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার বিশেষ ভূ-প্রকৃতি তাদেরকে দিয়েছে নানান সুবিধা-অসুবিধা আর টিকে থাকার পথে নানান রকমের চ্যালেঞ্জ। বাংলায় মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস তাই একদল মানুষের নিজস্ব প্রাণশক্তির ইতিহাস। দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সমন্বয়ের বৈচিত্র্যে সাজানো ইতিহাস। প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় আরও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী রাজশক্তির আগ্রাসন এবং দখল অভিযান। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় দূরের-ভূখন্ড থেকে আগত শাসক, যোদ্ধা এবং ক্ষমতালোভী এলিট সম্রাট, রাজা বা সুলতানেরা বাংলার মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। সম্পদ ও ক্ষমতা দখল করেছে। শোষণ ও নির্যাতন করেছে। সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে এই শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ এবং বিদ্রোহ করেছে। মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে। কখনও আংশিকভাবে সফল হয়েছে, কিছুদিন পরেই আবার আবদ্ধ হয়েছে পরাধীনতার শৃঙ্খলে।

অনুসন্ধানী কাজ

দূরের-ভূখন্ড থেকে আগত শাসক, যোদ্ধা এবং ক্ষমতালোভী এলিট সম্রাট, রাজা বা সুলতানদের ৪/৫ জনের নাম লিখতে পারবে? প্রথমে আমরা নিজে নিজে নাম মনে করার চেষ্টা করি। ৬ষ্ঠ আর ৭ম শ্রেণিতে এমন কয়েকজনের নাম তোমরা পড়েছিলে। নামগুলো এবার লেখার চেষ্টা করি। এরপর কয়েকটি দল গঠন করে দলবদ্ধভাবে নামগুলো নিয়ে আলোচনা করি। শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নামগুলোকে আবার যাচাই করে নেই। সবগুলো নাম ব্ল্যাকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ডে লিখে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

সম্পদ ও ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ এবং প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠার ইতিহাসও কিন্তু বহু শতাব্দীর পুরনো। একাদশ শতকে পাল বংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন দিব্য। এই দিব্য ছিলেন কৈবর্ত বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি। একইসঙ্গে তিনি ক্ষমতাবান একজন সামন্ত হিসেবেও নিজের অবস্থান তৈরি করেছিলেন। সেই হিসেবে এই বিদ্রোহকে বলা যেতে পারে ক্ষমতাবানদের নিজেদের লড়াই। তবে এই লড়াইয়ে দিব্যর সঙ্গে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষেরাও অস্ত্র ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যেই হয়তো ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষেরা এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়েছিলেন। যাহোক, বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এইরূপ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং শাসক শ্রেণির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে লড়াই তীব্র রূপ ধারণ করে ব্রিটিশ শাসনামলে। ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্যে এমনকিছু নীতি গ্রহণ করেছিল যার অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগর সহ সকল সাধারণ

draft copy

পেশাজীবী মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এর ফলে ব্রিটিশ শাসক ও তাদের অনুগত জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষ সশস্ত্র প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন সহ নানান রকমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন এইসময় সংঘটিত হয়।

অনুশীলনী কাজ

ক্ষমতালোভী শাসক ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে বাংলা অঞ্চলের মানুষ যুগে যুগে অস্ত্র ধারণ করেছে। অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে। বাংলা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এই অভ্যাস বাংলার ভৌগোলিক বাস্তবতার সাথেও সম্পৃক্ত। জল-জঙ্গল-কাদা, ঝড়-তুফান, বন্যা, হিংস্র পশু ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের সাথে মানুষের বসবাস ছিল এখানে। বাংলার ভূপ্রকৃতি একদিকে মানুষকে অফুরান খাদ্যের যোগান দিয়েছে, অন্যদিকে নানান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার কৌশল শিখিয়েছে।

উপরের এই লেখা পাঠ করে চলো, এর পক্ষে বা বিপক্ষে মুক্তমনে ভাবি এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করি-

---

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে এই সময় ভারত ভাগ করে তৈরি করা হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে পৃথক দুটি রাষ্ট্র। একই কারণ দেখিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের একটি অংশকেও যুক্ত করা হয় প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলার দুই অংশের মধ্যেই নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মানুষের বসতি ছিল। একইসঙ্গে ছিল একই ধর্মের নানান তরিকার মানুষের বসতি। এই বৈচিত্র্য আর বহুত্বের বাস্তবতার মধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র। বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশের (পূর্ব বাংলার) মানুষ পাকিস্তান শাসন কাঠামোর অধীনে নতুন এক শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সকল সুবিধা নিজেদের দখলে নেন। বাংলার পূর্বাংশের মানুষের সঙ্গে প্রভূর মতো আচরণে

draft copy

লিপ্ত হন। এর ফলে পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে চরম বিক্ষোভ তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই শুরু হয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত করার লড়াই। আর বাংলার মানুষের এই লড়াই ও সংগ্রামে যিনি অগ্রভাগে থেকে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অত্যাচারী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এইজন্যেই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই বিজয় ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয়। খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, কারিগর সহ বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের বিজয়। এই বিজয়ের পথ সহজ ছিল না। তা একদিনে আসেনি। এর পেছনে রয়েছে রক্তক্ষয় আর আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাংলার জল-কাদা-পলিমাটি থেকে উঠে আসা একজন মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিকতা, সাহস আর আত্মত্যাগের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসা থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে ভালোবাসা জানাচ্ছেন। পেছনে তাঁর কন্যা, বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা। ছবির সময়কাল: ২৩ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত 'ব্রিটিশ ভারত' উপনিবেশের পূর্ব-প্রান্তে বাংলা নামক একটি প্রদেশের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) পূর্ব অংশে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায়। তোমরা জানো যে, বর্তমানে গোপালগঞ্জ পৃথক একটি জেলা হিসেবে বিদ্যমান। দিনটা ছিল ১৯২০

draft copy

সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষ এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ব্রিটিশ ভারত থেকে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করে মুক্তি লাভের জন্যে চারিদিকে তখন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। মাত্র ষোল বছর বয়সেই শেখ মুজিবের ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, স্বাধীনতা আনতে হবে। এই দেশে ইংরেজদের থাকার কোন অধিকার নেই। বঙ্গবন্ধু তখন স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুনতেন।

মূলত মানুষের মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই সেই সময়ের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তরুণ মুজিব পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই সকল মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। মুসলিম লীগের কর্মী হলেও মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ছিল ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে। ১৯৪৭ সালের আগে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং মহামারীর সময় শেখ মুজিব নিজেকে কেবল একটি ধর্ম পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। বরং এইসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নানান তরিকার হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সহ সকলের পাশে দাড়িয়েছিলেন। দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের পাশে দাড়িয়েছেন। ১৯৪৭ সালে তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়টের বিরুদ্ধে কোলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদকে সমর্থন করেন।

বঙ্গবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধীর ছবি

তোমরা নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে, ভাষা আন্দোলন দুই দফায় সংঘটিত হয়েছে। প্রথমবার ১৯৪৮ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫২ সালে। ১৯৪৮ সালেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী তথাকথিত অভিজাত শাসকেরা বাংলার পূর্ব অংশের মানুষের উপর নতুন করে শোষণের এক জাল বিস্তারের নীল নকশা আঁকতে শুরু করেছেন। শেখ মুজিব বুঝতে পারেন, পাকিস্তান নামের নতুন এই কাঠামো কেবলই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের এক রাজনৈতিক খোলস বদল মাত্র। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে নতুন করে আবারও বিক্ষোভ-সংগ্রামে লিপ্ত হন।

draft copy

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষের উপর প্রথম আঘাত আসে ভাষার প্রশ্নে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উর্দু ভাষাভাষী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ শুরু করেন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে এইদিন ঢাকা শহর মুখর হয়ে উঠে। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল এবং ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থী, সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষের পদচারণায় আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছায়। পাকিস্তানি শাসকেরা এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে পুলিশী নির্যাতনের পথ বেছে নেন। মিছিল ও ধর্মঘটে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থী-জনতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিব, অলি আহাদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা সহ অনেককেই সমাবেশ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

ভাষা শহীদদের স্মরণ ও আয়োজিত ভোরের র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাজউদ্দীন আহমেদ। ছবির সময়কাল: ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

draft copy

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী", "কারাগারের রোজনামচা", এবং "আমার দেখা নয়াচীন"- এই গ্রন্থগুলো পাঠ করলে বিক্ষোভ, সংগ্রাম, মিছিল ও প্রতিবাদে মুখর উত্তাল এই দিনগুলির চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মিক সম্পর্ক, পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাংলার মেহনতী কৃষক, শ্রমিক সহ প্রতিটা মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সমস্ত দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বঙ্গবন্ধু শুনেছেন। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে বারবার জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সময়কালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার গ্রেফতার করা হয়েছে। মিথ্যে মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাঁকে দমানো যায়নি। কেননা, বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের সবরকম অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে ততোদিনে প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তারা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পরম আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক। [১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জনসভায় আইয়ুব খানের মার্শাল ল-এর প্রতিবাদ করছেন – এই চিত্র যাবে।]

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি নামে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রস্তাবিত এই ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা। ৬ দফার পক্ষে সমগ্র দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব বাংলার নদী আর কাদামাটির পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। গণসংযোগ করেন। মানুষের এই ব্যাপক সমর্থন পাকিস্তানি শাসকদের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালেই সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় গণ সংযোগ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হলে বাংলার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সাথে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটের মধ্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। এইসব হত্যা এবং দমননীতি দিয়েও বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে আটকে রাখা যায়নি। ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে বক্তৃতা করছেন।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বঙ্গবন্ধু এই অভিযোগে আবারও গ্রেফতার হন। মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার-কুমার সহ আপামর জনতা যোগ দেয়। দেশজুড়ে গণ আন্দোলন গড়ে উঠে। জনগণের এই চাপের মুখে পাকিস্তানি শাসকেরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু সহ অন্যান্য সকল আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা সভাতেই কয়েক লক্ষ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর

draft copy

রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত জনসভার ছবি যাবে। এ বছরই ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন,

এক সময় এদেশের বুক হতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ...জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

এভাবেই 'বাংলাদেশ' আমাদের হলো। সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ একজন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তৈরি হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের এই রায় দেখে বিচলিত হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্যে তারা নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের এই ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার প্রতিবাদে দেশজুড়ে হরতাল, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে এতো সহজে বাংলার মানুষের মুক্তি মিলবে না।

১৯৭১ সালের ৭মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। শোষন মুক্তি এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি প্রকারান্তরে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিতাড়িত করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের ঘোষণা দেন। রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।"

বাংলার মানুষকে মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। পাকিস্তানের শাসক ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একদিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ, অন্যদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাংলার মানুষ ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ প্রত্যাখান করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা চালাতে শুরু করে। এর ফলে ইয়াহিয়া খানের শাসনব্যবস্থা ধ্বসে যায়।

পাকিস্তান সরকার ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বাংলার নিরীহ মানুষের উপর মরণাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের এক নির্মমতম ও বর্বর গণহত্যা চালায়। তারা আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ে রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়াটার। [২৫ মার্চ রাতে পরিচালিত গণহত্যার ২/৩ টি ছবি যাবে] ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

draft copy

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপঃ

"এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (প্রকাশ সাল ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৯)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের যুদ্ধে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন। স্থান: ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। ছবির সময়কাল: ১৯৭২

draft copy

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা শুনে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাত ১টা ৩০মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে

যাওয়া হয় পাকিস্তানের লয়ালপুর জেলখানায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙ্গালি জনগণের উপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল তা পরবর্তী নয়মাস ধরে চলতে থাকে। সৈন্যরা নয় মাসে প্রায় ত্রিশ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, হাজার হাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে, বাংলার অসংখ্য ঘর-বাড়ি আর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে এতো কিছু করেও তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার প্রায় প্রতিটা গ্রাম আর ঘর থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে মুক্তি আর বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

অনুশীলনঃ প্রতিবেদন লিখি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বাংলার মেহনতী মানুষ, সাধারণ কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার অধিকার আদায়ে দাবি মিলেমিশে একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আর সেই লক্ষ্যই পূরণ হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। উপরের পাঠের আলোকে চলো এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখি। প্রতিবেদনে নিচের বাক্যটির সত্যতা অনুসন্ধান করি-

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে নানান ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন তার মূল কথা হচ্ছে মানবতা ও মানুষের মুক্তি।"

যুদ্ধের সময় এবং পরাজয়ের পরেও পাকিস্তান সরকার মিথ্যে মামলায় সাজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদদের চাপের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ১২ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে মানুষের নানান প্রত্যাশা আর মতভিন্নতার মধ্যেই দেশ গড়ার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

তুমি কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কাকে বলে এখন চিন্তা করে বলতে পারবে? তোমার বন্ধু সাথে, পরিবারের সদস্যদের সাথে, শিক্ষকের সাথে এটা নিয়ে কথা বলো। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেটুকু তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছো তাঁর আলোকে চলো মুক্তমনে বিষয়টা নিয়ে ভাবি। ৯ম আর ১০ম শ্রেণিতে তোমাদের জন্য আরো বিস্তারিত পরিসরে এই ইতিহাস অপেক্ষা করছে। তবে এ পর্যন্ত আমরা যতোটুকু শিখলাম সেখানে বাঙলা অঞ্চলে হাজার বছরের ইতিহাসে একদল মানুষের টিকে থাকা এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামী অভিজ্ঞতাই কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? বহু দূরের ভূ-খন্ড থেকে বিভিন্ন সময়ে নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার এবং ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের মতলবে সুবিধাবাদী কিছু এলিট বারবার নানান উপায়ে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সেই মানুষের মুক্তি এবং নিজের মতো করে বাঁচা ও জীবন গঠনের স্বাধীনতাই কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা?

আমার ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আর জীবন-যাপনের স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে-মিশে আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের দেশ নিজে গড়ে তোলার স্বাধীনতা আর সর্বপ্রকার অর্থে মুক্তির

draft copy

নিশ্চয়তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। বঙ্গবন্ধু নিজে এই চেতনায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাঠে-খামারে কৃষকের সাথে কাজ করতে শুরু করে। কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেদেরকে যুক্ত করে। গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষরতা দূর করতে দিন-রাত তারা কাজ করেছে। এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে, শহরে, পাড়ায়, মহল্লায়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মানুষের কল্যাণে নিজ হাতে স্বদেশ গড়ে তোলার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এরকম অসংখ্য উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর যে আগুন জ্বলেছিল (মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ গ্রন্থে।

যাহোক, বাংলায় মানুষের উপর পাকিস্তানি শাসকদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন আর শোষণের কথা তোমাদের সকলের এখন জানা। বাংলার সাধারণ মানুষ কীভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতালিপ্সু শাসকদের বিতাড়িত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে তারও কিছু কিছু তোমরা অনুসন্ধান করে অনুধাবন করেছো। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ঠিক একইভাবে অত্যাচারী ও ক্ষমতালোভী রাজা, যোদ্ধা ও শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলিভিয়া, কলম্বিয়া, তিউনিসিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউক্রেনের নাম বলতে পারি। আবার অনেক দেশ রয়েছে যেখানে এখনও মানুষ নিজের ভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে নানান জায়গায় যুগে যুগে নানান রাজশক্তির উদয় হয়েছে। অর্থ ও ক্ষমতালোভী যোদ্ধা এবং রাজাগণ নিজেদের স্বার্থের লোভে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। তবে ইতিহাস পাঠ থেকে তোমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে, মানুষকে শোষণ করে তৈরি করা ক্ষমতার প্রাসাদ এক সময় সাধারণ মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই ভেঙে যেতে বাধ্য।

আর একটা তথ্য তোমাদেরকে জানাই। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে।'

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই এই দুই ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একদল মানুষ নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে-মিশে সুন্দর একটা জীবন পরিচালনা করেছে। অন্য একদল মানুষ বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবহর নিয়ে সেইসব সাধারণ মানুষের উপর দখলদারিত্ব করেছে। আর তার ফলে মানুষের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। মানবতা হয়েছে ভুলুণ্ঠিত। ক্ষমতালোভী শাসকের অত্যাচার আর শোষণে জর্জরিত হয়েছে জনজীবন।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ ও অনুসন্ধান করে আমরা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত করবো এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যেখানেই শাসক ও শোষিত শ্রেণির উপস্থিতি দেখতে পাবো, বঙ্গবন্ধুর মতো আমরা নিজেরাও শোষিতের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করবো। আমরা প্রত্যাশা করবো, একদিন মানবতার জয় হবে। সকল ভেদাভেদ দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষের জয় হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে।

draft copy

অনুসন্ধানী কাজ

বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা ধারণ করলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা বোধ করা যায়। উপরের পাঠের আলোকে বঙ্গবন্ধুর উদ্বৃতি সহ চলো এই একাত্মতার বিষয়টি নিজের ভাষায় বর্ণনা করি-

draft copy

ব্যক্তি জীবনে সামাজিক কাঠামো

একটি ক্লাসে একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন ও কয়েকজন শিক্ষার্থী বসে আছে

নবম শ্রেণির একটি ক্লাসে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বল তো কারা মাঠে কাজ করেন?

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গতিশীলতা

সহজক উত্তর শিক্ষার্থীরা সমস্বরেই বলল-কৃষক। এবার শিক্ষক বললেন, ভেবে আরও দুচার জনের কথা বলবে, তবে যারা বলতে চাও তারা হাত তুলবে, আমি একে একে বলার সুযোগ দেব। সবাই একসাথে বললে একটা কলরব হয়, তাতে অন্য শ্রেণির পাঠের অসুবিধা হবে। এটা মনে রেখো। তখন একজন বলল- যারা মাটি কাটেন। চমৎকার, বললেন শিক্ষক। এরপর ওরা একে একে হাত তুলে বলল-ক্ষেত মজুর, রাখাল, একজন বলল মহিলা শ্রমজীবীদের কথা, যারা ধান রোপায় ও কাটায় অংশ নেন, সব্জী ক্ষেতে যত্ন নেন, এমনকি অনেকে মাটি কাটার কাজও করেন। পরের দিন ক্লাসের নীরা এসে যখন বলল, ওদের শহরের বাসায় গাঁ থেকে দু'জন চাষি এসেছিলেন। ওর মা ওদের খেতে দিয়েছিল মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে, টেবিল-চেয়ারে নয়। ওরা শহরে বেড়াতে এলেও ওদের পরনে ছিল পাঞ্জাবির সাথে লুঙ্গি, পাজামা বা প্যান্ট নয়। তখন নজরুল বলল, আমি দেখেছি, অনেক রেস্টুরেন্টেই পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের টেবিল-চেয়ারে বসে খেতে দেয় না, খাবারটা কিনে ওরা বাড়ি নিয়ে যায় অথবা ফুটপাতে বসে খায়। এবারে কুসমি বলল, আচ্ছা আমার মা তো তাঁর কাজের সহকারি মনার মা-

draft copy

খালাকে আমাদেরেই সাথে টেবিলে বসে খেতে বলায় উনি বেজায় আপত্তি করলেন এবং কিছুতেই রাজি হন নি। রান্না ঘরে বসেই তৃপ্তি করে খান। অনেকেই তখন বলল, হ্যাঁ ব্যাপারটা সবার বাড়িতেই এরকম। কেবল মনি বলল, যে ওদের খালার একটাই মেয়ে এবং সে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার পড়ার খরচ ওর মা-ই দেন। তো সেই শামিম আপা যখন হোস্টেল থেকে বাসায় আসেন তখন তিনি কিন্তু ওদের সাথে সচ্ছন্দে টেবিলে বসেই খান। ওদের এসব কথাবার্তায় শিক্ষকও অংশ নিয়েছেন। ওদের কথাগুলো ভালোভাবেই শুনেছেন। এবার তিনি বললেন- তোমাদের আলোচনার মাধ্যমে তোমরা সমাজপাঠের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তুলে এনেছ। অনেকেই বলল, কী বিষয় স্যার? তপন বলল, আমরা বিষয়টা জানতে চাই। তখন শিক্ষক বললেন, চলো, বিস্তারিতভাবেই সমাজের স্তর বিন্যাস এবং সমাজ যে গতিশীল ও পরিবর্তনমান তা জানার ও বোঝার চেষ্টা করি।

অনুশীলনীর কাজ ১: আচ্ছা আমরা কি চিন্তা করি কিছু মানুষ কেনো আমাদের মতো টেবিলে বসে খেতে পারে না বা নিজ থেকে খেতে চায় না? আবার, মনা খালা না পারলেও উনার মেয়ে শামীম আপু কেনো একসাথে খাবার টেবিলে খেতে পারছে? আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি সমাজের এই ভেদাভেদ কিভাবে তৈরি হল? আমাদের ভাবনাগুলো আমরা নিচে লিখে রাখি।

সমাজিক ভেদাভেদ সম্পর্কে আমার কিছু ভাবনা

draft copy

সামাজিক স্তরবিন্যাস

সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা একে অন্যের থেকে বিভিন্ন কারণে আলাদা। এ পার্থক্য তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছরে মানুষ যখন শিকার বা খাবার সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত তখন থেকে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য দিনে দিনে বেড়েছে । সেই যূথবদ্ধ সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষকে বাড়ি নির্মাণ, খাদ্য সংগ্রহ, খাবার তৈরি, সন্তান লালন-পালনসহ নানান কাজের কোনটা কে করবে তার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আর এ কাজ করতে গিয়ে মানুষে মানুষে সামাজিক পার্থক্য তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে মানুষের ভূমিকার

(role) ভিন্নতার জন্য সামাজিক পার্থক্য তৈরি হয়। প্রাচীন সমাজে প্রথম দিকে মানুষের ভূমিকার এই ভিন্নতাকে উঁচু-নিচু ভাবা হত না, কিন্তু পরবর্তীকালে ভূমিকার সাথে মর্যাদা (status) যুক্ত হওয়ায় মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ বাড়ে। দেখা গেল সমাজ যত সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, মানুষের মধ্যকার পার্থক্য তত বেড়েছে। এ পার্থক্যই একসময় সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্ম দেয়।

স্তরবিন্যাস ধারণাটি প্রথমদিকে ভূ-তত্ত্ববিদরা ব্যবহার করেন পথিবীর অভ্যন্তরীণ শিলার স্তরবিন্যাস বোঝাতে। আমাদের বসতি এই পৃথিবী ভূ-ত্বক থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত কতগুলো স্তরে বিভক্ত। ভূ-অভ্যন্তরের এই ভাগগুলোর মত সমাজও নানান স্তরে বিভক্ত। সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজে বসবাসরত মানুষের সম্পদ, আয়, শিক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে ভেদাভেদকে নির্দেশ করে।

সম্পদ ও আয়ের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সম্পদ ও আয়ের তারতম্য বিচারে আর্থিক শ্রেণিসমূহের উদ্ভব ঘটে থাকে। আধুনিক কালে প্রায় সব সমাজে মানুষকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে ভাগ করতে দেখা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে পদমর্যাদাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন ব্যক্তির কাজ ও ভূমিকা, পোশক-আশাক ও চালচলন ইত্যাদি তার পদমর্যাদাকে নির্ধারণ করে। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন পদমর্যাদা ভিত্তিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। আবার ক্ষমতার অসম বন্টনের ভিত্তিতে সমাজকে স্তরায়িত করা হয়।

শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতেও সামাজিক স্তরায়ন লক্ষ করা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত পেশার সঙ্গে যারা সম্পর্কযুক্ত তারাই মূলত সামাজিক স্তর বিভাজনের উচ্চে অবস্থান করেন। বস্তুত শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার তারতম্যে সমাজে নানা শ্রেণির উদ্ভব ঘটে থাকে।

মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ীও সামাজিক স্তরায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। শ্বেতকায় নরগোষ্ঠীকে সৃজনশীল, দক্ষ, সক্ষম, অধিক মেধার অধিকারী তথা সব বিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং কৃষ্ণাঙ্গ, মঙ্গোলীয় এবং অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীকে শ্বেতকায়দের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মতবাদ দিয়েছেন কেউ কেউ। অবশ্য এ ধরনের মতবাদ এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক পার্থক্য বা জেন্ডার অনুসারেও সমাজের স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। নারীদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল আর পুরুষদেরকে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ভাবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ সব সমাজে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের মর্যাদা ও ক্ষমতা বেশি, যদিও এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সব সমাজেই লক্ষ করা যায়। সমাজে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণের স্তরবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ বলে একদল সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন। একটি সমাজে নানান ধরনের পেশার মানুষ জড়িত। এ পেশাগুলোর মধ্যে কিছু কাজ করা সহজ এবং সেজন্য খুব বেশি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আবার কিছু কাজের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত কাজের জন্য মেধা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয়, সে কাজগুলো সমাজে বেশি গুরুত্ব বহন করে। আর যারা এ সমস্ত কাজের সাথে জড়িত তারা সমাজে বেশি সম্মানও পায়, বেশি আয় করেও তারা বাড়তি ক্ষমতার অধিকারী হন। সমাজবিজ্ঞানী ডেবিস ও মূর মনে করেন এধরনের সামাজিক ব্যবস্থা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক, কারণ এর মাধ্যমে মেধাবীদের আকৃষ্ট করা যায় এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে। তবে এ মতবাদের সমালোচনা করেছেন কার্ল মার্কস ও অন্যান্য কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী। তাদের মতে সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজের সকলের জন্য নয়, বরং অল্প কিছু মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের মতে সামাজিক স্তরবিন্যাস আসলে সমাজে শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখে।

draft copy

অনুশীলনী কাজ ২: উপরের পাঠ থেকে আমরা জানতে পারলাম বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস করা হয়েছে। আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো লিখি।

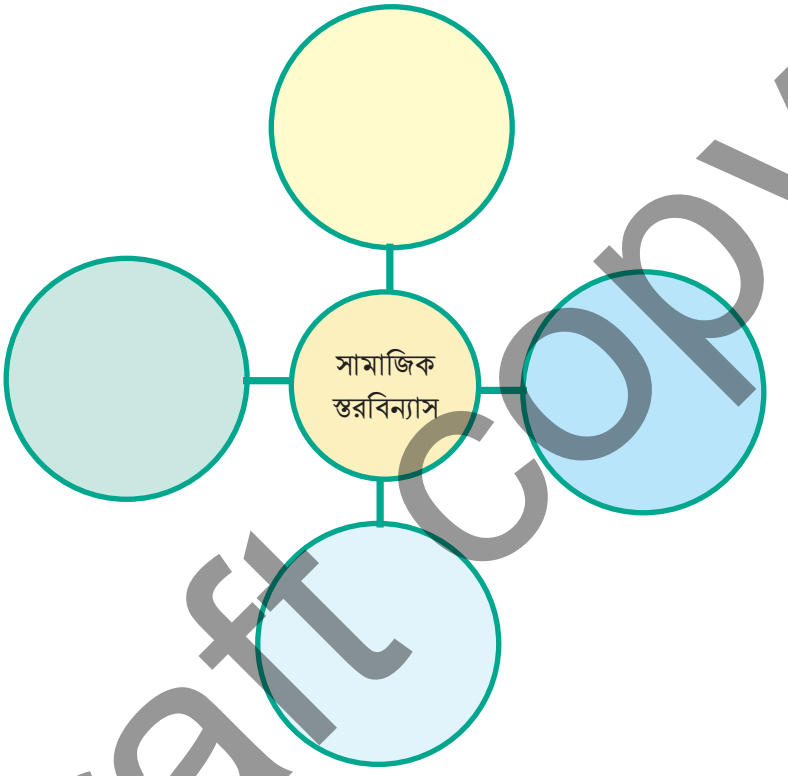

সামাজিক স্তরবিন্যাসের উৎপত্তি কারণ

সমাজে স্তরবিন্যাসের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। কিছু সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উৎপত্তি যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে নিহিত। বিজয়ী গোষ্ঠী পরাজিত গোষ্ঠীকে পদানত করে অর্থাৎ সমাজে বিজয়ীরা উচ্চশ্রেণি এবং পরাজিতরা নিম্নশ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য হয়। সে জন্য সমাজে বিজিত ও পরাজিত গোষ্ঠীর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার তারতম্য ঘটে এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের সূত্রপাত হয়।

অনেকেই আবার এই মতটি সমর্থন করেননি। তাদের মতে সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্তরবিন্যাসকে ত্বরান্বিত করে মাত্র, এর সূচনা ঘটায় না। কারণ সমাজ শান্তিপূর্ণ হোক আর যুদ্ধবিগ্রহে জর্জরিতই হোক, যেকোন পরিস্থিতিতে কোন না কোন ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজে গড়ে উঠতে পারে। মানুষে মানুষে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতীয় সমাজের অধিবিসীরা এক সময় অন্য বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং এর ফলে বর্ণবাদের মত সামাজিক স্তরবিন্যাসের উদ্ভব হয়েছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে ভারতীয় হিন্দু সমাজে বর্ণবাদের ভিন্ন

draft copy

একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে। এ বিষয়ে আমরা পরে সংক্ষেপে আলোচনা করব। একইভাবে বর্ণ গায়ের রঙ হল আমেরিকার সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম কারণ। সম্পদ, মার্যাদা বা ক্ষমতার তারতম্য সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি প্রধান কারণ বলে কেউ কেউ মতামত দিয়েছেন। দুষ্প্রাপ্যতা অথবা সরবরাহের স্বল্পতা থাকার কারণে সমাজের সকল মানুষ কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে পারেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিভিন্ন কর্পোরেশন কিংবা সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উচ্চ পদস্থ পদের সংখ্যা খুবই সীমিত। আবার এসব পদ-পদবি মানুষের কাছে অধিকতর কাঙ্ক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। তাই উচ্চ অবস্থান ও ক্ষমতার দুষ্প্রাপ্যতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামাজিক স্তরবিন্যাস স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়। সমাজ ও কাল তো বহমান, তাতে পরিস্থিতি বদলায়, তখন পরিবর্তিত বাস্তবতা অনুযায়ী স্তরবিন্যাসের নানান রূপ আমরা দেখতে পাই। যেমন এককালে দাসপ্রথা ছিল সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন, যা অনেকদিন আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার শ্রেণি হল আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রধানতম ধরণ যা প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। প্রাচীনকালে স্তরবিন্যাস স্থিতিশীল হলেও, আধুনিক যুগে স্তরবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। শিল্প বিপ্লবের পরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে ধর্মীয় ও প্রচলিত প্রথার অচলায়তন ভেঙে গেছে, সর্বজনীন মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ায় নাগরিকদের শ্রেণিগত বা স্তরগত অবস্থানে উত্তরণের সুযোগ ঘটেছে বেশি।

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতার বিভিন্ন ধরণ

সব সমাজই কমবেশি স্তরায়িত। মানবসমাজে বিকাশের প্রাথমিক বা আদিস্তরগুলোতে মানুষের মধ্যে উচ্চ নিচ ভেদাভেদ তেমনটি পরিলক্ষিত না হলেও সমাজবিকাশের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এই ভেদাভেদ ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত মানবসমাজে চার ধরনের স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হল- দাসপ্রথা (Slavery), এস্টেট (Estate), জাতি-বর্ণ (Caste) ও শ্রেণি (Class)। এর মধ্যে প্রথম দুটি ধরন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জাতি-বর্ণ প্রথার প্রভাব কমছে আর শ্রেণি ভিত্তিক স্তরবিন্যাস সমাসাময়িক সমাজে বলবৎ রয়েছে। চল এখন স্তরবিন্যাসের ধরনগুলো সম্পর্কে জেনে নেই। এর মাধ্যমে আমরা পূর্বের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল জানতে পারব, সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাব এবং সেই সাথে বর্তমান সমাজকাঠামো সম্পর্কে জানতে পার।

অনুশীলনী কাজ ৩: উপরের পাঠ থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ লিখি।

draft copy

দাস প্রথা

দাসপ্রথা কৃষি ও সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সমাজে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এ প্রথা সমাজকে প্রধানত দাস মালিক এবং দাস এ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ যাকে আইন এবং প্রথা অনুসারে অন্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হত। দাসের কোন অধিকার ছিল না, সে সম্পূর্ণভাবে অন্যের অধীন। সে হয়তো কিছু নিরাপত্তা ভোগ করত যা একটি গবাদি পশু অর্থাৎ ষাঁড় কিংবা গাধার থাকে। দাস প্রথা সামাজিক অসমতার একটি চরম রূপ। এক্ষেত্রে সমাজের কিছু লোক সম্পূর্ণরূপে কিংবা অনেকাংশে অধিকার বঞ্চিত থাকে। দাস প্রথার অস্তিত্ব বিক্ষিপ্তভাবে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রূপে পরিলক্ষিত হয়। তবে দাস প্রথার দুটি চরম দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতায় এবং অন্যটি ১৮ ও ১৯ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যসমূহে। দাসপ্রথার চরম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অনেক সমাজ বিশ্লেষক দাসপ্রথাকে একটি 'শ্রমশিল্প ব্যবস্থা' হিসেবে বিবেচনা করেন যেখানে ক্রীতদাসরা যন্ত্রের মত কাজ করে যায়।

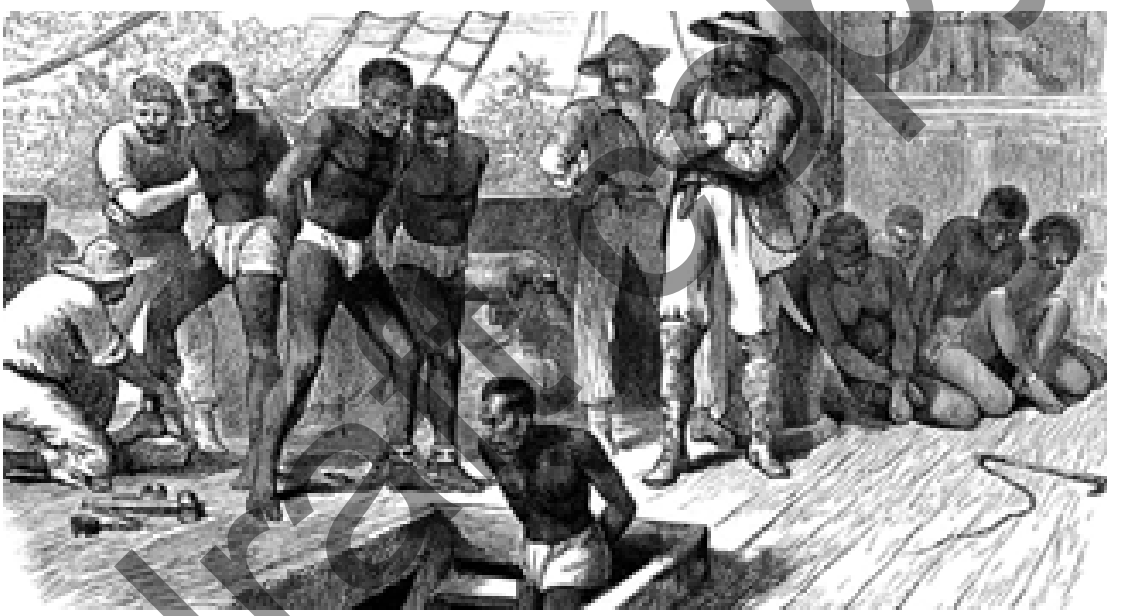

প্রত্যেক ক্রীতদাসেরই থাকে একজন মালিক, যার অধীনে সে কাজ করে। ক্রীতদাসদের উপর দাস মালিকের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন। ক্ষমতা প্রয়োগের বেলায় দাস প্রথার কোন বাধা-নিষেধ নেই। রোমান আইনে যেমন সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি যেকোন ভাবে ব্যবহার করতে পারে, ক্রীতদাসের মালিকও ঠিক তেমনি দাসকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে। কোন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হলে একজন ক্রীতদাস ও দাস মালিকের সম্পর্ক নিম্নরূপ।

প্রথমত, ক্রীতদাস মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, মুক্ত মানুষের তুলনায় ক্রীতদাসের সামাজিক অবস্থান নিচু। ক্রীতদাসের কোন রাজনৈতিক অধিকার থাকে না। নির্বাচনের অধিকারও থাকে না, এমনকি কোন জনপ্রতিনিধির সভায় সে যোগ দিতে পারে না। সামাজিকভাবে সে ঘৃণ্য । তৃতীয়ত, দাস ব্যবস্থার সাথে সবসময় বাধ্যতামূলক শ্রম জড়িত থাকে। একজন স্বাধীন শ্রমিক ইচ্ছা করলে কাজ ছেড়ে দিতে পারে, অনাহারে থাকার

draft copy

সম্ভাবনা মেনে নিয়েও। কিন্তু ক্রীতদাসের জন্য শ্রম দেয়া বাধ্যতামূলক।

দাসপ্রথা একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মানব ইতিহাসের শিকার সংগ্রহ বা পশু পালন পর্বে এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এর কারণ হল দাসপ্রথার সাথে সামন্ততন্ত্র ও জটিল কৃষি ব্যবস্থা জড়িত। প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সর্বত্রই দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের কর্মস্থল এথেন্স নগরীতেও এ প্রথা বিদ্যমান ছিল। দাসকে তিনি সম্পত্তি উৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, মনিব শ্রেণির সেবার জন্য দাস প্রয়োজন। এতে মনিব শ্রেণি সমাজের মঙ্গল চিন্তা করতে সুযোগ পাবে। যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করার ক্ষেত্রেও তিনি যুক্তি দেন। কেননা, তারা অক্ষম বলেই পরাজিত, আর পরাজিতরা বিজয়ীদের সেবা করবে- এটাই স্বাভাবিক। রোমান আইনের সংজ্ঞায় দাসকে মানুষের পরিবর্তে বস্তু জ্ঞান করা হয়েছে যা প্রভুর উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম রূপে কাজ করে।

ইউরোপের বিভিন্ন অংশে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে দাস প্রথার প্রাথমিক পর্যায়ে এর পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যে, এর দ্বারা দাসরা বর্বর দশা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত সংস্কৃতির অংশীদার হতে পেরেছে এবং ধর্মীয় জীবনের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের পথ সুগম হচ্ছে। পরবর্তীকালে পশ্চিমা জগতে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দাস প্রথার পক্ষে দাসের জৈবিক নিকৃষ্টতার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেদেশের দাসপ্রথার ওপর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'আঙ্কল টমস কেবিন' পড়লে বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এটি লিখেছেন হ্যারিয়েট বিচার স্টো নামে এক কৃষ্ণাঙ্গা লেখিকা।

দাসপ্রথার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেও পাওয়া যায়। তবে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইউরোপীয় ক্রীতদাস ব্যবস্থা থেকে আলাদা ছিল ভারতের দাসপ্রথা। যুগ বিবেচনায় বৈদিক থেকে মৌর্য এবং মৌর্যপরবর্তী যুগ, গুপ্তযুগ, পাল, সেন থেকে পরবর্তী মুসলিম শাসনামলেও দাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল। নিজেদের প্রয়োজনে ব্রিটিশরাও দাস প্রথা জারি রেখেছিল। ভারতের দাস ব্যবস্থায় ইউরোপের মতো দুঃসহ ও অমানবিক ছিল না। সাধারনত ভারতে দাসত্বের প্রধান উৎসগুলি ছিল যুদ্ধবন্দিত্ব, দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্থতা। দুর্ভিক্ষও ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে ইউরোপের তুলনায় দাসদের সংখ্যা ও গুরুত্ব উভয়ই ছিল সামান্য। তখন উৎপাদন-কার্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দাসদের ওপর নয়, স্বাধীন শ্রমিক, কৃষক ও কারিগরদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রচীন ভারতে দাস উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির মালিক হতে পারত বলে ঐতিহাসিক সুত্র থেকে জানা যায় এবং সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারত। ভারতীয় সমাজে স্বাধীন নাগরিক ও দাসদের মধ্যে ভেদরেখা ছিল না বললেই চলে। ভারতীয় দাসরা গৃহভৃত্যের মত ছিল। ভারতীয় সমাজে দাসদের প্রতি উদার ও মানবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

অনুশীলনী কাজ ৪: দাস প্রথার পাঠ থেকে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি।

draft copy

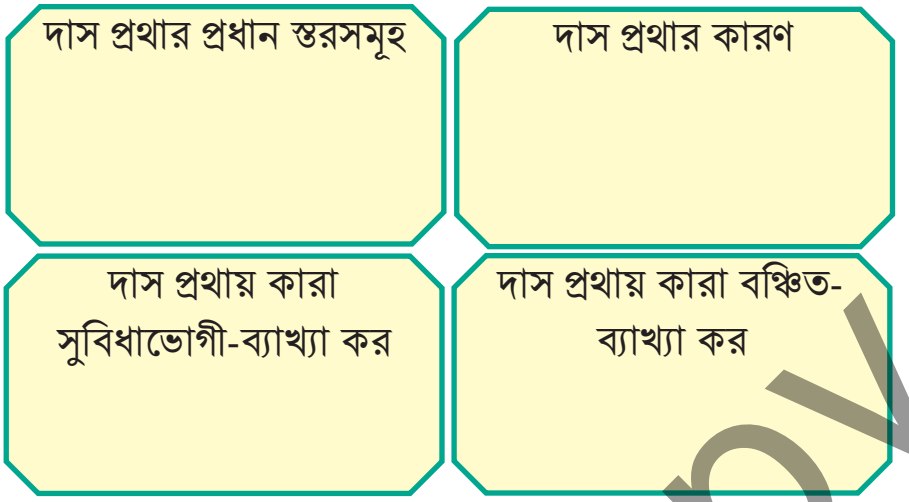

এস্টেট

মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রথমে 'এস্টেট' বলতে জমিদারি বোঝাতো, অর্থাৎ একজন জমিদার বা মালিকের অধীনস্থ জমি। পরে রাশিয়াসহ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ত ব্যবস্থার অধীনে এস্টেট শব্দটি এক ধরনের সামাজিক স্তর ব্যবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হত।

মধ্যযুগে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে বলা হতো প্রথম এস্টেট, দ্বিতীয় এস্টেট ও তৃতীয় এস্টেট। প্রথম এস্টেটের অধিভূক্ত ছিল চার্চের নেতা বা যাজকরা। তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করা হত এবং তারা প্রচুর জমি ও অন্যান্য সম্পদের মালিক ছিল। তারা এত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল যে রাজনৈতিক ঘটনাবলি তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। দ্বিতীয় এস্টেট বলা হত রাজা-রানিসহ অন্যান্য অভিজাতদের। তারা মূলত প্রচুর জমির মালিক ছিল যেখানে সাধারণ কৃষকরা কাজ করত এবং সে আয় দিয়ে 'চাকর-বাকর' পরিবেষ্টিত হয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করত।

অভিজাতরা সাধারণত কোন কাজ করত না, তারা সময় কাটতো শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের চর্চায় এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে। আর তৃতীয় এস্টেট বলে গণ্য করা হতো অধিকাংশ সাধারণ জনগণকে যারা মূলত চার্চ বা অভিজাতদের ভূমি চাষাবাদ করত। তাদেরকে সার্ফও (serf) বলা হত। প্রতিটি এস্টেটের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এ স্তর বিভক্তি আইনের দ্বারা স্বীকৃত ছিল। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মত জন্মগতভাবে এস্টেটগুলোর সদস্যপদ নির্ধারিত হতো। প্রথম দুটি এস্টেট সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো আর তৃতীয় এস্টেটভুক্তরা শোষিত ও সুযোগ-সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত।

ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক এস্টেট প্রথা তথা সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, এস্টেট আইনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং প্রতিটি এস্টেটের থাকতো সুনির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা। আইনের দ্বারা নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য এবং বিশেষ বিশেষ সুবিধা ও দায়-দায়িত্বের নিরিখে এস্টেটের অবস্থান নির্ধারণ করা হতো। সে কারণেই বলা হত যে কোন ব্যক্তির প্রকৃত সামাজিক মর্যাদা জানতে হলে প্রথমেই জানা আবশ্যক কোন আইন অনুসারে তার জীবনযাত্রা নির্ধারিত হয় বা সে কোন এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত,

draft copy

ব্যাপক সামাজিক শ্রম বিভাগের ফলে এস্টেট ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। সমসাময়িক সামাজিক ঐতিহাসিক রচনাবলি থেকে বিভিন্ন এস্টেটের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পর্কে জানা যায়। যাজক বা পাদ্রির কর্তব্য সকলের জন্য প্রার্থনা করা, অভিজাত ভূস্বামীদের কর্তব্য সকলের নিরাপত্তা বিধান করা, আর সার্ফের কর্তব্য চাষাবাদ করা। তৃতীয়ত, এস্টেটগুলো ছিল একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী যা বিভিন্ন স্তরের মানুষদেরকে নিয়ে গঠিত হতো। প্রথম দুটি এস্টেটের রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বীকৃতি ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজে জন্মই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করত অর্থাৎ ব্যক্তি যে এস্টেটে জন্মগ্রহণ করবে সে ওই স্টেটের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং পদমর্যাদা লাভ করবে। হিন্দু জাতি-বর্ণপ্রথার সাথে এস্টেট প্রথার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রয়েছে, তবে এই দুই প্রথার মধ্যে বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি।

অনুশীলনী কাজ ৫: এস্টেট প্রথার পাঠ থেকে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি।

এস্টেট প্রথার স্তরসমূহ	এস্টেট প্রথার কারণ
এস্টেট প্রথায় কারা সুবিধাভোগী-ব্যাখ্যা কর	এস্টেট প্রথায় কারা বঞ্চিত-ব্যাখ্যা কর

জাতি-বর্ণ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি ধরণ হল জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা। ব্যাপকতা এবং প্রাচীনতার মাপকাঠিতে জাতি-বর্ণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় সমাজে লক্ষ করা যায়। জাতি-বর্ণ দ্বারা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাসকে বোঝায়।

ভারতীয় হিন্দু সমাজ মর্যাদার ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এ চার বর্ণের বহির্ভূত যারা তাদেরকে অস্পৃশ্য বলা হয়। প্রতিটি বর্ণ আবার অনেকগুলো উপবর্ণে বিভক্ত যাদেরকে জাতি বলে। হিন্দু জাতি-বর্ণের বিভক্তির মূলে রয়েছে ধর্মীয় পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারনা। উচ্চবর্ণের সদস্যরা বেশি পবিত্র, নিচু বর্ণের সদস্য কমপবিত্র আর অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর সদস্যরা অপবিত্র। এভাবে জাতি-বর্ণগুলোর মধ্যে সামাজিক মর্যাদার অসম বন্টন পরিলক্ষিত হয়। জন্মসূত্রেই ব্যক্তি জাতি-বর্ণের সদস্যপদ লাভ করে।

জাতি-বর্ণ অন্তর্গোত্র বিবাহ ভিত্তিক একটি গোষ্ঠী। যার সদস্যদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। প্রত্যেকটি জাতি-বর্ণের সদস্যকে জন্মসূত্রে নির্ধারিত পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়। ব্রাহ্মণদের কাজ হল যাগযজ্ঞ, পূজার্চনা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করা, ক্ষত্রিয়দের কাজ হল দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করা, বৈশ্যদের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন করা এবং শূদ্রদের কাজ হল উপরোক্ত তিন

draft copy

দলের সেবা করা। ভৃত্য, কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকরা ছিলো শুদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। মর্যাদা অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা হিন্দু জাতি বর্ণ প্রথায় সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। তার চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়দের চেয়ে নিচু মর্যাদার অধিকারী বৈশ্য এবং বৈশ্যদের নিচে অবস্থান শূদ্র বর্ণের। হিন্দু সমাজের সবচেয়ে নিচু মর্যাদার অধিকারী অস্পৃশ্যগোষ্ঠীগুলো। যাদের অবস্থান চার বর্ণ সীমার বাইরে।

জাতি-বর্ণগুলো ক্রমোচ্চভাবে মর্যাদাপূর্ণ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। জাতি-বর্ণগুলোকে পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীও বলা যেতে পারে। হিন্দু সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি একেকটি জাতি বর্ণে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মসূত্রে সে জাতি বর্ণের সদস্যপদ এবং মর্যাদা লাভ করে। ব্যক্তি তাই ইচ্ছে অনুযায়ী অন্য কোন জাতি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। সমস্ত জীবনের জন্য তার জাতি বর্ণগত মর্যাদা স্থির এবং নিশ্চল থাকে। বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বিদ্যমান। যা ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। জাতি বর্ণগুলোর মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। জাতি-বর্ণ প্রথা প্রায় তিন হাজার বছর যাবত বিরাজ করছে।

তবে নগরায়ন, শিল্পায়ন, উদারনৈতিক আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে জাতি-বর্ণের ভীত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যেকোনো জাতি-বর্ণের লোক যেকোন পেশা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। মুদ্রা বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় তথাকথিত নিচু জাতি বর্ণ জমি কিনতে ও জমির মালিক হিসেবে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রসার এবং

বিবাহঃ বিবাহ বলতে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন এক চুক্তি-নির্ভর সম্পর্ককে বোঝায় যা সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা স্বীকৃত।
অন্তর্গোত্র বিবাহঃ নিজ শ্রেণি, বর্ণ, জাতি গোষ্ঠী তথা গোত্রের মধ্য থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে বিবাহকে অন্তর্গোত্রবিবাহ বলে।
বহির্গোত্র বিবাহঃ নিজ

উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তথাকথিত নিচু জাতি-বর্ণের লোক সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে

draft copy

আসীন হচ্ছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন পশ্চাৎপদ সমাজে জাতি-বর্ণের প্রভাব বিরাজমান।

অনুশীলনী কাজ ৬: জাতি-বর্ণ প্রথার পাঠ থেকে আমরা নিচের বক্সগুলোতে লিখি।

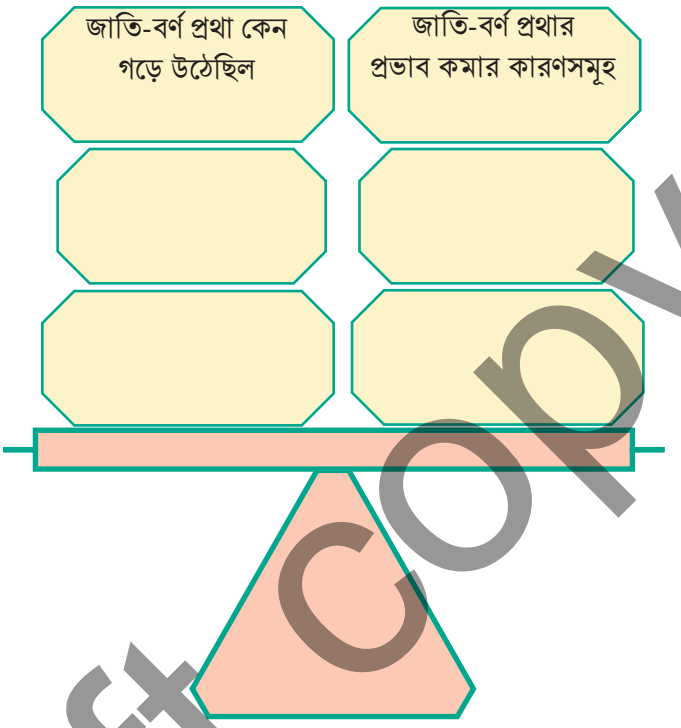

সামাজিক শ্রেণি

সামাজিক শ্রেণি হল সামাজিক স্তরবিন্যাসের আধুনিক প্রকরণ। আঠারশতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙে যেতে থাকে, নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে এবং শহরকেন্দ্রিক মানুষও বাড়তে থাকে। সেইসাথে শহরকে কেন্দ্র করে শ্রেণিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি নতুন রূপ দেখতে পাই। একটি শ্রেণিভিত্তিক সমাজে স্তরবিন্যাস নির্ধারিত হয় ব্যক্তির জন্ম ও তার নিজস্ব অর্জন দ্বারা।

সামাজিক শ্রেণি ব্যবস্থা আগে বর্ণিত তিন ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস থেকে আলাদা। সামাজিক শ্রেণি সমূহ প্রকৃত অর্থে এক একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যা দাস প্রথা, এস্টেট ব্যবস্থা বা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মত আইন কিংবা ধর্মের মাধ্যমে গঠিত নয়। শ্রেণি ব্যবস্থায় মানুষ মুক্ত, অন্যদিকে পূর্বের তিনটি সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল বদ্ধ। শ্রেণি ব্যবস্থায় মানুষ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধমে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে যেতে পারে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সব মানুষের জন্যে সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে এবং ব্যক্তি তার চেষ্টার মাধ্যমে সমাজের উচ্চ অবস্থান অর্জন করতে পারে। তবে এও মনে রাখতে হবে যে শ্রেণি শুধুমাত্র ব্যক্তির অর্জন দ্বারা নির্ধারিত নয়, একজন ব্যক্তি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করছে সে পরিবারের সামাজিক অবস্থান অনুসারেও শ্রেণি নির্ধারিত হয়। যেমন কেউ যদি উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে সমাজে উচ্চ শ্রেণিভুক্তই হবে।

সামাজিক শ্রেণিসমূহ নির্ধারণ এবং সঠিকভাবে সামাজিক শ্রেণিসমূহের সদস্যপদ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অনেক

draft copy

অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী আধুনিক সমাজের তিনটি প্রধান শ্রেণি সনাক্ত করার ব্যাপারে মোটামুটি একমত পোষণ করেন। সেগুলো হলো: উচ্চশ্রেণি অর্থাৎ যারা সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদের সিংহভাগের মালিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয় নানান ধরনের পেশাজীবী নিয়ে, যাদের ভেতর রয়েছে অধিকাংশ নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সদস্যরা। নিম্নবিত্ত হয় মূলত শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত মজুরি শ্রমিক ও অন্যান্য কায়িক শ্রমের সাথে জড়িত মানুষদের নিয়ে।

এ সব শ্রেরণি কীভাবে নির্ধারিত হয় তা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। সম্পদের মালিকানা বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন কেউ কেউ। শিল্প বিপ্লবের পরপরই এ মতবাদ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। শিল্পভিত্তিকসমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের আর্থিক সম্পদের অসমতা বাড়তে থাকে, ফলে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে- শ্রেণি হলো এমন এক গোষ্ঠী যাদের উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সাথে একই ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে উৎপাদনের বিষয়টি কে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাই মুখ্য বিষয়। উৎপাদনের উপায় সমূহ যার বা যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তারা উচ্চ শ্রেণিভুক্ত, যাদেরকে পুঁজিপতি বলা হয়। আর যাদের হাতে সে নিয়ন্ত্রণ থাকে না তারা নিম্ন শ্রেণিভূক্ত, মার্কস যাদের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি বলেছেন।

আবার আরেকদল সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন শ্রেণির ভিত্তি শুধুমাত্র অর্থনীতি নয়। অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি পেশা, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে তাঁরা শ্রেণি বিভাজনের পক্ষপাতি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে, সম্পত্তি, মার্যাদা ও ক্ষমতা আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসের কারণ। এ সকল উপাদানের ভিত্তিতে একটি শ্রেণিকে সহজেই অন্য শ্রেণি থেকে আলাদা করা যায়।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের সমাজে মোট ছয়টি শ্রেণির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি হল উচ্চ-উচ্চবিত্ত যারা বংশপরম্পরায় দীর্ঘদিন যাবত প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক। দ্বিতীয়টি হল নিম্ন-উচ্চবিত্ত যারা সবেমাত্র মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে পদার্পণ করেছে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণির সাংস্কৃতিক জীবন পুরোটা রপ্ত করতে পারেনি। এদের গাড়ি-বাড়ি ও কাপড়-চোপড় ক্ষণিকের জন্য সমুজ্জ্বল মনে হয়, তবে বাচনভঙ্গি, বাক্যলাপ এখনো উচ্চ শ্রেণির মত মার্জিত নয়। তৃতীয় শ্রেণিটি হল উচ্চ-মধ্যবিত্ত যারা ব্যবসায়ী ও পেশাদার গোষ্ঠী, যারা জাঁক-জামকপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। চতুর্থটি হল নিম্ন-মধ্যবিত্ত যার অন্তর্ভুক্ত হল ছোট ব্যবসায়ী, কেরানি বা নিম্ন বেতনভুক্ত অন্যান্য চাকুরিজীবী, যারা আর্থিকভাবে খুব একটা উন্নত নয়; তার পরের শ্রণিটি হল উচ্চ-নিম্নবিত্ত যাদের আয় মধ্যবিত্ত যে কোন শ্রেণীর মতই, তবে এরা শারীরিক পরিশ্রম করে আয় করে, যেমন একজন মিস্ত্রি, ঘড়ি-রেডিও-টিভি মেরামতকারী দক্ষ শ্রমিক। সর্বশেষ শ্রেণিটি হল নিম্ন-নিম্নবিত্ত যারা নিম্ন আয়ের লোক যেমন অদক্ষ শ্রমিক। বাংলাদেশের সমাজেও আমরা এধরণের শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করে থাকি।

অনুশীলনী কাজ ৭: সামাজিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করে নিচের বক্সগুলোতে লিখি ।

draft copy

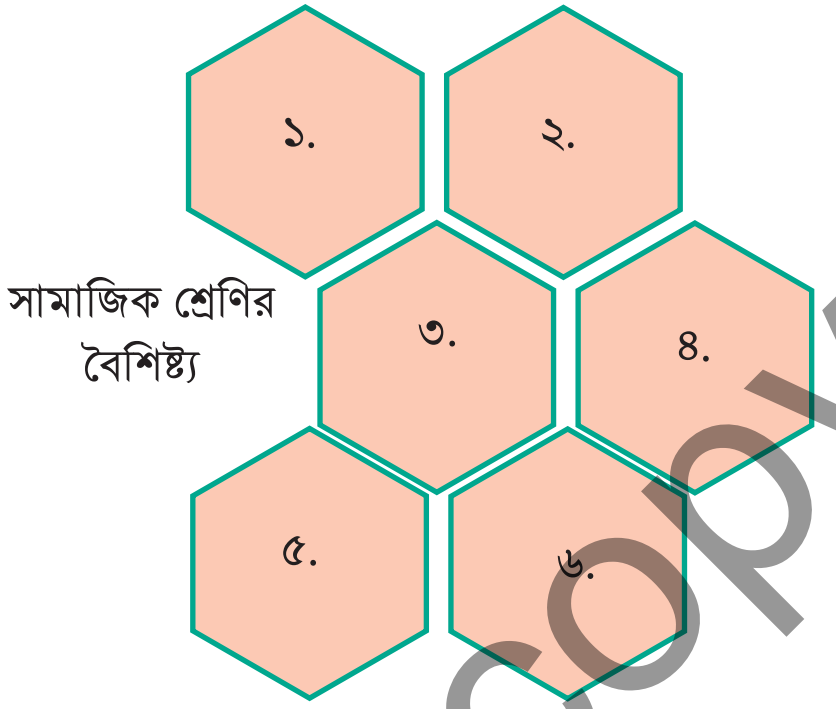

draft copy

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক অসমতা

সামাজিক অসমতা সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেখানেই সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে সেখানেই সামাজিক অসমতা আছে। যদিও মানুষ এমন একটি সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে, যেখানে তাদের ভেতর অসাম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল যে, বিদ্যমান মানব সমাজে কোন না কোন ধরনের স্তরবিন্যাস ও অসমতা লক্ষ করা যায়। মানুষে মানুষে সম্পদ ও আয়ের অসাম্যকে আমরা সামাজিক অসমতা বলি। সম্পদ ও আয়ের অসাম্যের কারণে একদল মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে, আরেকদল নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন কোন সমাজে চিকিৎসক কিংবা প্রকৌশলীকে শিক্ষকের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হয়। অপরদিকে এর উল্টোটাও লক্ষণীয়। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অর্থ ও সামাজিক সম্মান। অর্থ উপার্জনের দিক থেকে সাধারণত আধুনিক সমাজে একজন চিকিৎসক কিংবা একজন প্রকৌশলী একজন শিক্ষকের চেয়ে উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতে পারেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক সম্মানের দিক থেকে একজন শিক্ষকের অর্থ-বিত্ত কম থাকলেও চিকিৎসক ও প্রকৌশলীর চেয়ে তিনি অধিকতর সম্মানের দাবিদার। প্রত্যেক সামাজিক অবস্থানের সাথে যুক্ত রয়েছে মর্যাদা যা সামাজিক স্তরবিন্যাসে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। তবে বিভিন্ন অবস্থানের সাথে যুক্ত সম্মান সকল সমাজে অভিন্ন নাও হতে পারে, এমনকি অবস্থানের সাথে যুক্ত সম্মান সব সময় যৌক্তিক বলেও মনে না হতে পারে।

সকল সমাজেই উৎপাদিত দ্রব্য, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত এবং সেবা অসমভাবে বন্টিত হয়। কীভাবে

সমাজে অসমতা সৃষ্টি হলো এবং হাজার হাজার বছর ধরে বজায় রয়েছে তা নিয়ে সমাজ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। ফরাসি সমাজ দার্শনিক রুশো দুই ধরনের অসমতা সনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে প্রথমটি হচ্ছে স্বাভাবিক অসমতা, যা বয়স, স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি, আত্মা ও মনের গুণাবলির পার্থক্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি দ্বিতীয় অসমতাকে বলেছেন নৈতিক ও রাজনৈতিক অসমতা, যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সম্পদ, সম্মান এবং ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নিহিত। রুশো যেটাকে স্বাভাবিক অসমতা বলেছেন সেটা তার বিবেচনায় খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তিনি জোর দিয়েছেন সামাজিক অসমতার উপর, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজকাঠামোর সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত। তবে স্বাভাবিক অসমতাও মাঝে মাঝে সামাজিক অসমতায় রূপ লাভ করে। যেমন পশ্চিমা বিশ্বে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ।

মানুষের সমাজে যখন প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং অপরকে বঞ্চিত করে মুনাফা লাভের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় তখনই সামাজিক অসমতার সূত্রপাত ঘটে। এটি হচ্ছে মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তির কুফল। মানব ইতিহাসে এ যাবত যত সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, সেসব সমাজের মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজে অসমতা সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেখানে তারা শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে মুনাফা বাড়িয়ে নেয়। ফলে পুঁজিপতিরা আরো ধনী হয়, আর শ্রমিক শ্রেণি আরো গরিব হচ্ছে। এভাবেই সম্পদের অসম বন্টনের ফলে সামাজিক অসমতা বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে অসমতা বিদ্যমান থাকার আসল কারণ এই যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা পুন:বন্টনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা। এছাড়া সমাজে প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী এমন ধরনের ভাবাদর্শ ও আস্থা-বিশ্বাসের প্রচারণার ব্যবস্থা করে, যার ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অসমতাই স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় যে, শক্তিশালী ও শক্তিহীন মানুষ এবং ধনী ও গরিব সহজে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণির মতাদর্শ কম বেশি গ্রহণ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যখন আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা বলি, তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের দৃষ্টি সমাজে ব্যক্তির অসম অবস্থানের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এভাবে দেখলে সকল সমাজে বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা বিদ্যমান। ঐতিহ্যবাহী সমাজে এবং আধুনিক শিল্পায়িত দেশসমূহে সম্পদ, সম্পত্তি, বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারের দিক থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা পাশাপাশি বিরাজ করছে। বস্তুগত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারের অসমতা থেকে শ্রেণির সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের সাথে অসমতার যোগসূত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আধুনিক বিশ্বের সম্পদশালী জাতিসমূহের ভেতরও দারিদ্র্য লক্ষণীয়। মূলত দারিদ্র্যের কারণে সমাজ থেকে অসমতা একেবারেই দূরীভূত হচ্ছে না। অসমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। চরম দারিদ্র্য ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য। প্রথমটিকে জীবিকাকেন্দ্রিক দারিদ্র্য বলা হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দৈহিক কর্মক্ষমতা বজায় রাখার নূন্যতম জীবিকার ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদার চেয়ে যাদের কম উপভোগের সুযোগ রয়েছে তাদের সে পরিস্থিতিকেই আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলে।

draft copy

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সমাজে অসমতার তিনটি উপাদান চিহ্নিত করেছেন। যথা- সম্পদের অসমতা, মর্যাদার অসমতা এবং ক্ষমতার অসমতা। প্রথম উপাদানের সাথে যুক্ত রয়েছে সম্পত্তি অথবা উপার্জন । দ্বিতীয়টির সাথে জীবনযাত্রার মান জড়িত, যার ভিত্তিতে মর্যাদাবান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। আর তৃতীয়টির সাথে সংযুক্ত রয়েছে রাজনীতি যার ফলে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল। এভাবেই তাঁর ধারনায় শ্রেণি, মর্যাদা এবং রাজনৈতিক দল সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতার তিনটি প্রধান উপাদান হিসেবে বর্তমান সমাজে বিদ্যমান।

সামাজিক গতিশীলতা

তামিম
৩০টি দেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু শুরুট এমন ছিল না। ২২ বছর বয়সে মায়ের কাছ থেকে মাত্র ২০ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিলেন কাপড়ের ব্যবসা। একটি ছোট টিন ঘরের দুটি রুম ভাড়া করেছিলন। একটিতে তিনি নিজে থাকতেন আরেকটিতে তিনি কম দামে গার্মেন্টসের বাতিল কাপড় সংগ্রহ করে রাখতেন। নিজেই এই কাপড় সেলাই করতেন, ইস্ত্রি করতেন, প্যাকেট করতেন এবং বাজারে বিক্রি করতেন। এভাবে ব্যবসা বাড়তে থাকে তিনি মাসিক মজুরিতে শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়াতে লাগলেন। এভাবে কাজ করতে করতে কিভাবে কারখানা খুলতে হয়। কিভাবে বিক্রি করতে হয়। এ বিষয়ে ধারণা হয় তার। একসময় টাকা জমিয়ে একটি ছোট কারখানা তৈরি করেন। সেই কারখানা এখন বিশাল আকার ধারণ করেছে। প্রায় ৫০০ গার্মেন্ট কর্মী কাজ করে এখানে। প্রতিদিন প্রচুর কাপড় তৈরি হয় এবং সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করেন। এভাবে ছোট একটি ব্যবসার মধ্য দিয়ে শুরু করে তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছেন।

অনুশীলনী কাজ ৮: উপরের গল্পটিতে তামিম চৌধুরির জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? কিভাবে হয়েছে? এ বিষয়ে দলে আলোচনা করে আমরা নিচের ছকটিতে লিখি।

এখন আমরা সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

সমাজ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক গতিশীলতার জন্যই মানুষ এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতে পারে। তার ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদাও পাল্টে যায়। সামাজিক গতিশীলতার ধারণা অনুসারে কখনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় আবার কখনো কমে যায়। সামাজিক গতিশীলতা সামাজিক মর্যাদার মানদন্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সামাজিক গতিশীলতা: বিদ্যমান সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে একজন ব্যক্তির এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতে পারার সক্ষমতাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গতিশীলতার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, কারণ জীবনযাত্রার মান

draft copy

উন্নয়নের জন্য আমরা সকলে কাজ করে যাচ্ছি। এর একটি উদাহরণ হল পড়াশুনা করে ভালো ডিগ্রি অর্জনের পর উচ্চবেতনের একটি চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে সমাজে উচ্চ অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সফল হতে পারে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে মর্যাদার মানদণ্ডে যদি আমরা হিসাব করে থাকি তাহলে সমাজে পুরোহিতরা সর্বোচ্চ অবস্থানে একটা সময় ছিল। কিন্তু এখন একজন পুরোহিত অপেক্ষা ডাক্তার বা আইনজীবী অধিক মর্যাদা পায়। আবার যদি কোনো শিক্ষক নির্বাচনে জয়লাভ করার পর মন্ত্রিত্ব পদ পায় তাহলে সমাজে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। কোন কারণে যদি তিনি পদহারা হয়ে যান তাহলে তিনি হয়তোবা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবেন। তাহলে সেক্ষেত্রে সমাজে তার মর্যাদা নিচে নেমে যাবে।

সামাজিক সচলতায় আশা করা হয় পিছিয়ে থাকা আর্থ-সামাজিক পটভূমির একজন ব্যক্তি সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে উর্ধ্বমুখী পদে বা অবস্থানে আরোহণ করতে পারেন। বিপরীতটাও ঘটতে পারে অর্থাৎ মর্যাদার ভিত্তিতে উর্ধ্বমুখী পদে বা অবস্থানে আরোহণের পরিবর্তে কেউ একজন নিম্নমুখী কোন পদেও ধাবিত হতে পারেন। সামাজিক গতিশীলতার এ সমস্ত দিক বিবেচনায় সমাজবিজ্ঞানীরা গতিশীলতাকে নানানভাগে ভাগ করেছেন।

সামাজিক গতিশীলতার ধরণ

সামাজিক গতিশীলতাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। ব্যক্তির অবস্থানের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজিক গতিশীলতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়- আনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্বী (Vertical)।

আনুভূমিক গতিশীলতা বলতে একজন ব্যক্তির পেশাগত এমন পরিবর্তনকে নির্দেশ করে যার ফলে তার সামাজিক মর্যাদার কোন পরিবর্তন হয় না। সামাজিক স্তরবিন্যাসে তার অবস্থান একই থাকে। আনুভূমিক গতিশীলতার ধারণা প্রাথমিকভাবে কোনও ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের পরিবর্তে তার পেশার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। একজন ব্যাংকার যদি চাকরি ছেড়ে আইনজীবী হিসেবে কাজ করে বা পুলিশ অফিসারের চাকরি ছেড়ে কেউ যদি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে, তাহলে তার পেশার পরিবর্তন হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।

উল্লম্বী সামাজিক সচলতা বলতে ব্যক্তির পেশাগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এতে ব্যক্তি স্তরবিন্যাসের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যায়। এটি দুপ্রকার- যেমন উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী । উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা বলতে ব্যক্তির বর্তমান পেশাগত বা সামাজিক অবস্থান থেকে উচ্চতর ধাপে উন্নীত হওয়াকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মর্যাদর উন্নতি হয়। যেমন একজন সাধারণ কৃষকের ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে এ গতিশীলতা হবে উর্ধমুখী। নিম্নমুখী গতিশীলতা হল ব্যক্তির উচ্চতর সামাজিক অবস্থান থেকে নিম্নতর ধাপে পদার্পণ। এতে সমাজে তার মর্যাদা কমে যায়। কেউ যদি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে কিংবা চাকরি হারিয়ে বেকার হয় তা হলে সেটি হবে নিম্নমূখী গতিশীলতা।

draft copy

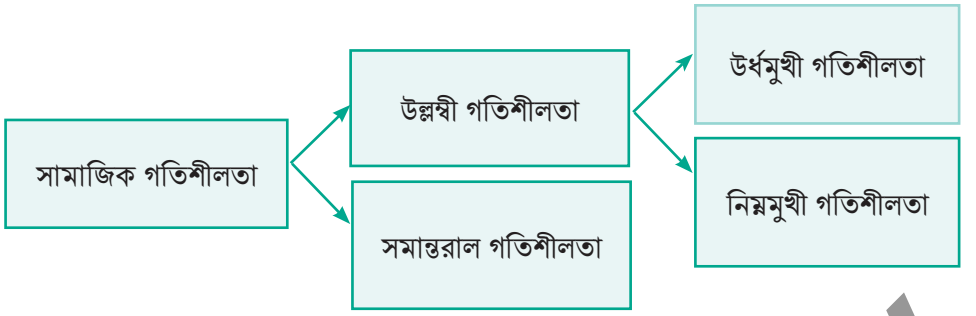

সামাজিক গতিশীলতাকে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বিবেচনায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হল প্রজন্মমধ্যস্থ সামাজিক গতিশীলতা, আরেকটি হল আন্তঃপ্রজন্মগত গতিশীলতা। প্রজন্মমধ্যস্থ সামাজিক গতিশীলতা বলতে কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঘটতে থাকা সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনকে বোঝায়। আন্তঃপ্রজন্মগত সামাজিক সচলতা বলতে পিতা-মাতার তুলনায় উর্ধ্বমুখী বা নিম্নবর্তী সামাজিক সচলতাকে বোঝায়। আন্তঃপ্রজন্মগত সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে সমাজের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা যদি কোন বিখ্যাত সমাজকর্মী বা গায়ক-গায়িকা বা নায়ক-নায়িকা কিংবা আশেপাশে অবস্থিত সফল মানুষদের দিকে তাকাই তবে দেখব যে সময়ের সাথে সাথে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে, আয় বেড়েছে, সামাজিক অবস্থান দৃঢ় হয়েছে। এক্ষেত্রে বলতে পারি প্রজন্মমধ্যস্থ সামাজিক সচলতা বিদ্যমান যা তাদের জীবনভর পুরো সময়টা জুড়ে সংঘটিত হচ্ছে। আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কর্মজীবনে সামাজিক মর্যাদার মানদন্ডে যে ওঠানামা তা প্রজন্মমধ্যস্থ সামাজিক সচলতা। অপরদিকে দেখা যায়, একজন পিতা রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও চেষ্টা করেন তার সন্তানের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করতে যাতে তার সন্তানের সামাজিক অবস্থান তার অপেক্ষা ভিন্ন হয়। হয়তোবা সন্তান ভবিষ্যতে পড়াশুনা শেষ করে ডাক্তার, প্রকৌশলী বা অন্য কিছু হবে। সে সময় তার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই তার পিতা-মাতার অপেক্ষা ভিন্ন হবে। তবে আন্তঃপ্রজন্মগত সামাজিক সচলতা সবসময় যে উর্ধ্বমুখী সচল হবে তা নয়, নিম্নমুখী সচলও হতে পারে। যেমন কোন ডাক্তার পিতার সন্তান কেরানি কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ শুরু করতে পারে। আমাদের সমাজের মর্যাদার মানদন্ডে এখনও ডাক্তার অপেক্ষা এদের মর্যাদা নিচু স্তরে। এক্ষেত্রে আন্তঃপ্রজন্মগত সামাজিক সচলতার মাঝেও নিম্নমুখী সামাজিক সচলতা ঘটেছে। বর্তমান আধুনিককালে সমাজ হয়েছে শিল্পায়িত এবং তাতে সমাজে গতিশীলতা বেড়েছে, সামাজিক স্তরবিন্যাসেও তার প্রভাব পড়ছে। আধুনিক সমাজে তাই আন্তঃপ্রজন্মগত সামাজিক সচলতার বৈশিষ্ট্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

অনুশীলনী কাজ ৯: আমরা নিচের গল্প দুটি পড়ে সনাক্ত করব কোন ধরনের সামাজিক গতিশীলতা লক্ষণীয়।

draft copy

গল্প ১:

জবার জন্ম বস্তি এলাকার জীর্ণ পরিবেশে। এর রুমে পরিবারের সবাই ঠাসাঠাসি করে থাকে। মা বাসায় কাজ করে। বাবা রিক্সা চালায়। ছোটবেলা থেকেই জবার পড়াশুনার অনেক আগ্রহ। এলাকার একটি স্কুলে মা ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে জবার পড়াশুনার আগ্রহ দেখে প্রধান শিক্ষক তার বাবাকে পরামর্শ দেন কোনো অবস্থায় যেনো মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ না হয়। জবার বাবার মুখ কালো হয়ে গেলো। মেয়েকে এতো পড়াশুনা করিয়ে কি হবে? জবার মা শুনে বললেন, আমাদের আমার মেয়েকে পড়াতে হবে। পড়াশুনা করলে মানুষের জ্ঞান বাড়ে মানুষ শ্রদ্ধা করে।

এরপর থেকে জবার আর থামতে হয়নি। বাবা মা অনেক পরিশ্রম করেছে। জবাকে মাঝে মাঝে টিফিনের খরচ দিতে পারত না। না খেয়ে কাটিয়ে দিনের পর দিন। এমনও হয়েছে পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাসায় ফিরেছে হাঁড়িতে খাবার নেই। ভাই বোনরা খেয়ে নিয়েছে। মাকে বলেওনি। মা যদি কষ্ট পায়।

স্কুল কলেজে অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাশ করেছে জবা। বিশ্ববিদ্যালয় শেষে এখন সে একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক। তার স্বপ্ন এলাকায় একটি অনেক বড় স্কুল দিবে যেখানে তার মতো ছেলে মেয়েরা বিনা খরচে পড়বে, টিফিন খাবে।

গল্প ২:

রহমান সাহেব একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। তার যে আয় রোজগার তাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালোই দিন যাচ্ছিল। একসময় হঠাৎ চাকরি চলে গেলে ভীষণ বিপদে পড়েন। রহমান সাহেবের সন্তানদের পড়াশুনার খরচ চালাতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই বাড়িতে রাখা সব জমিজমা বিক্রি করে দিলেন। আগের বিশাল বাসা ছেড়ে একটি ছোট বাসায় উঠলেন। কিছু দিন হয় তিনি একটি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন কিন্তু এখানে বেতন আগের চেয়ে অর্ধেক।

আগের মতো তিনি সন্তানদের নিয়ে রেস্টোরেন্টে খেতে যেতে পারেন না। সন্তানদের জন্মদিনে আগের মতো অনুষ্ঠান কর আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করতে পারেন না। এখন কেনাকেটাও অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। তার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

	সামাজিক গতিশীলতার ধরণ	ব্যাখ্যা
গল্প ১		
গল্প ২		

draft copy

সামাজিক গতিশীলতার প্রভাবকসমূহ

সামাজিক গতিশীলতা নির্ভর করে সামাজিক ব্যবস্থা কতটুকু বদ্ধ বা মুক্ত তার ওপর। আমরা জেনেছি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। ব্যক্তি মানুষের বিশেষ করে যাদের অবস্থান ছিল সমাজের নিচু স্তরে তারা ছিল পরাধীন। সমাজ যতই অগ্রসর হয়েছে মানুষের স্বাধীনতা ততই বেড়েছে। পূর্বের যেকোন সমাজব্যবস্থার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে মানুষ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে সব দেশে বা সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সচলতা একই রকম নয়।

কোন দেশে আমরা দেখতে পাই সমাজ ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। ধরা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তি তার মর্যাদা ও অবস্থানের উন্নতি অর্জনের জন্য প্রায় সকল ধরনের স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। সেখানকার সরকার চেষ্টা করছে সকল ধরনের কাঠামোগত বাধা যথাসম্ভব কমিয়ে আনার। এতে করে মানুষ আশা করতে পারে যে সমাজে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সামাজিক সচলতার মুক্ত ব্যবস্থা দেখতে পাই, যেখানে একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তার অর্জিত মর্যাদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এরকম সমাজব্যবস্থা ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করে যাতে করে তারা মর্যাদা অর্জনের জন্য এগিয়ে যায়। এর বিপরীতে রয়েছে বদ্ধ ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিগত সামাজিক সচলতা অর্জনের জন্য সীমিত বা নামমাত্র সম্ভাবনা থাকে। এসব সমাজে ব্যক্তির নিজেস্ব অর্জনের পরিবর্তে পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত মর্যাদা বেশি অর্থ বহন করে। এরকম সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যক্তিকে গতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে ব্যর্থ হয়। তবে অনেক সময় দেখা যায় কাঠামোগত সংকট থাকার পরেও ব্যক্তি তার নিজ উদ্যোগে উর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতা অর্জন করে থাকে।

সামাজিক গতিশীলতা অর্জন করার পেছনে কতগুলো প্রভাবক রয়েছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে অন্যতম। উর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতা অর্জনের জন্য সবার আগে দরকার নিজের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য একজন ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাশক্তিই তাকে সমাজের উচ্চ অবস্থানে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দেবে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষা হল সামাজিক গতিশীলতার আরেকটি প্রভাবক। আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। আর শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে না, সমাজে সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমও। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সম্মানজনক পেশায় যেতে পারে। বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সমাজে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা হল ইতিবাচক প্রভাবক। অন্যদিকে কাঠামোগত কিছু উপাদান সামাজিক গতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। যদি সমাজের মধ্যে বৈষম্য বজায় থাকে তবে তা ব্যক্তির সামাজিক গতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। এজন্য ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়। এবং তা করার জন্য রাষ্ট্র আইন তৈরিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। আবার রাষ্ট্র যাতে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার জন্যে চাপ তৈরি করতে হয়। এটি করে থাকে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক গোষ্ঠীসমূহ।

ব্রিটিশ রাজপ্রথা ও বাবা সাহেব আম্বেদকর সম্পর্কে লেখা দুটি পড়ি।

draft copy

ব্রিটিশ রাজপ্রথা

যুক্তরাজ্যে এখনও রাজা-রানীর দেখা মেলে। আমরা অনেকেই হয়তো রানী ভিক্টোরিয়ার কথা শুনেছি। তার মৃত্যুর পর ছেলে চার্লস বর্তমানে সেই দেশের রাজা। যদিও রাজার আগের মতো যুদ্ধ ও রাজত্ব বিস্তার করার ক্ষমতা নেই, বৃটেনে এখনও রাজ পরিবারের জনপ্রিয়তা দেখতে পাওয়া যায়। রাজ পরিবারের সদস্যরা দেশের কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। যুক্তরাজ্যের রাজপ্রথা অনুসারে বংশ পরম্পরায় রাজা রানী নির্ধারণ করা হয়। রাজা প্রথম ছেলে হবেন রাজা এবং তার স্ত্রী হবেন রানী।

বাবা সাহেব আম্বেদকর

ভারতের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন এক নিচু-জাত পরিবারে। সেই সময় এই নিচু জাতকে অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই স্কুলে সাধারণ উঁচু জাতের শিক্ষার্থীদের সাথে বসে তিনি ক্লাস করতে পারতেন না। এমনকি তৃষ্ণা পেলে পানির পাত্র স্পর্শ করার অধিকার তার ছিল না। স্কুলের পিয়ন এমন উচ্চতা থেকে পানি ঢালতো যেনো পাত্র স্পর্শ না করেই তিনি পানি পান করতে পারেন। এতো অবহেলা ও অবজ্ঞা সহ্য করে তিনি তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দলিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করেছেন। একসময় সব জাতি ও সব শ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষায় তার নেতৃত্বে সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়।

অনুশীলনী কাজ ১০: আমরা উপরের দুটি লেখা থেকে সামাজিক গতিশীলতা বের করার চেষ্টা করি। ব্রিটিশ রাজপ্রথায় অনুসারে রাজার ছেলে রাজা হয়, এখানে কি কোনো গতিশীলতা হয়েছে? আবার বাবা সাহেব আম্বেদকর নিচুবর্ণের পরিবারের ছেলে হয়েও নিজেকে সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষে পরিণত করেছে, এখানে কি কোনো গতিশীলতা কাজ করছে?

সামাজিক গতিশীলতায় আন্তর্জাতিক সনদসমূহের অবদান:

গোড়াতে মনে রাখা ভালো যে আধুনিককালে এই অধিকারের দাবি প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় ১৭৮৯ সনে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবীরা যেমন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল তেমনি তারা নাগরিক অধিকারের তালিকাও ঘোষণা করেছিল। এ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস পেইন (Thomas Paine) মানবাধিকার শব্দ ও ধারণাটি প্রচার করেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতার পরে ১৭৯১ সালে তাদের সংবিধানে বিল অব রাইটস বা অধিকারের বিল গৃহীত হয়। এটা ব্যক্তির নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। যেমন কথা বলার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

এই পর্যায়ে জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সম্পর্কে জানা দরকার। এরও অবশ্য পূর্বকথা রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পরে ১৯২০ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় প্যারিস শান্তি সম্মেলন।

draft copy

এতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনায়করা মহাযুদ্ধের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের চিন্তা করেন। তারই ফল হল লীগ অব নেশনস্ গঠন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি এ কাজের জন্যে নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু এ উদ্যোগ সফল হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সীমাংসা জার্মেনিকে ক্ষুব্ধ করেছিল, এ সময় ইউরোপে দেখা দেয় ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৩৯ সালে ইউরোপে আবার যুদ্ধের ধ্বংসলীলা শুরু হয়। এবারে আরও ব্যাপক ও রক্তক্ষয়ী যে যুদ্ধ হয়েছে তা-ই ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে প্রায় ছয় কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তবে এবারে শান্তি আলোচনা আরও বড় পরিসরে কার্যকর উদ্যোগের প্রেরণা থেকেই শুরু হয়। এরকম উদ্যোগরই ফসল হল আজকের জাতিসঙ্ঘ, যা গঠিত হয়েছে ১৯৪৬ সনে।

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Delecaration of Human Rights) । এটি মাবজাতির এক মর্যাদাপূর্ণ সম্পদ। এতে মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি ও অধিকারের গভীরতা সুচিন্তিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ যেন তার স্বধীনতা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং তার সকল নাগরিক ও মানবিক অধিকার অবাধে ভোগ করতে পারে এতে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ঘোষণার প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, সব মানব শিশু জন্মায় স্বাধীনভাবে এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। সকল মানুষেরই রয়েছে যুক্তিবোধ ও বিবেচনাশক্তি এবং তাদের উচিত পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জীবনযাপন। এই ঘোষণায় রয়েছে ৩০টি অনুচ্ছেদ এবং এ থেকে ৬৩টি অধিকারের ধারণা পাওয়া যায়। তোমরা বই/ নেট/গুগল থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

অনুশীলনী কাজ ১১: দলগতভাবে আমরা আমাদের এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সনাক্ত করি। তাদের অধিকার সংরক্ষণে আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করব।

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার সংরক্ষণে আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি

শিশু অধিকার সনদ

আমরা অধিকার নিয়ে যত কথাই বলি না কেন নানা বাস্তব কারণে অহরহ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে মানুষের সাথে মানুষের যে বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণ-নির্যাতন রয়েছে তার মধ্যে শিশুদের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। কারণ শিশুরা না শারীরিক না মানসিক কোনভাবেই পরিণত নয়। নানাভাবে অপরের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা থাকে বলে তাদের অধিকারের বিষয়ে অন্যের বাড়তি সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে কোন ধরনের সংঘাত-দ্বন্দ্বে বা বৈষম্য-বঞ্চনা ও শোষণ-নির্যাতনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা, তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়। তবে আশার কথা, মানুষ এ বিষয়ে

draft copy

ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছে। কালক্রমে শিশু অধিকারে বিষয়টি পৃথিবী জুড়ে একটি অভিন্ন ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিশু অধিকারের ইস্যুটি জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি সনদে রূপান্তরিত হয়।

শিশু অধিকার সনদটি কবে গৃহীত হয়?

শিশু অধিকার সনদ বেশি দিনের পুরোনো বিষয় নয়। এই সেদিন ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়। এক বছর পরে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসঙ্ঘের প্রায় সকল সদস্য দেশ এটি অনুমোদন করেছে। প্রথম যেসব দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি।

শিশু অধিকার সনদের বিষয়বস্তু:

এই সনদের ৫৪টি ধারার মাধ্যমে এক কথায় শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সাথে সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষার নির্দেশনা রয়েছে। সনদে স্বীকৃত অধিকারের আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও মা-বাবার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, নাগরিক অধিকার, শোষণ এবং আইনের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়া শিশুর অধিকারসহ অনেক বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ সনদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব

শিশুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র ও সরকারের। পাশাপাশি শিশুদের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত প্রত্যেকেরই ওপর এ দায়িত্ব বর্তায়। এদের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা, দাদা-দাদি, বড় ভাই ও বোন, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুদের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গ।

সিডো (CEDAW)

সিডো শব্দটা আজকাল বেশ শোনা যায়। এটি হল নারীর অধিকার রক্ষার একটি সনদ। ইংরেজিতে পুরো নামটা Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) । বাংলায় এর মানে দাঁড়ায়- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।

দেশে-দেশ, সমাজে-সমাজে, পরিবারে-পরিবারে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করাই সিডোর মূল লক্ষ্য। তা ছাড়াও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দান। এ ছাড়া আরও লক্ষ্য হল সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন এবং মানুষ হিসেবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জাতিসঙ্ঘের স্বীকৃতি

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ থেকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয়। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সিডো কার্যকর হয়। ১৯৯৯ সালর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬৫টি রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে।

draft copy

বাংলাদেশের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ সিডো দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর। বাংলাদেশ এর সকল ধারা অনুমোদন করেনি। তবে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) তে বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে।

সিডো সনদ

সিডো সনদে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। এর ১ থেকে ১৬ তে রয়েছে নারী-পুরুষের সমতা সংক্রান্ত বিষয়। ধারা ১৭ থেকে ২২ এ রয়েছে সিডোর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়। আর ২৩ থেকে ৩০ ধারায় রয়েছে সিডোর প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়।

অধিকার নিয়ে কিছু কথা

অধিকার বলতে সেইগুলোকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায়। যেগুলো না থাকলে সে আর মানুষ থাকে না। এগুলোই মানুষকে মানুষ করে তোলে। মানুষ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং মতামত প্রাকশের যোগ্যতা নিয়েই জন্মায়। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি তাকে এগুলো দেয় না। তারা বরং সময় সময় এগুলো হরণ করে নেয়। মানবাধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।

তাহলে কথা হল, মানবাধিকার হল সেইসব অধিকার যা নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে এবং যা অর্জিত হলেই সে মানুষ হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পার। একই সাথে বলা যায় মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়।

এ অধিকারগুলো তার ন্যায্য পাওনা, কোন শর্ত সেখানে চলবে না, কমানো-বাড়ানোর অবকাশ নেই। একজন মানুষ যে কোন সমাজে-রাষ্ট্রে-পরিবারে-শ্রেণীতে-লিঙ্গে-সম্প্রদায়ে-ধর্মে-জাতিগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তিনি কতকগুলো অধিকার নিয়েই জন্মান। তাই মানুষের এই অধিকারগুলোকে সর্বজনীন বলা হয়। এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটা বিষয় মনে রাখব-

অধিকার জন্মগত অর্জন:

বলতে পারি একজন মানুষ কিছু অধিকার নিয়েই জন্মায়। তার চিন্তা করার ও তা প্রকাশের অধিকার, যাকে আমরা বাক স্বাধীনতাও বলে থাকি তা মানুষের জন্মগত অধিকার। আবার রাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কাপড় পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

অধিকার শর্তহীন:

শর্ত দিলেই আর সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়া যাবে না। অনেক সময় রাজা বা সরকার বলে থাকে, তুমি কথা বলতে পার, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বলা যাবে না। অর্থাৎ সব কথা বলা যাবে না। তাতে নাগরিকের স্বাধীনতা খর্ব হল, অধিকার ক্ষুণ্ন হল।

অধিকার ভাগ করা যায় না:

বিদ্রোহী কবিতাটা লেখার সময় কেউ যদি এসে বলত কবি নজরুল আপনি এটা অর্ধেক লিখতে পারবেন, পুরো লেখার অধিকার আপনাকে দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছে না!

একটা কলা তুমি বন্ধুর সাথে ভাগ করে খেতে পার, কিন্তু কলাটা ভাগ করেই খেতে হবে, এভাবে কেউ তোমাকে

draft copy

বাধ্য করতে পারে না। সেটা তোমার বিবেচনা আর বন্ধুত্বের সাথেই সম্পর্কিত বিষয়।

অধিকার আসলে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা:

কথা বলার, চলাচলের, মত প্রকাশের যে অধিকার সেগুলো তোমাকে স্বাধীনতা দেয়। ভাবনাচিন্তা আর বিচার-বিবেচনা করে তুমি যে কথাটা বলতে চাইছ সেটা বলার স্বাধীনতা তুমি ভোগ কর। এই স্বাধীনতা তোমার ক্ষমতাও বাড়ায়। ভাবো একবার নিচের দৃশ্যটা।

যাত্রী - এই রিক্সা দামপাড়া কত নেবে?

রিক্সাওয়ালা- আট টাকা।

যাত্রী - না, পাঁচ টাকা দেব।

রিক্সওয়ালা - স্যার কম হয়ে যায়, আমি যাব না।

যাত্রী টের পেল গরিব হলেও রিক্সওয়ালাটা স্বাধীনচেতা। আর স্বাধীন বলেই সে কম ভাড়ায় যাত্রী না নেওয়ার ক্ষমতাও রাখে।

অধিকার নিরাপত্তার অবলম্বন:

সেই ব্যক্তিই স্বাধীন মানুষ যার মনে ভয় থাকে না, যার জীবন ভয়ে ভয়ে কাটে না। যার জীবনটা সবদিক মিলিয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তিই যথার্থ স্বাধীন। একালে দেশে দেশে মৌলিক চাহিদা হিসেবে নাগরিকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাঁচটি অধিকার ভোগ করে, যেমন - খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা। এগুলো একজন মানুষের মৌলিক চাহিদা। এও এক ধরনের অধিকার, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকদের জন্যে এগুলো নিশ্চিত করা।

দেশের সব নাগরিকের জন্যে এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা খুব সহজ কাজও নয়। সুস্থ সবল মানুষকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যাবে না। তার তো খাবার কেনার সামর্থ্য থাকতে হবে। সে খাবারেও কেবল পেট ভরলে হবে না,

মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাবার হতে হবে। আবার তা কোনার সামর্থ্য মানে আয় দরকার। মানে বেকার থাকলে চলবে না। তাই মানুষের জন্যে কর্মসংস্থান করাও রাষ্ট্রের একটা কাজ। দারিদ্র্য অশিক্ষা, বেকারত্ব মানুষের স্বাধীনতা আর অধিকার ভোগের পথে বড় বাধা।

অধিকারের সীমা

অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত জোরে মাইক বাজিয়ে দাঁতের মাজন বিক্রি করছেন কেউ। কথা হল দাঁতের মাজনও বিক্রি করতে হবে আবার মানুষের পড়াশুনা, ঘুমেরও ব্যাঘাত করা যাবে না। তাই সভ্য দেশে শব্দের একটা সর্বোচ্চ পরিমাপ করে দেওয়া আছে। ঐ মাপের বেশি হলে তা শব্দদূষণ এবং বে-আইনি। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে দাঁতের মাজন বিক্রেতার মাইক বাজানোর অধিকারের একটা সীমা আছে।

অধিকার ততদূরই ভোগ করা যায় যতদূর তা অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না করছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার চেয়েও এখানে বড় বিষয় হল সমঅধিকারের বোধ। অর্থাৎ আমার এবং অন্যের অধিকারের মধ্যে

draft copy

একটা রফা করে চলাই সঠিক কাজ।

অনুশীলনী কাজ ১২: বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করব। আমাদের বিতর্কের বিষয় ‘সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক গতিশীলতার অন্তরায়’। এই কাজটি করার জন্য আমরা আমাদের পাঠ্যবিষয়গুলো আবার পড়ে নিতে পারি। তাছাড়াও বিভিন্ন বই, পত্রিকা ও ইন্টারনেটের সহায়তা নিতে পারি।

এই প্রতিযোগিতার জন্য আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে। একদল এর পক্ষে বলবে। অন্যদল বিপক্ষে বলবে। আরেকটি দল মূল্যায়ন করবে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন

draft copy

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

বাংলা অঞ্চল এবং ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুটি ভিন্ন পরিমণ্ডলে গড়ে উঠা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন ও রূপান্তরের কথা আমরা জেনেছি। এই আলোচনা যে শুধু বাংলা কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল তা কিন্তু নয়। বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে এই সকল ঘটনার ছিল গভীর সংযোগ। কেননা রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির গঠন ও রূপান্তরের অভিজ্ঞতা যে বহুবিচিত্র তা অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য এবং তার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের ইতিহাসের সুদূর অতীতে যাযাবর বৃত্তির কথা তোমরা জেনেছো। নিরাপদ জীবন এবং খাদ্যের সংস্থানে মানুষ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত করতো। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে দক্ষিণ এশিয়া এবং বাঙলা অঞ্চলের তৈরি হয়েছিল এক গভীর সংযোগ। বিশ্বের নানান অংশ থেকে বিভিন্ন যোদ্ধাদল, শাসক, বণিকগোষ্ঠী এবং কখনও কখনও ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের দিকে এসেছে, সম্পদ ও ক্ষমতা দখল করেছে, শাসন ও শোষণ করেছে, অনেকেই বসতি স্থাপন করেছে এবং ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি নির্মাণ ও বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত, নানান মানুষের মেলামেশায় আর বিরোধে-মিলনে ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ইতিহাসের এক বাস্তবতা। এই প্রক্রিয়ারই অনিবার্য ফল রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠন, পরিবর্তন ও রূপান্তর। আঞ্চলিক পর্যায়ের ঐতিহাসিক এই প্রক্রিয়া তাই বৃহত্তর অর্থে বিশ্ব ইতিহাসের অংশ। মানুষ এবং ইতিহাসের এই বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করতে শেখা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ কর্তব্য।

আগের অধ্যায়ে তোমরা অনুসন্ধান করে দেখেছো যে, দূরের ভূখণ্ড থেকে আগত উচ্চাভিলাষী শাসক ও ক্ষমতালোভী যোদ্ধারা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে। মানুষকে শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সুবিধা লুটে নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাবে, উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী, নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত এইরূপ যোদ্ধা ও দখলদার বাহিনী পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই সক্রিয় ছিল। এইসব ক্ষমতালোভী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও যোদ্ধারা ইতিহাসের বিস্তারকাল জুড়েই মানুষের জীবনে নানান চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছেন। শাসকশ্রেণির নির্ধারণ করে দেওয়া রাজস্ব প্রদান করে, বিধিবিধান মেনে নিয়েই মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে গেছেন। তবে মানুষ যে সবসময়ই বিনা বাক্য ব্যয়ে ক্ষমতালোভী শাসকদের সকল আদেশ মেনে গৎবাঁধা জীবন-যাপন করেছে তা কিছুতেই বলা যাবে না। বিভিন্ন সময়েই দেখা যায়, অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, বিপ্লব ও বিদ্রোহ করেছে। এইসবের মধ্য দিয়েই মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

draft copy

অনুসন্ধানী কাজ

বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করার সময় আমরা দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের অন্য অনেক দেশের উচ্চাভিলাষী রাজা, যোদ্ধা এবং রাজবংশের নাম জেনেছি, যারা দূরের ভূখন্ড থেকে বাংলায় এসে দখল চালিয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের সম্পর্কে আরও অনেককিছু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে দূরের ভূখন্ড থেকে আগত শাসক ও যোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জানি- তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লেখার চেষ্টা করি। অধ্যায়টি পড়ার পর নতুন কী কী তথ্য জানলাম তা এক নজরে মিলিয়ে নেবো।

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের গোঁড়ার কথা

পৃথিবীতে প্রথম কবে রাজা ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল? বিভিন্ন গবেষণার আলোকে ইতিহাসের পন্ডিতগণ বলে থাকেন যে, আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগেই মানুষ যখন নগর সভ্যতা গড়ে তুলতে শুরু করে তখনই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। এই রাষ্ট্র বা রাজ্য ব্যবস্থার উদ্ভবের পেছনেও কৃষির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। আদি যুগের শিকার ও সংগ্রহজীবী মানুষ যখন স্থায়ী বসতি স্থাপন করে কৃষি কাজ শুরু করে তখন তাদের জীবন ব্যবস্থা বদলে যায়। কৃষি জমির চাহিদা বেড়ে যায়। জমির উপর ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং তা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। কৃষি থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত হতে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শিকার ও সংগ্রহ করে বেড়াতো তখন একেকটি গোত্রে একেকজন গোত্রপতি থাকতো।

কিন্তু স্থায়ী বসতি স্থাপনের পর গোত্র প্রথার পরিবর্তে বৃহৎ সমাজ গড়ে ওঠে। নানান শ্রেণি পেশার মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এই মানুষদের নিরাপত্তা, বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষা, আইন-কানুন তৈরি ও তা বাস্তবায়নের দরকার হয়। আর এভাবেই একটি শক্ত কাঠামো গড়ে উঠে। গোত্রপতি বা দলপতিদের মধ্য থেকেই কেউ একজন আরও বেশি শক্তি অর্জন করে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করে রাজার আসনে আসীন হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন ধর্মগুরুরাও। রাজা এবং ধর্মগুরুরা মিলে নগরগুলোতে একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে এরা অনেক বেশি শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করেন।

নিজেদের জন্যে সুরক্ষিত দুর্গের ভেতর উন্নত বাসস্থান নির্মাণ করেন। সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এইভাবে সমাজে অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ থেকে রাজা ও ধর্মগুরুরা নিজেদের আলাদা করে ফেলেন। নগরের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, বণিক ও কৃষকদের নিরাপত্তা দেবার নাম করে কর বা খাজনা আদায় করেন। বিপুল অর্থের মালিকানা লাভ করেন। শুধু তাই নয়, একজন শাসক বা রাজার মৃত্যুর পর তার সন্তানই যেন রাজা হয়, সেই ব্যবস্থাও তারা করে যান। এভাবেই রাজা ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা, গ্রিক-রোমান সভ্যতাগুলোর বিকাশের সঙ্গে এই রাজতন্ত্রের বিকাশের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। রাজ্য ও রাজতন্ত্রের আদি রূপ দেখা যায় এই সভ্যতাগুলোতেই। রাজা ছিলেন একজন যোদ্ধা ও যোদ্ধাদের প্রধান। তার জীবন ছিল অসীম সম্পদ আর ক্ষমতায় পূর্ণ। রাজার সহযোগী ধর্মগুরু, উপদেষ্টা এবং সেনাপতিরাও ছিলেন সেই ক্ষমতার অংশ। এরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির আরও একটি প্রধান উপায় ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ।

বিভিন্ন নতুন অঞ্চলে আক্রমণ করে, ধন-সম্পদ লুট করে রাজারা নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতেন। পরাজিত

draft copy

এলাকা থেকে সাধারণ মানুষদের বন্দী করে নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতেন। নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করতেন। অন্যদিকে রাজা ও পুরোহিতেরা সাধারণ মানুষের জন্যে রচনা করতেন এমনকিছু আইন যার ফলে রাজা ও রাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আনুগত্য বৃদ্ধি পেতো। নিয়মিত কর-খাজনা দিয়ে, রাজার আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হতো

অনুশীলনী

উপরের পাঠের আলোকে নিচের বাক্য দুটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করি-

- রাজা ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নতুন এলাকা দখল ও আগ্রাসনের ভূমিকা ছিল ব্যাপক।
- মানুষকে নিরাপত্তা দেবার নাম করে রাজা ও ধর্মগুরুরা একসময় মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। মানুষের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্ব বা ধন-দৌলত দিয়ে দুর্গের ভেতরে আরামদায়ক জীবন যাপন শুরু করে।

প্রাচীন মিশরের রাজা (ফারাও): নিজেদের দাবি করতেন যারা দেবতার বংশধর

কৃষির উপর ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরে যখন নগর গড়ে উঠে তখনই সেখানে রাজা এবং রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। মিশরীয় রাজাদের উপাধি ছিল ফারাও বা ফেরাউন। ফারাও শব্দের অর্থ হচ্ছে, সুবৃহৎ বাড়ি। মিশরের রাজাগণ সুবিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন বলেই হয়তো তাদের এই নাম দেওয়া হয়। আজ থেকে প্রায় ৭ হাজার বছর আগে মিশরে রাজতন্ত্রের সূচনা হয় এবং একে একে অনেকগুলো রাজবংশের উত্থান ঘটে সেখানে। মিশরের বিখ্যাত ফারাওদের মধ্যে মেনেস, কুফু, আমেন হোটেপ এবং তুতেনখামেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

draft copy

তুতেনখামেন

তুতেনখামেনের সমাধি কক্ষ ও কফিন।

draft 2023

নেফারতিতির সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চিত্রে দেখানো হয়েছে, তিনি বসে সেনেট নামের একটা খেলা খেলছেন। অনুমান করা হয়, খেলাটা বর্তমান দাবা খেলার মতন কোনো খেলা ছিল।

Draft Copy

মিশরে চাষাবাদ কীভাবে করা হত? ফসল কীভাবে কাটা হত? খেঁজুর গাছ লাগানো হত। লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বীজ বপন করা হচ্ছে। শস্য কাটা হচ্ছে। নিচে খেজুর গাছে খেজুর ধরে আছে। এই ছবিগুলো দেয়ালে আঁকা হয়েছিল তখনকার মিশরে। আমাদের দেশের কৃষিকাজের সঙ্গে প্রায় ৪০০০ বছর আগের মিশরের চাষাবাদের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করতে পারো?

মিশরের ফারাওগণ ছিলেন বিপুল সম্পদ ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। নিজেদের তারা সূর্যদেবতা 'রে'-এর পুত্র বলে মনে করতেন। ফারাওগণ ছিলেন রাজ্যের সকল সম্পদ এবং সকল মানুষের প্রাণের মালিক। ফারাওদের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে রাজ্যের পুরোহিত বা ধর্মগুরুরাও বিশেষ ভূমিকা রাখতো। ধর্মীয় নেতারা ফারাওদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথা প্রচার করতেন।

ফারাওগণ শুধু এইজন্মে নয়, মৃত্যুর পরেও মিশরের মানুষদের রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রচারণা চালাতেন। ধর্মগুরুদের প্রচারণার ফলে ফারাওগণ এতই পবিত্র হয়ে উঠে যে, সাধারণ মানুষ তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতো না। মৃত্যুর পর এদের দেহ যেন অক্ষত থাকে এবং পরকালে আবারও শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেইজন্যই মূলত এদের দেহ মমি করে বিশালাকার পিরামিডের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হতো। মৃত দেহের সাথে মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে দেওয়া হত। ফারাওগণ তাদের চারপাশে সুবিশাল সৈন্যদল, উচ্চপদস্থ অমাত্য এবং ধর্মগুরুদের রাখতেন। এরা ছিল সবাই সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণির মানুষ। সাধারণ প্রজাদের শ্রম ও ঘামের অর্থ শোষণ করে এই উচ্চশ্রেণির মানুষেরা সীমাহীন ভোগ-বিলাস আর আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতেন।

draft copy

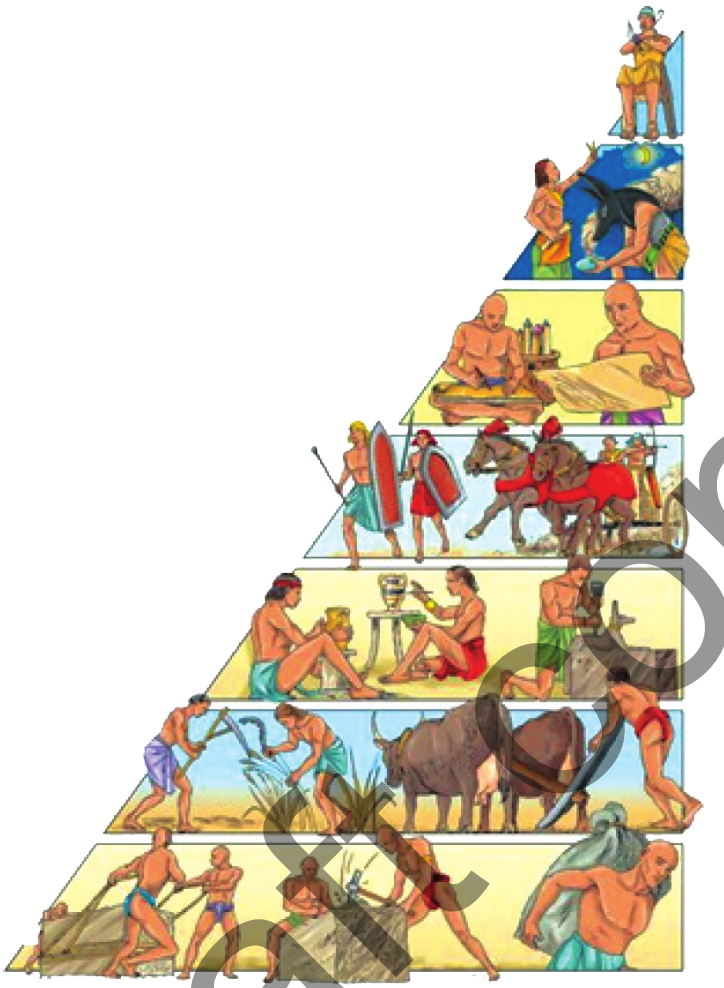

মিসরের তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাস। সবার উপরে ফারাও আর ফারাওয়ের নিচে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পেশার মানুষ অনেকটা পিরামিডের মতন বিস্তৃত।

একজন ফারাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হতো পরবর্তী ফারাও। পুত্র বা থাকলে নিকট সম্পর্কের কাউকে ফারাও পদে বসানো হতো। এভাবে বংশ পরম্পরায় তারা ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করতো।

স্পার্টা: একটি বর্বর ও পশ্চাৎপদ সামরিক রাষ্ট্র

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নাম আমরা সকলেই শুনেছি। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭৫০ থেকে ৫৫০ প্রাক সাধারণ অব্দের মধ্যে এই নগর রাষ্ট্রগুলোর বিকাশ ঘটে। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক রাষ্ট্র। স্পার্টার রাজা ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিকনায়ক। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রজারা তাঁর আদেশকে আইন হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য ছিল। স্পার্টা ছিল একটি যুদ্ধবাজ রাজার নগরী। এখানে নতুন

draft copy

শিশুর জন্ম হলে প্রথমেই শিশুটিকে একটি সংস্থায় নিয়ে যাওয়া হতো। শিশুটিকে যদি সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যবান দেখাতো তবে তার লালন-পালনের অনুমতি দেওয়া হতো। আর যদি দুর্বল ও অসুস্থ্য মনে হতো তবে তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করা হতো।

স্পার্টার রাজা ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা একজন শিশু বড় হয়ে যোদ্ধা হতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষ করে দেখে তবেই তাকে বাঁচিয়ে রাখার অনুমতি দিতো। মাত্র সাত বছর বয়সেই এইসব শিশুদের তাদের পরিবার থেকে কেড়ে নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণে লাগিয়ে দিতো। খাড়াই পর্বতে, তীব্র শীত ও গরমের মধ্যে সামান্য একখন্ড বস্ত্র আর অল্প একটু খাদ্য দিয়ে শিশুদের কঠোর ও নির্দয় একটি জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া হতো। এরপর এরা বড় হলে সৈন্যদলে নেওয়া হতো। বিভিন্ন রাজ্যে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যার কাজে লিপ্ত করা হতো। আর এর মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হতো তা দিয়ে স্পার্টার রাজা ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা বিলাসী জীবন যাপন করতো। গ্রিসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় স্পার্টার মানুষের জীবন ছিল নিরস ও কঠোর। মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় তারা ছিল খুবই পশ্চাৎপদ। সভ্যতার ইতিহাসে, মানুষের কল্যাণে, জ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়নে তারা তাই সামান্যতম অবদানও রাখতে পারেনি।

এথেন্স: প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম যারা গণতন্ত্র বা মানুষের অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার স্পার্টা সমসাময়িক একটি নগর রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে এথেন্স। শুরুর দিকে এথেন্সেও একজন রাজার শাসন এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালু ছিল। সমাজে চারশ্রেণির মানুষ ছিল। এর মধ্যে শুধু ধনী অভিজাতরাই রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করতো। সাধারণ কৃষক, বণিক, কারিগর ও দাসরা ছিল রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সাধারণ পূর্বাব্দ সপ্তম শতকে এথেন্সের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। অভিজাত শাসক ও যোদ্ধাদের অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং সম্পদ সঞ্চয়ের ফলে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সকল ভূমির মালিকানা চলে যায় অভিজাত শ্রেণির হাতে। এর ফলে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ও ঋণগ্রস্থ শ্রমিকেরা অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ভূমির উপর মালিকানা, ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে এই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। মানুষের এই দাবির মুখে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনে বাধ্য হয় সেখানকার শাসকেরা। সোলন, ক্লিসথিনিস, পেরিক্লিস নামের শাসকেরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি নিয়ে আসেন যার ফলে শাসক ও অভিজাত শ্রেণির মানুষদের একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে মানুষের অধিকার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

draft copy

সভ্যতা যেমন জীবন-প্রযুক্তি-স্থাপত্য-চিন্তায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তেমনই সভ্যতার শাসকগণ অন্য অঞ্চল দখল করতে চান। একটি রাজত্বের সঙ্গে আরেকটি রাজত্বের যুদ্ধ হতো। রাজা বা সম্রাটগণ অন্য রাজ্য বা লোকালয় দখল করতে গিয়ে নৃশংস অত্যাচার করতেন। অনেক মানুষকে হত্যা করতেন। অন্যদের বসতি ধ্বংস করতেন। বেশির ভাগ সভ্যতায় শাসকগণ পরাজিত মানুষজনের অনেককে দাস হিসেবে বন্দী করে নিয়ে আসতেন। এই দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বিভিন্ন কঠিন শ্রমের কাজে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপনা তৈরি করেছিল প্রধানত এই দাসগণ। গ্রিক বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধ লেগেই থাকত। উপরে গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র।

draft copy

জমির উপর কৃষকদের মালিকানা, ঋণের দায়ে সাধারণ প্রজাদের কৃতদাসে পরিণত না করার আইন হয় এথেন্সে। এরপর সাধারণ কৃষক, বণিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষদের নিয়ে একটি এসেমব্লি গঠন করা হয়। ১০ দিন পর পর এই এসেমব্লির অধিবেশন বসতো। অধিবেশনে যেকোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইন, প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারতো। গণপরিষদ ছাড়াও গোপন ভোটে নির্বাচিত ৫০০ সদস্যের একটি পরিষদ ছিল যারা আইন ও বিচারকার্য ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতেন। এছাড়া ১০ জন সেনানায়কের একটি পরিষদ ছিল। এই পরিষদ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তা গণপরিষদের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল।

প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সেই প্রথম রাজ্য পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। যদিও এথেন্সের বিপুল সংখ্যক দাস এবং নারীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, তবুও এথেন্সকে বলা হয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার বা আঁতুড়ঘর। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এথেন্সে যে শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তারই পরিণত ফল হিসেবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসেরে বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history4kids.co)

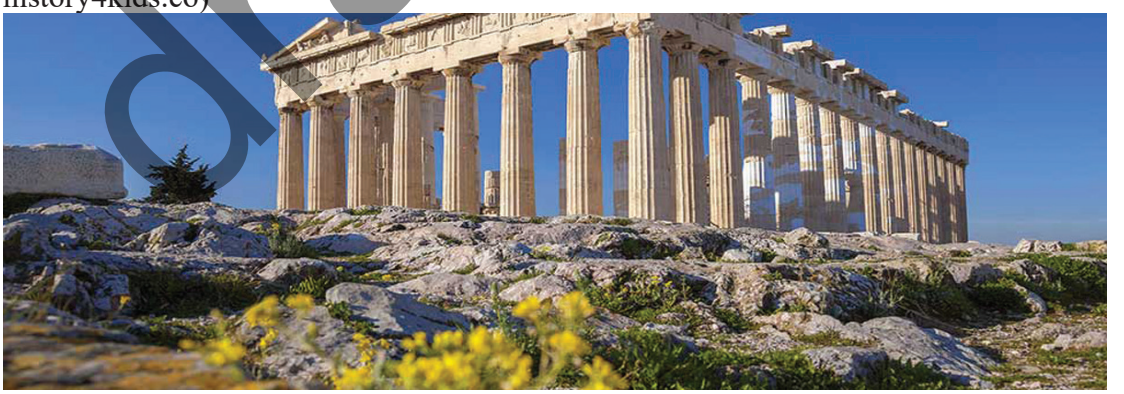

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history4kids.co)

draft copy

অনুশীলনীঃ

প্রাচীন মিশর, স্পার্টা ও এথেন্সের রাজনৈতিক সংগঠন, ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। উপরের পাঠের আলোকে এই তিনটি স্থানের মানুষের রাজনৈতিক জীবন ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে নিচের ছকটি পূরণ করি-

মিশর	স্পার্টা	এথেন্স

সাম্রাজ্যবাদের যুগ

বাংলা অঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, প্রাচীন নগর সভ্যতা এবং জনপদভিত্তিক রাজনৈতিক ইউনিটগুলোর মধ্য থেকেই এক সময় একেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে। এরপর যুদ্ধ ও রক্তপাতের মাধ্যমে চারদিকে দখল অভিযান চালিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যে রূপদান করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার মৌর্য, গুপ্ত এবং বাংলার পাল বংশ এইরূপ বংশানুক্রমিক সামাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম উদাহরণ। বাংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মতো বিশ্বের অন্য অনেক অঞ্চলে ঠিক একই সময়ে অনেকগুলি উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালোভী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান ঘটে। এরা পৃথিবীর বিস্তৃত অংশ জুড়ে হত্যা, লুণ্ঠন ও দখল অভিযান পরিচালনা করে নিজেদের রাজ্য সীমানা বৃদ্ধি করে। এইসব শক্তির উত্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে যাদের নাম সবার আগে নিতে হয় তার মধ্যে ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমান সাম্রাজ্যের জুলিয়াস সীজার, ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লামেন, মঙ্গোলীয় যোদ্ধা চেঙ্গিস খান, গজনভী বংশের শাসক সুলতান মাহমুদ, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জার্মানির হিটলার এবং ইটালির বেনিতো মুসোলিনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব শাসকেরা নিজেদের নাম-যশ খ্যাতি আর অর্থসম্পদ বৃদ্ধির লোভে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সমর অভিযান চালিয়েছেন। শুধুমাত্র নিজের রাজ্যের সীমানা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লোভে জন-জীবনে নিয়ে এসেছেন বিপুল ধ্বংসলীলা, হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধ পরিচালনা, মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় এদের নেতিবাচক কার্যকপাল পৃথিবীর ইতিহাসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

draft copy

ম্যাসিডোনিয়ার উত্থান ও আলেকজান্ডারের দখল অভিযান

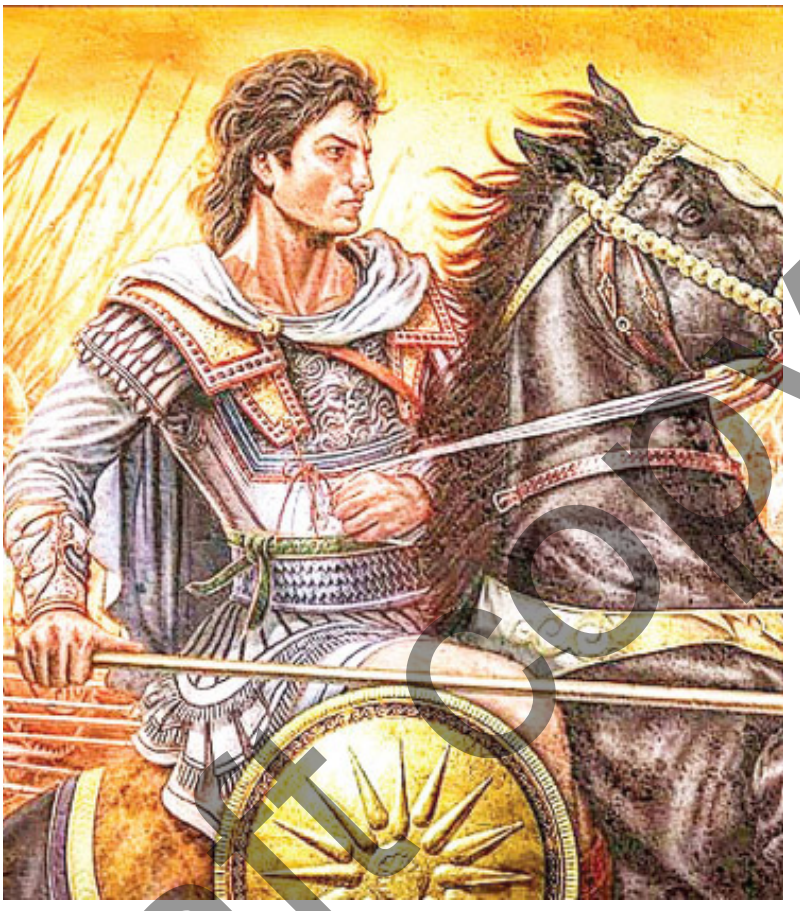

গ্রীক বীর আলেকজান্ডার

সাধারণ পূর্বাব্দ পঞ্চম শতকের শুরুর দিকে স্পার্টান যোদ্ধারা এথেন্সের উপর দখল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করে। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক রাষ্ট্র। এথেন্সের গৌরব নষ্ট করা এবং সম্পদ দখলের লোভেই মূলত এই আক্রমণ পরিচালিত করে। এই যুদ্ধে এক সময় গ্রিসের সবগুলো নগর রাষ্ট্রই জড়িয়ে পড়ে। সমগ্র গ্রিস স্পার্টা এবং এথেন্স- এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ সুদীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী স্থায়ী হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেনোপনেশীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। তিরিশ বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধের ফলে এথেন্সের সুসজ্জিত ঘরবাড়ি, বাগান, শস্যক্ষেত্র সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। খাদ্যের অভাব ও মহামারীতে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়ে অনেকেই স্পার্টার দাসে পরিণত হয়। দীর্ঘ এই যুদ্ধের সময়ে গ্রিসের শক্তিশালী নগরগুলি যখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই গ্রিসের উত্তরদিকে অবস্থিত ম্যাসিডোন নামে একটি রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে শুরু করে। ম্যাসিডোনের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ্পো একটি শক্তিশালী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করে গ্রিসের দুর্বল নগরীগুলো দখল করে নিতে শুরু করে। এভাবে সমগ্র গ্রিসের উপর দখল প্রতিষ্ঠার পর ফিলিপ্পো পারস্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। পারস্যের উর্বর ভূমি, মূল্যবান ধন-সম্পদ এবং দাসদাসীদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত ফিলিপ্পো পারস্য অভিযানের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু এই অভিযান শুরু হবার আগেই ফিলিপ্পো মারা যান। সিংহাসনে আরোহন করেন তাঁর বিশ বছরের পুত্র

draft copy

আলেকজান্ডার। ইতিহাসের অনেক বইপত্রে যাকে 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' বলেও অভিহিত করা হয়। আলেকজান্ডার ছিলেন অনেক উচ্চাভিলাষী, অর্থসম্পদ ও নাম-যশ লোভী সমরনায়কদের একজন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি অতিকায় সৈন্যদল নিয়ে প্রথমেই এশিয়ার মাইনর অঞ্চলে আক্রমণ চালান। এরপর পারসিকদের পরাজিত করে ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আলেকজান্ডারের নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উচ্চাকাঙ্খার এক নির্মম দলিল হয়ে রয়েছে। তাঁর সমর অভিযানের মুখে যারাই বাঁধা দিতে চেয়েছে, তিনি তাদের হয় হত্যা করেছেন, নয়তো বন্দী করে দাসে পরিণত করেছেন। তীর নামক একটি শহর দখল করার পর আলেকজান্ডারের নির্দেশে ৮ হাজার লোককে হত্যা করা হয়, ৩০ হাজার লোককে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আলেকজান্ডারের আক্রমণের মুখে পড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, অসংখ্য ঘরবাড়ি, নগর ও শস্যক্ষেত্র বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। মিশর, মেসোপটেমিয়া, মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতবর্ষে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত আলেকজান্ডারের দখল অভিযান বিস্তৃত হয়। তিন বছরের লাগাতার যুদ্ধে এশিয়ার বিস্তৃত এক অঞ্চলজুড়ে তিনি ত্রাসের সঞ্চার করেন। ৩২৩ সাধারণ পূর্বাব্দে তিনি সামান্য জ্বরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আলেকজান্ডা তখন তাঁর সমুদয় সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে ব্যাবিলনে অবস্থান করছিলেন। মৃত্যুর পর আলেকজান্ডারের দেহ সমাধিস্থ করার পূর্বেই তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে রাজ্যের মালিকানা নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য যুদ্ধ, রক্তপাত ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়।

ইতিহাসের অনেক বইপত্রে এইসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নামের পূর্বে ও পরে অনেক গৌরবমাখা শব্দ ব্যবহার করা হয়। দখলদার শাসকদের দখলকার্যকে মহানভাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু মানুষের রক্ত ও লাশের উপর দিয়ে যে গৌরব তারা প্রচার করতে চায়, তা আদৌ গৌরব নাকি লজ্জার তা আমাদের নতুন করে অবশ্যই ভাবতে হবে। মিথ্যে ও অযৌক্তিক গৌরব প্রচারের চেষ্টা ইতিহাসকে বিকৃত করে। সত্য থেকে সবাইকে বঞ্চিত করে।

অনুশীলনীঃ চলো একটি প্রতিবেদন রচনা করি-

সম্রাট আলেকজান্ডারের দখল অভিযান এবং হত্যালীলার বিশেষ উল্লেখ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন লিখি-

---

---

draft copy

জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

সাধারণ অব্দ পনেরো শতক থেকে সাধারণ অব্দ বিশ শতকের মধ্যে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ। জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে ক্রমান্বয়ে ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং প্রুশিয়াতে। এসময় রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। জাতিরাষ্ট্র বলতে মূলত একক জাতিগত পরিচয় বা জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্রকে বোঝায়। সাধারণত জাতিরাষ্ট্রসমূহে জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মননশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিজস্ব জাতিগত তত্ত্ব ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে জাতিরাষ্ট্র গুলো বিশ্ব ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নসের মতে, জাতিরাষ্ট্রের ধারনা ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। মূলত 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র'—এর ভিত্তিতেই স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তবে আধুনিক যুগে জাতিরাষ্ট্রের ধারণা খুব প্রসঙ্গিক নয়। কারণ বর্তমানকালে বেশিরভাগ দেশেই একাধিক ভাষা-জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে। যেমন: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ফরাসি বিপ্লব

ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লব ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ধারণ করে যাত্রা শুরু করে এবং একই সাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চের সকল গোঁড়ামী ত্যাগ করে নিজেদেরকে পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। ফরাসি বিপ্লব পশ্চিমা রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি এবং অভিজাতন্ত্রের ক্ষমতা ভেঙ্গে নাগরিক অধিকারের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ইতিহাসবিদগণ এই বিপ্লবকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করেন।

draft copy

ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল, "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"। এই শ্লোগানটিই বিপ্লবের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিলো যার মাধ্যমে সামরিক এবং অহিংস উভয়বিধ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই ১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট মাসে মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণা করা হয়। যার মূল বিষয়বস্তু ছিল, "সব মানুষই স্বাধীন, সব মানুষেরই সমান অধিকার ভোগ করা উচিত। আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই সমান।" রেনেসাঁর মতোই ফরাসি বিপ্লবও আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তার জগতে নতুন ধারার জন্ম দেয়।

ফরাসি শাসক চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকালে (সাধারণ অব্দ ১৬৫১-১৭১৫) ফ্রান্স একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ লুই এবং ষোড়শ লুই এর সময়ে ফ্রান্সে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক দুর্বলতা একসাথে হয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ সাধারণ অব্দে বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ ও এর পতনের মধ্য দিয়ে। সূচিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের নতুন অধ্যায় ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের এই অবস্থাকে অনেকগুলো ছোট-বড় খরস্রোতা নদীর সংমিশ্রণে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠা বিধ্বংসী বন্যার সাথে তুলনা করা হয়।

ফরাসি বিপ্লব শুধু ফ্রান্সেই নয়, বলতে গেলে পুরো ইউরোপ জুড়েই সুবিধাভোগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে, অবাধ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিদ্রোহ বিপ্লবে রূপ নিয়েছিল। রাজা ষোড়শ লুই-এর পতনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছিল। একইসাথে বিপ্লবী মনোভাব সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনীতিতে রাজতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, একজন স্বতন্ত্র মানুষ) ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রাজনীতি ও ক্ষমতায় আবির্ভূত হয় সাধারণ মানুষ। ইউরোপ জুড়েই তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

রাজতন্ত্রের পতন এবং মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে চলো একটি টীকা লিখি।

ঔপনিবেশিকবাদ, বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষের মুক্তির লড়াই

জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, ফরাসি বিপ্লব, রেনেসাঁ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন ধারার সূচনা হলেও এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার অনেকগুলো দেশে সেই আলো তো পৌঁছায়ই নি, বরং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কলোনি হিসেবে নির্দয়ভাবে শাসন ও শোষণের শিকার হচ্ছিল। সাধারণ অব্দ আঠারো এবং উনিশ শতকে একই সাথে আন্ত:ইউরোপীয় ও আন্ত:মহাদেশীয় বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি দেশ বাণিজ্যিক উপনিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দূর ভূখন্ডে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। নতুন ভূখন্ড দখলের প্রতিযোগিতা শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিশেষ করে আফ্রিকা এবং এশিয়ায়।

এই দখলদারিত্বের পরিণতি ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লাভ-ক্ষতি, ক্ষয়-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাজনীতিতে পরাপস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমোর্ধেই ইউরোপে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠে এবং বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে রাশিয়া, ইতালি এবং জার্মানিতে। যেমন: রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের রাজনৈতিক অঙ্গনে

draft copy

আরেকটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। জার্মানিতেও তখন অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে গড়ে উঠে নাৎসিবাদী রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক মতবাদ।[ছবি]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা

সমাজতন্ত্র বা Socialism হচ্ছে এমন একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং অর্থনীতির একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও একই সাথে এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে সাম্যবাদ বা সকল নাগরিকের সমান অধিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

অর্থাৎ এটি এমন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদ ও অর্থের মালিকানা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য উৎপাদন হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি দেশের কলকারখানা, খনি, জমি ইত্যাদি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি একটি অর্থনৈতিক মতবাদ হলেও রাশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছিলো ১৯১৭ সালে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, কিউবা প্রজাতন্ত্র লাওস পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এখনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ফ্যাসিবাদ

বিশ শতকের শুরু দিকে ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনি যে মতাদর্শ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রচলন করেন তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Fascism। মুসোলিনি লিখেছেন, "ফ্যাসিবাদ হলো একাধারে কর্ম ও চিন্তা"। এটি ছিল সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং গণতন্ত্র বিরোধী। ফ্যাসিবাদ একটি কঠোর জাতীয়তাবাদী এবং কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা সাধারণত একটি দলের প্রধান ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন হয় না। যেখানে মুক্ত বাজার নেই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। রাষ্ট্র প্রেস এবং অন্যান্য সমস্ত মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্যাসিবাদী সরকারগুলো সাধারণত একজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। ফ্যাসিস্টরা আন্তর্জাতিক আইনের ধারণায়ও বিশ্বাস করে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালিতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দল চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন যে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করে তাই ফ্যাসিবাদ হিসেবে পরিচিত। ফ্যাসিবাদ মূলত একনায়কতন্ত্রেরই একটি বিশেষ রূপ।

Draft Copy

নাৎসিবাদ

নাৎসিবাদ একটি রাজনৈতিক মতবাদ যা বিশশতকের প্রথমার্ধে নাৎসি পার্টির মাধ্যমে জার্মানিতে উদ্ভুত হয়। এটাকে সাধারণত একধরনের ফ্যাসিবাদ বলেও চিহ্নিত করা হয়। এরমধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌলিন্যবাদ (সায়েন্টিফিক রেসিজম), ইহুদিবিদ্বেষ (এন্টিসেমিটিজম) অন্তর্ভুক্ত। অ্যাডলফ হিটলারকে নাৎসিবাদের প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৩৩ সালে অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন। তিনি ধীরে ধীরে জার্মানিকে এক-পার্টি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এটা জার্মানির রাষ্ট্রীয় মতবাদ ছিল। জার্মানির ইতিহাসে এ সময়টাকে নাৎসি জার্মানি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তোমরা বুঝতে পারছো, একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, অন্যদিকে রাজনীতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের সরকার ব্যবস্থা, বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে পুরো ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আগ্রাসী হয়ে উঠে এবং একটি যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে বিশ্বসভ্যতা বিশ শতকের প্রথমার্ধেই দুটো রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ মোকাবেলা করে। এসময় নিজেদের প্রয়োজনে বা দাস ব্যবসার অংশ হিসেবে উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশুলোতে অভিবাসন ঘটে। তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের নিজস্বতা বজায় থাকে।

সাধারণ অব্দ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগিজসহ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকায় দখলকৃত ভূখন্ডগুলো থেকে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেখানে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। যেমন: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম। তেমনি আফ্রিকায়ও সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। তাছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি রক্ষার স্বার্থে সব দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনীঃ চলো বিতর্ক করি-

উপরের পাঠ থেকে আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ এবং ন্যাৎসিবাদ সম্পর্কে মৌলিক কিছু ধারণা পেয়েছি। চলো এইবার কয়েকটি দল গঠন করে যেকোনো দুইটি মতবাদকে বেছে নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ এবং ন্যাৎসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করে নিচের ছকটি পূরণ করি-

গণতন্ত্র	সমাজতন্ত্র	ফ্যাসিবাদ	নাৎসিবাদ

draft copy

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

আমরা বর্তমানকালের আরও একটি দেশের কথা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করবো। সেটি হচ্ছে আমেরিকা। তোমরা যদি আমেরিকার দিকে লক্ষ করো দেখবে, আজকের যে শক্তিশালী-সমৃদ্ধ আমেরিকা তাদের উপরও কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার মতোই একসময় ইউরোপীয়রা দূর-ভূখণ্ড থেকে গিয়ে দখলদারিত্ব চালিয়েছে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে।

শান্তিপ্রিয় আমেরিকা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন এবং অপরিচিত ছিল। উন্নত ও আধুনিক সামরিক কৌশলও তাদের জানা ছিল না। একেবারেই সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত আমেরিকানরা সাধারণ অব্দ ষোলো শতক পর্যন্ত তীর, ধনুক, বল্লম, বর্শা-এসব হাতিয়ারের সাথেই পরিচিত ছিল। ফলে সহজেই আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদেরকে (রেড ইন্ডিয়ান সম্পর্কে তোমরা ৭ম শ্রেণিতে কিছুটা জেনেছো।) পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল ইউরোপ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের। আমেরিকাতেও ইনকা সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, আজতেক সভ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর আমেরিকায় দখলদারিত্বের প্রথম আঘাত আনে স্পেন। স্পেনীয়রা সান ডমিঙ্গো দ্বীপ, ক্যারিবীয় দ্বপপুঞ্জ, মেক্সিকোর আজটেক সভ্যতা, ফ্লোরিডা থেকে ভেনিজুয়েলা, ইনকা সভ্যতার কেন্দ্রস্থল পেরুসহ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠন করে। স্থানীয়দেরকে দমন করে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিস্ঠা করে।

একইভাবে ব্রিটিশরাও সাধারণ অব্দ ষোলো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত আমেরিকায় দখলদারিত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাববলয় তৈরি করেছিল। তারা ভার্জিনিয়াসহ একে একে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপন করে। বাদ যায়নি ফ্রান্সও। তারাও আমেরিকার পোর্ট রয়্যাল, কানাডার কিউবেক-এ দুটি ঘাঁটি স্থাপন করে প্রভাববলয় সৃষ্টি করে। এভাবেই আমেরিকা জুড়ে ইউরোপীয় দখলদারিত্ব সৃষ্টি হয়। তবে আমেরিকা দখলের বিষয়টি ছিল মূলত আবিষ্কারের মাধ্যমে।

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে আমেরিকার নতুন নতুন ভূখণ্ডে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে, আবিষ্কার করতে থাকে এবং নিজেদের ক্ষমতা ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উপনিবেশগুলোতে বিভিন্ন দমন-পীড়ন-শোষনমূলক আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক স্বাধিকার কেড়ে নেওয়া প্রভৃতি কারণে ধীরে ধীরে একদিকে আমেরিকানদের সাথে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তিক্ততা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে এশিয়া আফ্রিকার মতো আমেরিকাতেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি হয়। জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসনদের মতো দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ফলে আঠারো শতকের শেষের দিকে বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমেরিকা। ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

তবে ইউরোপীয়রা একে একে আমেরিকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেও ইউরোপের মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না আমেরিকায়। আমেরিকা স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত ছিল- এখনো আছে।

draft copy

রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব

আজ শ্রেণিকক্ষে এসে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের স্যার একটু যেন উদাস হয়ে আছেন্ তাঁর এ মনোভাব দেখে সবাই একটু অবাকই হয়ে গেল। সীমা চুপ থাকার মেয়ে নয়, বলল- স্যার, আপনার কি মন খারাপ? স্যার কিছু না বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটু নাড়াচাড়া করে বললেন, শোন। মোবাইলে দুটি কলি শোনা গেল- (অথবা স্যার আবৃত্তি করবেন)-

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;

ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ ॥

স্যার থামতেই ওরা হাত তালি দিল এবং সবার হয়ে সুলতানা বলল, চমৎকার একটা গান শোনালেন (বা কবিতা শোনালেন) স্যার- আমরা কি পুরো গানটা শুনতে পারি?

স্যার বললেন, তার আগে একটা কাজ করি চলো।

এবার সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, কী কাজ স্যার?

স্যার বললেন, গানের কথাগুলো খেয়াল কর আরেকবার। এবার তিনি ব্যাখ্যা করে বললেনপৃথিবীটা যেন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে আছে, প্রতিদিনই নানা জায়গায় নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। চলার পথ যেন অন্ধকার এবং কুটিল, পদে পদে লোভের প্রতিবন্ধক।

শুনে ওরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন স্যার বললেন, আচ্ছা একটা কাজ করতে পারবে তোমরা?

ওরা আবারও সমস্বরে বলল- কী কাজ স্যার? আমরা কাজটা করতে চাই। আপনি বুঝিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই পারব।

তখন স্যার ওদের প্রশ্ন করলেন, পৃথিবীর কোথায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, জান?

রুদ্র আর মঙ্গলা একসাথেই বলে উঠল, ইউক্রেনে- রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছে।

স্যার বললেন, দ্যাখ আজকালকার যুদ্ধে সরলভাবে দুটি পক্ষ লড়ছে এমন না-ও হতে পারে। আরও অনেক পক্ষ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে অংশ নিচ্ছে, খেয়াল করেছ?

তখন স্যার তাদের একটা কাজ করতে বললেন। যুদ্ধের দুটি মূল পক্ষের নাম লিখে, তারপর দুই পক্ষের অন্যান্য সহযোগীদের নাম লিখতে বললেন-

যুদ্ধের দুই পক্ষ	ইউক্রেন	রাশিয়া
পরোক্ষ মিত্র রাষ্ট্র		

এরপরে স্যার বললেন, দ্বিতীয় একটা কাজ তোমরা করবে। সেটি হল নিচের নমুনা অনুযায়ী পৃথিবীর কোথায় বর্তমানে এবং গত এক দশকের মধ্যে যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত হয়েছে তার তালিকা করবে-

draft copy

যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত	জড়িত দেশ	পরিণতি
সুদান ও দ. সুদান	দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত	বহু নিহত ও বহু মানুষ শরণার্থী হয়

এ তালিকা করে ওরা যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল। স্যার বললেন, তোমরা যেসব যুদ্ধের কথা তালিকায় লিখেছ এর যে কোনা একটি নিয়ে একদিন ক্লাসে কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে শুনতে পার। যেমন ধরো পরিচিত কোনো অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক যাঁরা এ বিষয়ে জানেন ও বলতে রাজি হবেন তাঁদের একজনকে ডেকে এনে এ বিষয়ে ভালোভাবে জানতে পার।

সবাই মিলে উৎসাহর সঙ্গে এ কাজে লেগে পড়ল। নির্দিষ্ট দিনে কাজটাও হল। তারা মন দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর নানা স্থানে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ এবং এসবের পরিণতি সম্পর্কে শুনল। তারপরে তারা আবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানটি যার প্রথম দুই পংক্তি তাদের শুনিয়েছেন স্যার। গানটা তোমরাও পড় এবং অনুষ্ঠানে এর অংশবিশেষ আবৃত্তি কর। রেকর্ডে গানটা শুনবে এবং সুযোগ থাকলে নিজেরাও শিখে গানটা করবে।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী-
কর’ ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন’ অমৃতবাণী,
বিকশিত কর’ প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর’ কলঙ্কশূন্য।

***

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়বিষবিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,

draft copy

তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি-

তব শুভসঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

সুন্দর আবৃত্তির পরে শ্রেণিকক্ষে যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এলো। সবার মনে প্রশান্তি। অতিথিরা যাওয়ার পরে শুচি বলল- শান্তির জন্যেই কাজ করতে হবে আমাদের।

তখন স্যার বললে, তোমরা নিশ্চয় শুনেছ জাতিসঙ্ঘের অধীনে যে শান্তিরক্ষী মিশন হয় তাতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ খুব উজ্জ্বল। ক্লাসের সবাই স্যারের কাছে এ নিয়ে জানতে চাইল। তখন স্যার বললেন, আচ্ছা আগামী দিনের ক্লাসে আমরা এ বিষয়ে শুনব, জানব এবং কিছু কাজও করব।

নির্দিষ্ট দিনে স্যার ওদের ক্লাসে নিয়ে এলেন দশম শ্রেণির মনিজা আপুকে। ওরা কৌতূহলী হয়ে স্যার এবং মনিজা আপুর দিকে তাকাচ্ছিল। দেখে স্যার একটু হেসে বললেন- মনিজাকে কেন এনেছি জান?

পুরো ক্লাস একসাথে বলল, না স্যার।

তখন স্যার রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বললেন, ওর চাচা বাংলাদেশ আর্মিতে আছেন এবং জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে তিনি সিয়েরালিওনে কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ওর মুখে শুনবে তোমরা।

এরপরে মনিজা ওর চাচা এবং তাঁর সঙ্গীদের ছবি দেখাল, তাতে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওনে তাঁরা জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষীদের নীল ক্যাপসহ কর্মব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তারপরে মনিজা ওর চাচার মুখে শোনা কাহিনী ওদের বলল।

সবাই চুপচাপ শুনল এবং শেষ হওয়ার পরে হাততালি দিল।

এবারে স্যার ওদের বললেন, তোমরা একটা কাজ কর। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, অনলাইন পত্রিকায়, বিভিন্ন বইয়ে বিদেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম নিয়ে যেসব ফিচার, খবর, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে প্রকল্প তৈরি করবে। আলোচনা করে প্রত্যেক দল একেকটি দেশ বেছে নেবে। তারপর দলে বসে নির্ধারিত দেশে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্যরা যেসব কাজ করেছে, ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে, যুদ্ধের যেসব অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে এবং তারা অন্যান্য যেসব সমাজসেবামূলক কাজ করেছে সেসব তথ্য নিয়ে ছবিসহ উপস্থাপনা তৈরি করবে।

তোমরাও সবাই এই কাজ শুরু করে দাও। দেখবে কোনো কোনা দেশের মানুষ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের কাজে এতই সন্তুষ্ট হয়েছে যে সেখানে তারা বাংলাদেশের নামে সড়কের নাম দিয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে, কেউ কেউ বাংলাভাষাও শিখেছে।

এইসব কাজ হয়ে যাওয়ার পরে একদিন অমিত বলল, স্যার, আমাদের তো মনে হয় জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে জানা দরকার। তখন সায়মাও বলল, হ্যাঁ স্যার, বিশ্ব শান্তি নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের তো জাতিসঙ্ঘের কথা জানতে হবে। স্যার সায় দিয়ে বললেন, একদম ঠিক বলেছ তোমরা, চলো আজ জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা

draft copy

যতটা সম্ভব জেনে নেব।

অনুসন্ধানী পাঠ

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

যুদ্ধ কখনও শান্তির বাহক হতে পারে না। যুদ্ধ আনে ধ্বংস, দুর্ভোগ এবং অশান্তি। বিশ্ব জুড়ে হাহাকার, নিপীড়ণ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে অনেকটাই নিঃস্ব করে গেছে। এর একটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং অন্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। পৃথিবীব্যাপী জাতিগত দ্বন্দ্ব মেটানোর উদ্দেশ্যে শান্তির মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা কিছু মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে চুপ করে বসে থাকেন নি। সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টায় অবিচল ছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরই ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘ লীগ অব নেশনস’ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ‘লীগ অব নেশনস’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই আরেকটা যুদ্ধ এসে কড়া নাড়া শুরু করল। ১৯৩৯ সালে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ছয় কোটি মানুষ প্রাণ হারায়; পঙ্গু ও আহত হয় বহু লক্ষ মানুষ। অনেকেই ঘরহারা হয়। কেউ কেউ পঙ্গুত্বকে আজীবনের সঙ্গী করেন।

বহু দেশ যুদ্ধে তাদের কর্মক্ষম যুবকদের হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা জান এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ছোট্ট দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা ফেলেছিল। তাতে মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমায় ৬৬ হাজার মানুষ ও নাগাসাকিতে ৪০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। আর আনবিক তেজস্ক্রিয়তায় আহত হয়ে দীর্ঘ পঙ্গু জীবন কাটিয়ে আরও প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। সেদিন দুটি নগরীই তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

draft copy

মহাযুদ্ধ

বিংশ শতাব্দীর দুই যুদ্ধকে কখনও মহাযুদ্ধ কখনও বিশ্বযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়। এর কারণ এ দুই যুদ্ধে বিশ্বের বহু দেশ যুক্ত হয়ে পড়েছিল। দুই মহাযুদ্ধেরই মূল প্রতিপক্ষ ছিল ইউরোপীয় দেশ এবং ইউরোপই ছিল মূল রণাঙ্গন। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গণ ইউরোপ ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকায় এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ এ যুদ্ধ সাগরেও সংঘটিত হয়েছিল। দুই মহাযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে অনেক বেশি।

প্রথম মহাযুদ্ধ

এ যুদ্ধ শুরু হয় একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বর্তমান বসনিয়া-হার্জিগোভিনার রাজধানী সারায়োভোতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যর (আধুনিক অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি) যুবরাজ ফারডিনাগুকে সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা গুলি করে হত্যা করলে যুদ্ধের সূচনা হয়। হত্যাকান্ড ঘটেছিল ২৮ জুন ১৯১৪ সালে। গ্রীষ্মের শেষ দিকে এই পক্ষে আরও দেশ যোগ দিয়ে শক্তি বাড়িয়ে নেয়। যে পক্ষ আক্রমণ করেছিল তাদের বলা হয় অক্ষ শক্তি বা কেন্দ্রীয় শক্তি। এই পক্ষে ছিল জার্মেনি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। অপর পক্ষকে বলা হয় মিত্রশক্তি। এই পক্ষে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও জাপান। অক্ষ শক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয় ১৯১৮ সালে। এই চার বছরের যুদ্ধে ইউরোপের আরও দেশ জড়িয়ে পড়েছিল এবং রণাঙ্গন ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রাণ হারায় এবং দ্বিগুণ মানুষ আহত হয়। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জার্মেনি ও তুরস্কের শক্তি খর্ব হয়। তুরস্কের পরাজয়ে আরবে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটে ও সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ যুদ্ধে তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম এছাড়া এ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

draft copy

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

বলা হয় প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল (বিশেষত ভার্সাই চুক্তি) তার মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। এই চুক্তি জার্মেনির জন্য অবমাননা ও গ্লানিকর ছিল। ফলে মাত্র পনের বছরের মধ্যে সেখানে অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী নাৎসি পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় জার্মানির শক্তি সঞ্চয় ও বড় রকম যুদ্ধের প্রস্তুতি। হিটলার ও তার সহচররা বলতেন জার্মানরা হল আর্যজাতি, আর আর্যরা হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহুদি ও আফ্রো-এশীয়দের মনে করা হত নিকৃষ্ট জাতি। তখন জার্মেনি অধিকৃত দেশগুলোতে অনেক ইহুদির বসবাস ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত হিটলার ধারাবাহিকভাবে ইহুদি নিধনের কাজ চালিয়ে গেছে। গ্যাস চেম্বার, কনসট্রেশন ক্যাম্পসহ তারা মানুষ মারার কারখানা তৈরি করেছিল। এভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছয় বছরে ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। এবারেও উভয় পক্ষে শক্তি সমাবেশ ঘটতে থাকে। জার্মেনির নেতৃত্বে গঠিত অক্ষ শক্তিতে ছিল ইতালি ও জাপান। মিত্রশক্তি হিসেবে ছিল ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম ধাক্কায় জার্মেনি একে একে ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড, হল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্স দখল করে। তারা পূর্ব দিকেও বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছে। আক্রান্ত রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে জার্মান আক্রমণ রুখে দেয় এবং পাল্টা অভিযান শুরু করে। এই যুদ্ধে চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডও প্রবল মনোবল দেখিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে সফল হতে থাকে।

আগেই জেনেছ এ যুদ্ধ তিন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো এতে অংশ নেয়। নৌযুদ্ধ হয়েছিল ব্যাপকভাবে। যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও প্রথম এতে সাবমেরিনের ব্যবহার হয়। দুই পক্ষে বহু জেনারেল, অ্যাডমিরাল, বিমানসেনারা সরাসরি যোগ দিয়েছিল এ যুদ্ধে। এ সময় উভয় পক্ষে যুদ্ধাস্ত্র ও সাঁজোয়া গাড়ির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই সময়ে মানুষের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বেড়েছে অনেকগুণ। ছয় বছরের বিশ্বযুদ্ধে ৬ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মানব ইতিহাসের এই ভয়ানক বিচিত্র ঘটনাবলি নিয়ে অনেক উপন্যাস, গল্প লেখা হয়েছে, নির্মিত হয়েছে স্মরণীয় অনেক চলচ্চিত্র।

এ যুদ্ধ একদিকে মারণাস্ত্রের ক্ষমতা ও সংখ্যা বাড়িয়েছে অন্যদিকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ তৈরি করেছিল। যুদ্ধে ব্যাপক হারে তরুণদের মৃত্যু হওয়ায় বিধ্বস্ত ইউরোপে নারীদের কর্মজগতে প্রবেশের বাস্তবতা তৈরি হয়। এতে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। তবে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় তাদেরকে ঘিরে নতুন দুটি বলয় তৈরি হয়ে পুনরায় বিভাজন ও উত্তেজনা তৈরি করে। একে বলা হয় স্নায়ু যুদ্ধের (cold war) কাল। সরাসরি দু'পক্ষে যুদ্ধ না হলেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অস্ত্রসজ্জা ও উত্তেজনা চলতেই থাকে। বিশ্বের নানা স্থানে সশস্ত্র সংঘাতও কখনও থামে নি।

বিশ্ব বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে তাই বলেছিলেন- যুদ্ধকে জয় করা গেছে, শান্তিকে নয় (The war is won but not peace)

যুদ্ধের শেষে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরপরই জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে যেন নির্বাকও করে তোলে। তবে কেউ কেউ পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন করে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। এই

draft copy

প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার উদ্যোগ নেন। যুদ্ধের মধ্যেই এ ধরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশ্ব উত্তেজনা কমাতে অনেকগুলো শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক চার্টার সনদ (Atlantic Charter)-এ স্বাক্ষর করেন। এ সনদে বিশ্বের সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, বাক স্বাধীনতা, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীদের নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হয়েছিল। এসব আদর্শের উপর ভিত্তি করেই পরে জাতিসংঘ সনদ রচিত হয়। তবে জাতিসংঘ নামটি এসেছে ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছিল , সেই ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে । এ চারটি দেশ এক ঘোষণাপত্রে আটলান্টিক চার্টারে বর্ণিত নীতি ও আদর্শের প্রতি তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন যা"United Nations Declaration" বা জাতিসংঘ ঘোষণা নামে পরিচিত। পরে ২ জানুয়ারি আরো ২২টি রাষ্ট্র এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানায়। জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট হিসেবে মস্কো ঘোষণা, তেহরান সম্মেলন, ডুম্বারটন ওকস সম্মেলন ও ইয়াল্টা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন, যা মস্কো ঘোষণা বা "Moscow Declaration" নামে পরিচিতি । মস্কো ঘোষণায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, এ সংস্থা সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট বড় শান্তিপ্রিয় সব দেশের জন্যে এ সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

draft copy

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তেহরানে বিশ্ব রাজনীতির তিন শীর্ষ নেতা, রুজভেল্ট (যুক্তরাষ্ট্র), স্ট্যালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ও চার্চিল (ব্রিটেন) অপর এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা জানান যে, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগদানের জন্য বিশ্বের সকল ছোট ও বড় দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁরা আরো জানিয়েছিলেন যে, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তাঁদের উদ্যোগ সফল হবে। এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বিশ্বের সকল জাতি যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। যে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার রূপরেখা প্রণীত ও গৃহীত হয় ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের ডুম্বারটন ওকস সম্মেলনে। প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এবং তা চলে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।সম্মেলনে একটি বিশ্ব সংস্থা গঠন ও এর কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে বিশ্বসংস্থার নামকরণ করা হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে বিশ্বসংস্থার চারটি শাখা থাকবে- সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ সভা, ১১ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও একটি সচিবালয়। নিরাপত্তা পরিষদ গঠনে স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য এবং ছ'টি দেশ অস্থায়ী সদস্য

পদ পাবে। অস্থায়ী সদস্যপদ সম্পর্কে বলা হয়েছিল দু'বছর পর পর সাধারণ সভা কর্তৃক এরা নির্বাচিত হবে। ডুম্বারটন ওকস পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টায় একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন রুজভেল্ট,স্ট্যালিন ও চার্চিল। ওই সম্মেলনে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও ফ্রান্সকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত দেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে দ্রুত প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি গঠন করা হবে। ইয়াল্টা শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সনদ রচনা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হন। ২৬ জুন ১১১টি ধারা সম্বলিত সনদটি অনুমোদিত হয়। তাতে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়। তবে সর্বসম্মতভাবে সনদটি স্বাক্ষরিত হয় সে বছর ২৪ অক্টোবর । মোট ৫১টি দেশ মূল সনদে স্বাক্ষর করেছিল। তাই আমরা প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালন করি। সারা বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা 'জাতিসংঘ'-এর সদস্য। বর্তমানে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র। আরো দু'টি দেশ পর্যবেক্ষক দেশের তালিকায় রয়েছে । দেশগুলো হলো ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। জেনেভা, ভিয়েনা ও নাইজেরিয়াতে এর শাখা অফিস রয়েছে।

জাতিসংঘের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

এ বিশ্ব সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । মূলত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমগ্র মানব জাতির জীবনে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ভয়াবহতা অনুভব করেই বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে যখন যেসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল, তাহলো যেকোনো ধরনের যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করা, ছোট ছোট দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আগ্রাসী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা, আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে দেশগুলোকে ধারণা দেওয়া, উপরন্ত ছোট ছোট দেশগুলোর প্রগতি ও উন্নয়ন সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ সনদের ১ নং ধারায় চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা;

২. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা;

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সেই সাথে মানবাধিকার ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা; এবং

৪. উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সকল জাতির ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

জাতিসংঘ সনদের ২নং ধারায় সাতটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১নং ধারায় যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালা গুলো অপরিহার্য । জাতিসংঘ সনদে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রতিটি দেশ এই সাতটি মৌলিক নীতিকে সামনে রেখেই তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করবে। এই সাতটি নীতি হচ্ছে -

draft copy

ক) প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সমতা নীতির উপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত;

খ) প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অধিকারের ব্যাপারে জাতিসংঘ সনদে যে বিধান ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে , তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে;

গ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখবে, সদস্য রাষ্ট্রগুলো অন্য রাষ্ট্রের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এমন কিছু করবে না, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়;

ঘ) প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে;

ঙ) জাতিসংঘ গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমর্থন করবে;

চ) জাতিসংঘ সদস্য নয় এমন দেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে যাতে এই নীতিগুলো অনুসরণ করে জাতিসংঘ সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে;

ছ) জাতিসংঘ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না । কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে জাতিসংঘ ঐদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

জাতিসংঘের অঙ্গ বা শাখাসমূহ

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের ছয়টি শাখা আছে। শাখাগুলো হচ্ছে-

১. সাধারণ পরিষদ (General Assembly)

২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)

৪. অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

৫. আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

৬. সচিবালয় (Secretariat)

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য। তাই আমাদের দেশের সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির কয়েকজন মহাসচিব বেশ ক'বার বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বেশ সুনামের সাথে কাজ করছে। এছাড়াও ১৯৭৯-৮০ সময়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সসদ্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচন তার ভূমিকার স্বীকৃতি এবং বিশ্ববাসীর আস্থার অন্যতম কারণ। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার

draft copy

বিশ্বব্যাপী আমাদের গৌরবের আসনে আসীন করেছে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪২তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।
বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থাসমূহ এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) পর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সহায়তা প্রদান বা সহায়ক ভূমিকা পালন-এ সংস্থা সমূহের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে আলোচনা বা ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুদান সংগ্রহের জন্যে কারিগরি প্রকল্প দলিল/ সমঝোতা দলিল স্বাক্ষর করে থাকে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের নীতিগত বিষয়াদি , সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনাও সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজ জাতিসংঘ বিভাগের আওতাধীন। বাংলাদেশে বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট ৮৬টি প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি মুক্তির আন্দোলন নয়, এটি অন্যায়ভাবে শাসন শোষণের বিরুদ্ধে এবং মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ প্রথমত যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান প্রকাশ করার জন্যে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা চেয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথাণ্টের কাছে। সে সময়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ঢাকাস্থ প্রতিনিধির সাথে দেখাও করেছিলেন তাঁরা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে গণহত্যা সংঘটিত হয় , তা সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য বিশ্বনেতার সাথে সেদিন জাতিসংঘের মহাসচিব উথাণ্ট এই গণহত্যাকে নিন্দা জানিয়ে একে 'মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্র সমূহের সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দলকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ প্লাজায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে আপোস সম্ভাবনার পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেণ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

শরণার্থীদের সহায়তা দান

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল সেটা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক অত্যাচার ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর ছেড়ে প্রতিবেশি দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা ও অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা কোনো রাষ্ট্রের

draft copy

পক্ষে এককভাবে মেটানো সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তার কাজে জাতিসংঘের এই সম্পৃক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কৌশলগত ভাবে লাভবান হয়। পাকিস্তান এবং আরো কিছু দেশ এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বলে চিত্রিত করার যে অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, জাতিসংঘের এ সাহায্যের ফলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানসহ উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন।বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ইউএনএইচসিআর ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে।

আবার, তখন অধিকৃত বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপতা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জন আর কেলির নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিআরও) ত্রাণ তৎপতা শুরু করে। পরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই দায়িত্ব নেন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পদমর্যাদার পল ম্যাক্কি হেনরি। এ সময় মুজিবনগর সরকার অভিযোগ করে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা এ ত্রাণ কার্যক্রমের অপব্যবহার করছে। ১৬ নভেম্বর এ কার্যক্রমকে 'পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত' করে জাতিসংঘ নিজেই এর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এটি ছিল হানাদার বাহিনীর অধিকৃত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর একটি নৈতিক আঘাত।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের যে বৈঠক হয় তাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন সাহায্য দিতে দাতাগোষ্ঠী অস্বীকার করে। 'পূর্ব পাকিস্তান কার্যত সরকারবিহীন রয়েছে'- বিশ্ব ব্যাংকের এ মন্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) আলোচ্যসূচিতেও বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশন ঢাকা (আনরড) নামে পরিচিত। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্যার রবার্ট জ্যাকসনের পরিচালনায় শুরু হয় এই ত্রাণ কাজ। এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তির ফলে আনরডের নাম কিছু দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হল আনরব (UNRB)-এ , যার পুরো নাম বাংলাদেশ জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম। ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী আনরব জরুরি ত্রাণ এবং পুনর্বাসন তৎপরতা শেষ করে তখন এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত জাতিসংঘ পরিচালিত ত্রাণ কাজের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল আনরব-এর ত্রাণ কার্য।

মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর

বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় যখন ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন । উভয় নেতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। তখন জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজসমূহ অপসারণ করা হয়। এছাড়াও ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকা পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

draft copy

জাতিসংঘের যেসব সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে

UNDP, FAO, ILO, UNAIDS, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF,

WFP, WHO- ইত্যাদি।

UNDP- (United Nations Development Programme)- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি সহায়ক সংস্থা। ১৯৬৫ সালের ২২ নভেম্বর এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ইউএনডিপির সহায়তায় সহস্রাব্দ উন্নয়নের (MDG)আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র হার হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অবদানের জন্য জাতিসংঘের এওয়ার্ড লাভ করেন। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

UNICEF (United Nations Chidren's Fund)- জাতিসংঘ শিশু তহবিল। ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অগণিত শিশু অনাথ হয়েছিল। এই শিশুদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল তৈরি করার সিদ্ধান্ত থেকেই এই সংস্থা।

আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ কাজ করছে।

UNESCO-(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর লন্ডন সম্মেলনে ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে এই সংস্থাটি জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

draft copy

ফ্রান্সের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে সংস্থাটির

বাংলাদেশসহ বিশ্বের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো জাতিসংঘের এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

FAO- (Food & Agriculture Organization) জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর সদর দপ্তর ইটালির রোমে।

বাংলাদেশের বিশাল বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে।

WHO-(World Health Organization)- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

UNHCR-(United Nations High Commission for Refugees) উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর। এটি ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দুইবার, ১৯৫৪ এবং ১৯৮১সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার ইস্যুতে এই কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে।

draft copy

বাংলাদেশসহ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর ক্ষেত্রেও বড় অবদান রাখছে এই সংস্থা। এছাড়া বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।

UNIFEM- (United Nations Development Fund for Women) জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম। জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা। বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে ।

নারীদের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ত করছে। নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

UNFPA (United Nations Population Fund)- জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বা ইউএনএফপিএ-এর কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কৌশল এবং প্রোটোকল তৈরি করা, জন্মনিয়ন্ত্রণে সচেতন করা এবং বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ-ভিত্তিক

সহিংসতা বন্ধ, প্রসূতি মাতাদের যত্ন ইত্যাদি।

সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ILO-(International Labour Organization) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংক্ষেপে আইএলও (ILO) নামে পরিচিত। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার , আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য সর্বজনীন ও দীর্ঘমেয়াদি শান্তির জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার-এ লক্ষ্য অর্জনে সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত।

draft copy

মূলত, শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, সচ্ছন্দ জীবনের উপযোগী মজুরি ও স্বাস্থ্যসম্মত মানবিক কর্মপরিবেশের মত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধান ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার প্রতিও এ সংস্থা নজর রাখে। ফলে ILO জাতিসংঘের প্রথম বিশেষ সংস্থা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

উপরোক্ত সংস্থাগুলো ছাড়াও জাতিসংঘের আরো অনেকগুলো উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

এরপরে একদিন ক্লাসে এসে স্যার বললেন, খেয়াল করেছ বিশ্ব প্রেক্ষাপট থেকে আমরা কিন্তু বারবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এসেছি। চলো আমরা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শান্তি, নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্যে যেভাবে কাজ হয় তার মতই স্থানীয় পর্যায়ের কাজ সম্পর্কেও জানব।

শিক্ষার্থীরা সবাই সোৎসাহে লাফিয়ে উঠে তাঁকে সমর্থন জানাল। তখন স্যার এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিতভাবে জানালেন।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা ‘সক্রিয় নাগরিক ক্লাব’ গঠন করেছিলাম । তখন ক্লাবের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্যার কয়েকজনকে ডেকে আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব দিলেন। নির্বাচনের পর সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্যদের দায়িত্ব বণ্টন করে স্যার নিজে তাদের কাজের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব নিলেন। আমরা সকলেই জানি প্রতি দু’বছর পর পর আমাদের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন হয়। এতে একজন সভাপতি ও কয়েকজন অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় পদাধিকার বলে সদস্য সচিব এবং দুই বা ততোধিক শিক্ষক প্রতিনিধি শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত হন। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি যেমন স্কুলে পড়ালেখার মান উন্নয়ন এবং স্কুলের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করেন, সব সময় খোঁজ খবর নেন তেমনি আমাদের এলাকার উন্নয়ন, সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সিটি কর্পোরেশন/পৌর সভা/ ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। আমরা একজন কাউন্সিলর/ পৌর মেয়র/ ইউপি চেয়ারম্যান বা মেম্বারের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার পরিচালনার কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবো।

সিটি কর্পোরেশন এলাকার একটা স্কুলের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ৫/৬ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। আসিরের নেতৃত্বে একটি দল এলাকার কাউন্সিলর সাহেবের কাছে গেলো ।

তাঁর সাথে শুভেচ্ছে বিনিময়ের পর সানা জানতে চাইলো স্থানীয় সরকার কী?

দেশের প্রান্তিক স্তরের বা তৃণমূল পর্যায়ের শাসন ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে। এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে এ সরকার গঠিত

draft copy

হয়। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের যথাযথভাবে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে।

আমাদের দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশাসনের বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নেই । তবে জেলা পর্যায়ে রয়েছে জেলা পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা পরিষদ এবং গ্রাম পর্যায়ে সাধারণত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। এছাড়াও ছোট ছোট শহর এলাকায় পৌর সভা (যেমন-নাঙ্গাল কোট, হাটহাজারি, লামা, কুতুবদিয়া ইত্যাদি) এবং বড় বড় শহরগুলোতে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি)। এগুলো স্থানীয় সরকারের অংশ। আমরা জানি বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থানীয় সরকার পরিষদও রয়েছে ।

শোভন জানতে চাইল স্থানীয় সরকার পরিষদের কাঠামো তাহলে আমরা কীভাবে ভাবতে পারি?

কাউন্সিলর সাহেব একটা কাঠামো তাদের দেখালেন। স্থানীয় সরকার পরিচালনার কাঠামোটি নিম্নরূপ-

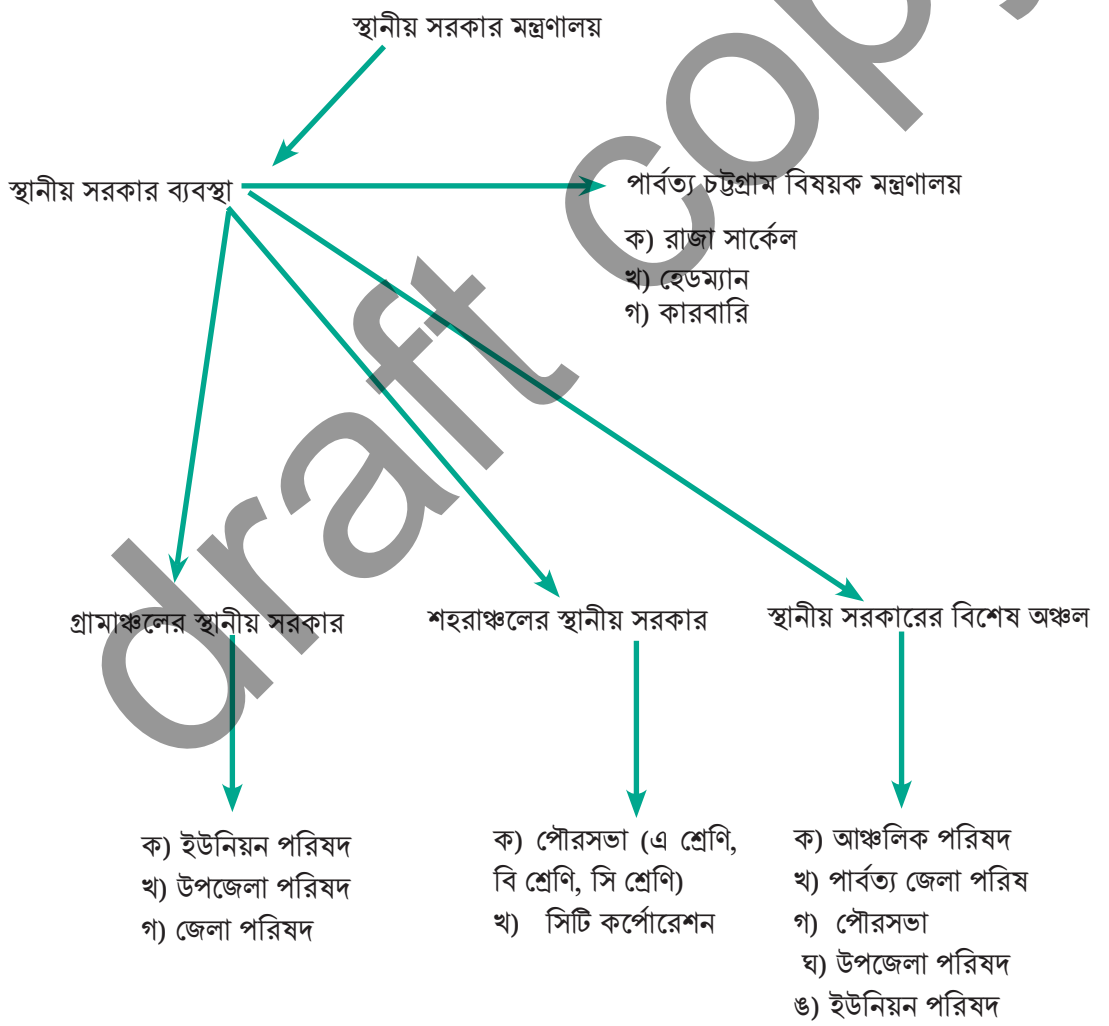

draft copy

আমরা জানি, আমাদের এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি আয়তনে বেশি বড় না হলেও লোক সংখ্যা অনেক বেশি। তাই কেন্দ্রে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অঞ্চলের ছোট-বড় বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। তা বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে দুটো লাভ ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমে এবং খ) স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলোরও সুষ্ঠু সমাধান হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দিন দিন স্থানীয় সরকার কাঠামো জনগণের কাছে পরিচিত ও বিকশিত হয়ে উঠছে। উপরের ছকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেশে গ্রাম পর্যায়ে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই। এখানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে জেলা পরিষদ। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা পরিষদ। শহর পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের ১. পৌরসভা ও ২. সিটি কর্পোরেশন । পৌরসভাগুলো ছোট-বড় শহরগুলোতে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করে। দেশে মোট ৩২৮টি পৌরসভা রয়েছে। তন্মধ্যে 'ক' শ্রেণির পৌরসভা ১৯৭টি, 'খ' শ্রেণির পৌরসভা ৯৮টি এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভা ৩৩টি । দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে এবং কুমিল্লা, নারায়ণ গঞ্জ ও গাজীপুরের মতো বড় বড় শহরগুলোতে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

স্থানীয় সরকারের গঠন

জনগণই নেতা নির্বাচনের অন্যতম উৎস। কারণ নেতা নির্বাচিত হন জনগণের সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। স্থানীয় সরকারের সকল কাঠামোর নেতৃত্ব গঠনে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকে । ব্যতিক্রম জেলা পরিষদ নির্বাচন। স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের (ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জেলা পরিষদ) মেয়াদকাল পাঁচ বছর। এখন আমরা স্থানীয় সরকার কাঠামোর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

স্থানীয় সরকারের কাজ

স্থানীয় সরকার তৃণমূলের উন্নয়ন সংস্থা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা। এটি তাত্ত্বিক অর্থে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে।

ক) ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো: আমরা প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে জানবো। এটি আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান । ব্রিটিশপূর্ব আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি কাজ করছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ১৮৭০ প্রবর্তিত হয়। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৫ সালে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাস হয়। এই আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা বোর্ড ও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের পল্লী আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটি মাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধিত আইনের মাধ্যমে

draft copy

ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

আমরা জানি, ইউনিয়ন পরিষদ হলো স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর বা প্রাথমিক স্তর। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে চার হাজার পাঁচ শত একাত্তরটি ইউনিয়ন পরিষদ আছে । গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামের মানুষের সেবা প্রদান এবং গ্রামীণ সমস্যার সমাধান ও তৃণমূলের মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোতে রয়েছে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য (মেম্বার) এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য (মেম্বার) ।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে। এরমধ্যে কিছু মুখ্য কাজ ও কিছু ঐচ্ছিক কাজ রয়েছে। যেমনঃ

ক) শৃঙ্খলা রক্ষা: ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কাজ হলো গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য

- প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু সংখ্যক চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করা;
- বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরসনে ভূমিকা পালন;
- গ্রাম আদালত সম্পর্কিত দায়িত্ব সম্পাদন;
- পারিবারিক বিরোধের আপোস-মীমাংসা;

খ) কাজ ও সেবা: এক কথায় এ সংস্থার মূল কাজ হল সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে ইউনিয়নে অবস্থিত কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ও শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার সেবা ও কার্যক্রম জনগণকে অবহিতকরণ। এর প্রধান কাজগুলো হল-

- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্থার কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন ;
- স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন;
- আত্ম-কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কাজ তো রয়েছেই।

গ) **অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন:** এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন-

draft copy

- গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন;
- বাজার সৃষ্টি;
- মৎস্যচাষ ও পশু পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- উন্নত বীজ, চারা ও সার বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জনগণের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ।

এ ছাড়া রয়েছে ঐচ্ছিক কাজ:

- এলাকার রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ;
- এতিম, দুস্থ, গরিব ও বিধবাদের সাহায্য করা;
- প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা;
- সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত ও তদারকি করা;
- এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ করা;
- ইউনিয়নকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
- দুস্থ ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন;
- সকল প্রকার শুমারি পরিচালনার দায়িত্ব পালন;
- সরকারি সম্পত্তি যেমন- সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলো সহজলভ্য ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান;
- বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানদান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- এলাকার মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ;

draft copy

- এলাকার জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা এবং খাজনা প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- এলাকায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা অপরাধ সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- ইভ টিজিং, যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- এলাকার শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সভা-সমাবেশের আয়োজন;
- প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা চর্চার উদ্দেশ্যে পাঠাগার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- রোগব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জনগণকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- বর্ষার মৌসুমে গাছের চারা লাগানোর জন্য স্কুলের শিক্ষার্থী ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ:

ইউনিয়ন পরিষদের দশটি উল্লেখযোগ্য কাজ জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখে উপস্থাপন কর।

খ) উপজেলা পরিষদের কাঠামো: ১৯৮৩ সালে প্রথম উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল উপজেলা পরিষদ। কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা গঠিত হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাটি নানা কারণে স্থায়ীরূপ লাভ করেনি। তাই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকল্পে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাস হয়। এ আইন 'উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯' নামে পরিচিত। স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্তদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবেঃ

- একজন চেয়ারম্যান;
- একজন ভাইস চেয়ারম্যান;
- একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান;
- উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;
- পৌরসভার মেয়র এবং সকল মহিলা সদস্যদের এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশে ৬৪ জেলায় মোট উপজেলা পরিষদের সংখ্যা ৪৯৫ টি।

draft copy

উপজেলা পরিষদের কাজ -

- উপজেলা পরিষদ পাঁচশালাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে;
- সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও তার সমন্বয় সাধন করে;
- বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বলা বাহুল্য এ সকল কাজের সফলতা নির্ভর করবে উপজেলার জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

গ) জেলা পরিষদ গঠন কাঠামো: কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' প্রবর্তন করে। আমাদের দেশে ৬৪টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৬১টি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-এই তিনটি জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যমান আইনে জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, ১৫জন সাধারণ সদস্য এবং পাঁচজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থাকেন । জেলা পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

জেলা পরিষদের কাজ

জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করাই জেলা পরিষদের কাজ। জেলা পরিষদের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. প্রধান কাজ ২. ঐচ্ছিক কাজ।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান কাজ হলো-

- জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ তদারকি,
- উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ব্যক্তির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা ও সহযোগিতা করা;
- উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট নির্মাণ;
- সেতু, কালভার্ট নির্মাণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ;
- বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- অনাথ আশ্রম নির্মাণ;
- গ্রন্থাগার তৈরি ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা;
- কৃষি খামার স্থাপন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা;

draft copy

- এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ ;
- উপজেলা ও পৌরসভাগুলোকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান;
- বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
- যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজও জেলা পরিষদ করে থাকে।

২. ঐচ্ছিক কাজ:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জনসাধারণের জন্য খেলাধুলা আয়োজন ও উন্নয়ন;
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;
- জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন;
- শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ;
- গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা;
- বিধবা সদন, এতিমখানা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- সামাজিক অনাচার যেমন- মাদক সেবন, জুয়া, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি প্রতিরোধ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- সালিশী ও আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন;
- উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটানো;
- আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সংরক্ষণ;
- উন্নত চাষ পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পতিত জমি চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বাঁধ নির্মাণ ও প্রয়োজনে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেচের পানি সরবরাহ,সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

draft copy

- জেলার বনভূমি সংরক্ষণ;
- গ্রামাঞ্চলের শিল্প-কারখানাগুলো সচল রাখার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা;
- গ্রামাঞ্চলের শিল্প-কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা;
- উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;
- ধর্মীয় উপসনালয়, যেমন- মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও গির্জার উন্নয়ন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চার প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য জেলা পরিষদ কাজ করে।

অনুশীলনী কাজ:

জেলা পরিষদের কাজের একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে বা নিজ নিজ খাতায় লিখে উপস্থাপন কর।

ঘ) পৌরসভা গঠন : শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা পরিচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর এলাকায় একটি করে পৌরসভা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩৩০টি পৌরসভা আছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন মেয়র নির্বাচিত হন। প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। শহর বা পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।

পৌরসভার কাজ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য হোস্টেল নির্মাণ;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান;
- বিনামূল্যে বই বিতরণ;
- বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- বিধি মোতাবেক ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, রাস্তা-ঘাটের নামকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

draft copy

- দ্রুতগতির যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;
- রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো, পার্ক উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন;
- ত্রাণ ও পুর্নবাসন;
- এতিম ও দুঃস্থদের জন্য এতিমখানা পরিচালনা;
- লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন ;
- ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ;
- খেলাধূলার ব্যবস্থা;
- মিলনায়তন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;
- জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন;
- মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ;
- চিকিৎসা কেন্দ্র গঠন এবং সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- দুর্যোগকালে জনগণকে সচেতন করা ইত্যাদি পৌরসভার কাজ।

অনুশীলনী কাজ:

তোমার এলাকায় পৌর সভা/ ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কী কী কাজ করে নিচের ছকে তা লিখে দেখাও।

ছক

শিক্ষা বিস্তার	
স্বাস্থ্য সচেতনতা	

ঙ) সিটি কর্পোরেশন গঠন: বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। ঢাকা উত্তর,ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,খুলনা,বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ , কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ- এই প্রতিটি জেলা শহরে আছে একটি করে সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র। মেয়রের কাজে সহযোগিতা করেন কাউন্সিলররা। সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলর সংখ্যা কম বেশি হতে পারে। সিটি কর্পোরেশন যেসব কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে-

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা;

draft copy

- কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা;
- জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- নিয়মানুযায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- সড়ক নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;
- রাতের বেলায় সড়কে আলো নিশ্চিত করা;
- রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগানো, পার্ক উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা;
- ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ করা;
- বিশেষ সময়ের বাজার ব্যবস্থাপনা যেমন- ঈদুল আযহা'র সময় গরুর বাজার ব্যবস্থাপনা;
- সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা;
- জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- খেলাধুলার আয়োজন করা;
- সমাজকল্যাণমূলক কাজ;
- আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, যেমন- সেলাই শেখানো, গাড়ি চালানো শেখানো, ডেন্টিং-পেইন্টিং, ব্লক-বাটিক-এর কাজ ;
- তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি সিটি কর্পোরেশনের কাজ।

অনুশীলনী কাজ:

পরিবেশ সুরক্ষা, আত্ম-কর্মসংস্থান ও জনহিতকর কী কী কাজ সিটি কর্পোরেশন করে দলীয় ভাবে আলোচনা করে শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

draft copy

ছক

পরিবেশ সুরক্ষা	
আত্ম-কর্মসংস্থান	
জনহিতকর কাজ	

তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ বিভিন্ন সংস্থার কাজে মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। অর্থাৎ একই কাজ একাধিক সংস্থা করে থাকে। আবার কাজে ভিন্নতা থাকলেও এর মধ্যেও মিল রয়েছে। সব কাজের মূল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণ ও সমাজর উপকার এবং জীবনমানের উন্নতি সাধন করা।

স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

৮৫ হাজারেরও অধিক গ্রামের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটি গঠিত। সবুজের বুকে লাল টুকটুকে সূর্যে আঁকা আছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মুখচ্ছবি। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬ হাজার ৯৭৭ বর্গমাইলের আমাদের এই মাতৃভূমি। রাষ্ট্রের আয়তন খুব বড় না হলেও জনসংখ্যা বেশি। কেন্দ্রে বসে এতো বড় দেশের উন্নয়ন পরিচালনা এবং নানা রকম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। তাই সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এ ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ যেমন কমে তেমনি স্থানীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও সহজ হয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

draft copy

মিলেমিশে নিরাপদে বসবাস

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ: সম্ভবনা, ঝুঁকি ও আমাদের করণীয়

আমাদের বাসভুমি এই পৃথিবী নানা সম্পদে ভরপুর। আমরা অবিরাম সেসব সম্পদ ব্যবহার করে চলছি। আবার প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছি অনেক কিছুর। পরিবর্তন কখনও আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে আবার কখনও বা দেখাচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আমাদের এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এবার দেখে নেবো প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে। খুঁজে বের করবো এসকল পরিবর্তনের ফলে যে যে সম্ভবনা সৃষ্টি হচ্ছে তা কীভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনা করা যায়। সেইসাথে যেসব ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে তা মোকাবিলা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা কেমন হবে তাও বুঝে নেব।

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে আমরা নিচের দুটি মানচিত্র খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবো। এরপর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকের মাধ্যমে কোন ধরণের ভূমি পরিবর্তিত হয়ে কোন ধরণের ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা চিহ্নিত করবো। পাশাপাশি এই ধরণের পরিবর্তন আমাদের জন্য কোন কোন সম্ভবনা বা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে সেগুলোও লিখবো।

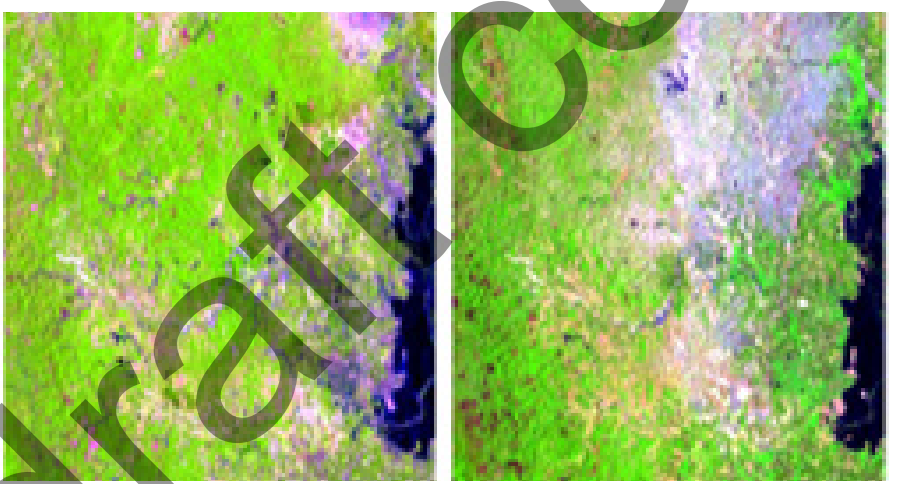

কক্সবাজারের কুতুপালং ও বালুখালির রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ২০১৭ (a, বামে) থেকে ২০১৯ (b, ডানে) সালের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের চিত্র যা রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। সবুজ আচ্ছাদন বা বনভূমি ধূসর রঙের মানববসতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

draft copy

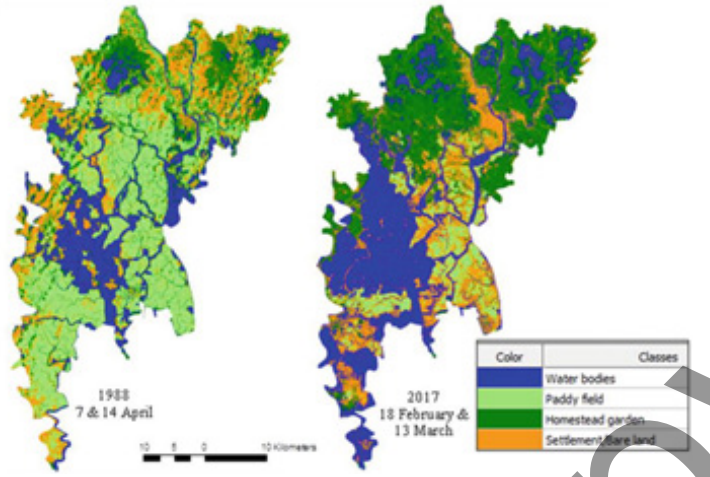

১৯৮৮ (বামে) এবং ২০১৭ (ডানে) সালের খুলনা জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মানচিত্র

ভূমির ধরণ (পূর্বের অবস্থা)	পরিবর্তিত রূপ	সৃষ্ট সম্ভবনা	সৃষ্ট ঝুঁকি

আমার এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ধরণ অনুসন্ধান

- আমরা মানচিত্রের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন দেখলাম। এখন চলো আমাদের এলাকায় ভূমির ব্যবহারে কোন কোন পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি। নিচে দেওয়া প্রশ্নমালা ব্যবহার করে আমাদের এলাকার/ বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধান কাজটি করবো।

draft copy

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

১. এই এলাকায় ২০ বছর আগে যে পরিমাণ কৃষিজমি ছিলো এখন কি তার থেকে কমেছে না বেড়েছে?

২. কৃষিজমির এই পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৩. বিগত ২০ বছরে রাস্তাঘাটের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে?

৪. ২০ বছর আগে আর এখন ঘরবাড়ির পরিমাণ এবং ধরণে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কি ধরণের?

৫. ২০ বছর আগে যে পরিমাণ বনভূমি ছিলো এখন কি তার থেকে বেড়েছে না কমেছে? এই পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৬. এই এলাকায় আগে যেমন পুকুর খাল বিল, নদী ছিলো এখনও কি তেমন আছে? যদি না থাকে তবে এর জন্য আপনি কোন কর্মকান্ড দায়ি বলে মনে করছেন?

- **অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করবো।**

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	পরিবর্তিত রূপ	কারণ	ফলাফল
কৃষিজমি	বসতবাড়ি	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	কৃষিজমির পরিমান কমে যাবে, খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
রাস্তাঘাট			
বসতি			
বনভূমি			
জলাভূমি			

- এরপর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনের জন্য আমরা এলাকার দুটি মানচিত্র তৈরি করবো। এরপর একটি মানচিত্রে ২০ বছর আগের ভূমির ব্যবহারের ধরণ এবং অন্য মানচিত্রে বর্তমান সময়ের ভূমির ব্যবহারের ধরণ বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা রং ব্যবহার করে চিহ্নিত করবো (খুলনা জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মানচিত্রের অনুরুপ হতে পারে যা এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা দেখেছি)। এরপর দৃশ্যমান পরিবর্তন গুলো এই মানচিত্র দুটি ব্যবহার করে উপস্থাপন করবো।

draft copy

শিক্ষাবর্ষ ২০২৩

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্যাটার্ন

আমরা নিজ নিজ এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করেছি। সেখানে দেখেছি অনেকগুলো কারণে ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে এলাকায় যা যা প্রভাব পড়েছে তা যেমন আমাদের জন্য সম্ভবনার সৃষ্টি করেছে তেমনই ঝুঁকিও কম তৈরি করেনি!

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের যা মানব সভ্যতার শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কিভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা জানার পাশাপাশি এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

- আমাদের এলাকায় ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিশ্চয় আমরা দেখেছি কৃষিজমির ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করার কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে ১৭০০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবো। তারপর একটি ছকের সাহায্যে পরিবর্তনের ধরণগুলো চিহ্নিত করবো।

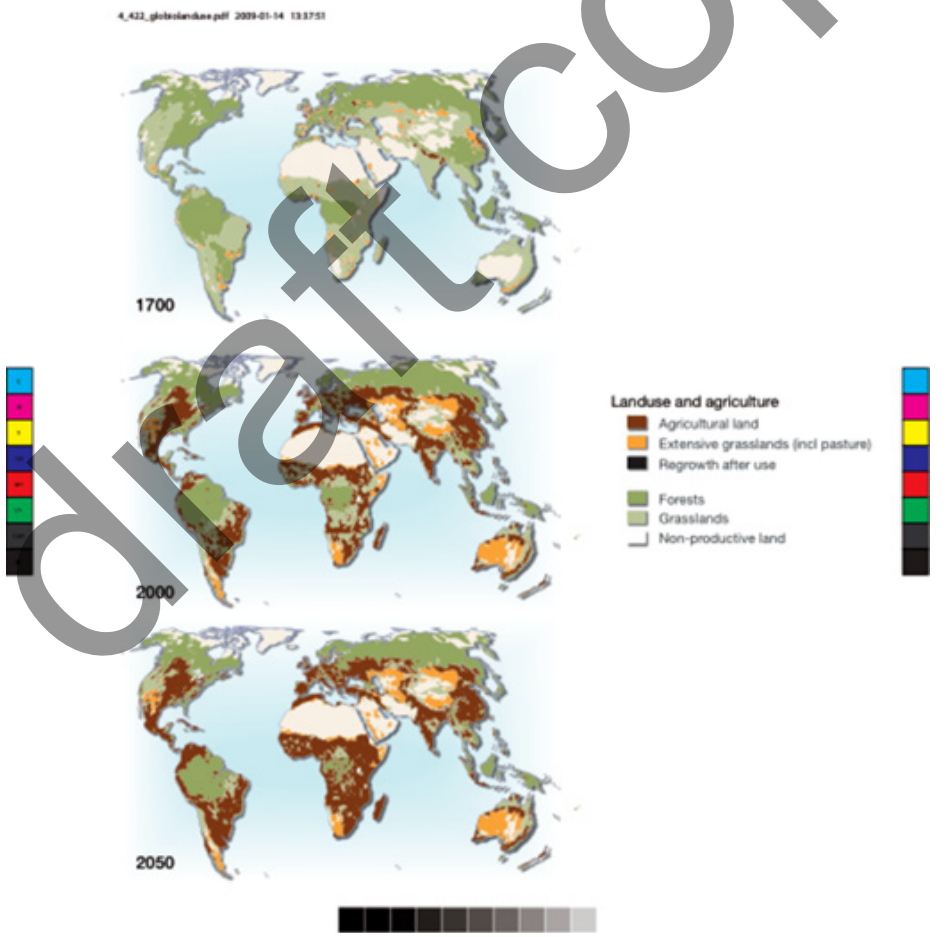

draft copy

১৭০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০৫০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ

- উপরের কাজের মাধ্যমে আমরা দেখলাম কৃষিজমির ব্যবহারে পরিবর্তন বৈশ্বিকভাবে ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষিজমির ব্যবহারের পরিবর্তনই কি ভূমির আচ্ছাদনের বৈশ্বিকভাবে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ? নিশ্চয় না। চলো এখন আমরা অনুসন্ধান করে বের করি ভূমির আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ; এসকল পরিবর্তন হওয়ার কারণ; এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সম্ভবনা এবং এসকল ক্ষেত্রে আমাদের কী কী করণীয় থাকতে পারে যার ফলে এই পরিবর্তন আমাদের জন্য ঝুঁকির কারণ না হয়ে ওঠে।
- এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুসন্ধানী অংশ থেকে নেবো।
- অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত ফলাফল আমরা প্রত্যেকে একটি প্রতিবেদন আকারে জমা দেবো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি জনসংখ্যা সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করতো, তাদের জীবিকার উৎস কি ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূ-খন্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা দেখবো। পরে এই মানচিত্রটি এবং অনুসন্ধানী অংশের সাহায্যে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করবো।

draft copy

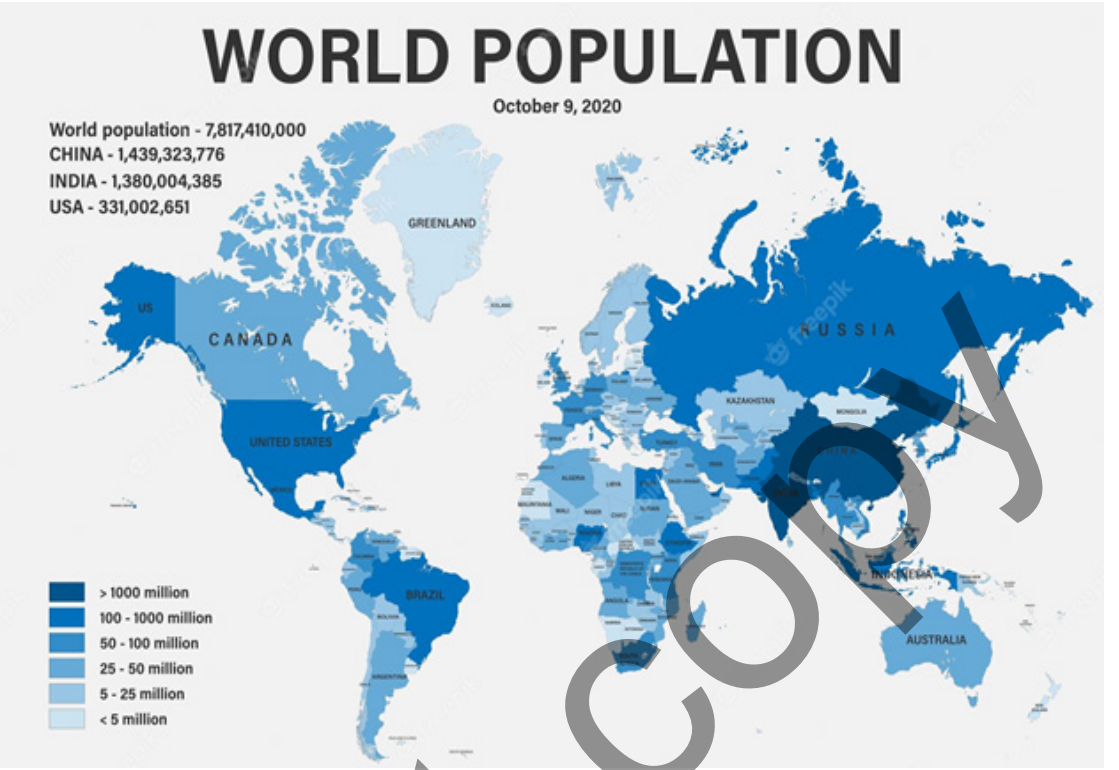

জনসংখ্যার পরিমাণ	দেশের নাম	মহাদেশের নাম	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের স্বরূপ	ফলাফল	ঐ দেশের প্রেক্ষাপটে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে
>১০০০ মিলিয়ন					
১০০-১০০০ মিলিয়ন					
৫০-১০০ মিলিয়ন					
২৫-৫০ মিলিয়ন					
৫-২৫ মিলিয়ন					
<৫ মিলিয়ন					

draft copy

- আমরা তো পৃথিবীর জনসংখ্যার অবস্থা দেখলাম, এবার চলো নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা মজার কাজ করি। কাজটি করার জন্য আমরা ৬-৮ জনের দলে ভাগ হবো। এরপর প্রত্যেক দলের সদস্যদের নারী ও পুরুষভেদে বয়স অনুযায়ী গ্রাফ কাগজে একটি লেখচিত্র অংকন করে উপস্থাপন করব। আমরা যে লেখচিত্রটি অংকন করবো সেটি যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য করা হয় তখন তাকে বলে জনসংখ্যা পিরামিড।

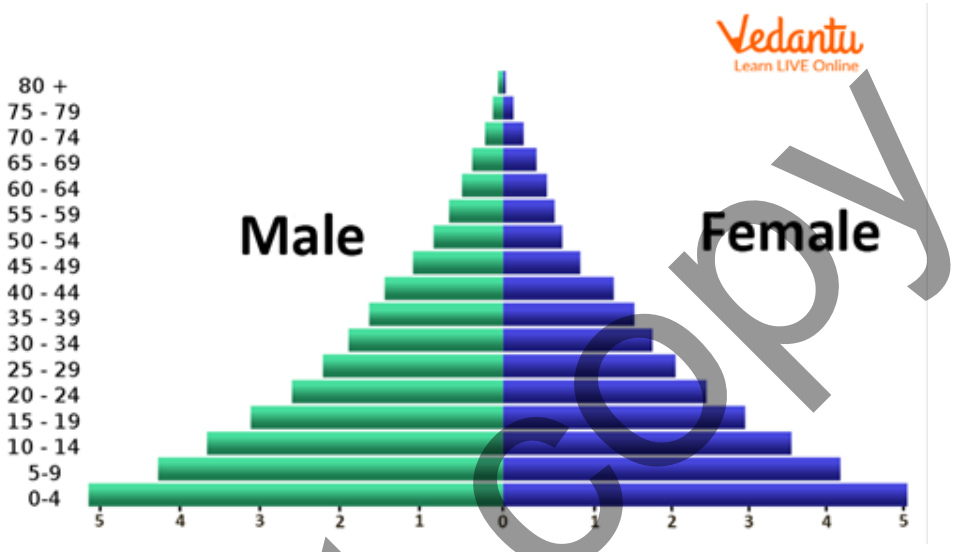

জেনে রাখো

জনসংখ্যা পিরামিড হলো একটি গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা যার মাধ্যমে একটি দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়সের বন্টন প্রদর্শন করা হয়। গ্রাফের কেন্দ্র থেকে বাম দিকে পুরুষ এবং ডান দিকে মহিলা চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যার আকার x-অক্ষে দেখানো হয় এবং y-অক্ষে বয়স দেখানো হয়।

- তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করতে কখনও তথ্য সম্বলিত ছবি আবার কখনও স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে তোলা ছবি ব্যবহার করি। এই যে কোনো জায়গায় সরাসরি না গিয়ে এ ধরণের তথ্য সম্বলিত ছবি বা মানচিত্র ব্যবহার করে সেই জায়গার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় এমন দুইটি প্রযুক্তি নিয়ে এবার আমরা জেনে নেবো।

- তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করতে কখনও তথ্য সম্বলিত ছবি আবার কখনও স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে তোলা ছবি ব্যবহার করি। এই যে কোনো জায়গায় সরাসরি না গিয়ে এ ধরণের তথ্য সম্বলিত ছবি বা মানচিত্র ব্যবহার করে সেই জায়গার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় এমন দুইটি প্রযুক্তি নিয়ে এবার আমরা জেনে নেবো।

draft copy

জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি

বিভিন্ন ধরনের বৈশ্বিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান রুপ হলো ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ক্ষুদ্র এলাকার ভূমি ব্যববহারে ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন খালি চোখে দেখে বোঝা গেলেও বৃহৎ এলাকার পরিবর্তনের সামগ্রিক রুপ একসাথে বোঝা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান যুগে এ ধরনের বৃহৎ এলাকার এবং দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন বুঝতে আমরা আধুনিক রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি।

Remote Sensing এর অর্থ দূর অনুধাবন। রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তিতে আমরা মূলত কোন স্যাটেলাইট বা উড়োজাহাজ বা ড্রোন ব্যবহার করে পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংবলিত ছবি সংগ্রহ করি। যা পরবর্তীতে কম্পিউটারে নানা প্ররযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করি। আবার বর্তমান বিশ্বে নানাবিধ তথ্য সমৃদ্ধ মানচিত্রের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যেকোন স্থানের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, বিদ্যমান সম্পদ, ঝুঁকি, দুযোর্গ সহ নানা তথ্য স্থানিক পরিসরে কিভাবে বিন্যস্ত আছে তা মানচিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে তথ্যবহুল উপায়ে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা যায়। আর এক্ষেত্রে জিআইএস (Geographical Information System) এর মতো কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে। এ অংশে আমরা রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তির কাজ করার পদ্ধতি, অগ্রগতি, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

Remote Sensing বা দূর অনুধাবন

কোন বস্তুর কাছে না গিয়ে বরং দূর থেকে সেই বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কৌশলকে বলা হয় রিমোট সেন্সিং। ১৯৬০ সালে রিমোট সেন্সিং শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্টানের কর্মকর্তা Evelyn L. Pruitt। তার আগে আকাশ থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে এ ধরনের কাজ করা হতো যার নাম ছিল 'আকাশধৃত মানচিত্র' বা Aerial Photograph। রিমোট সেন্সিং মূলত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠ, সমুদ্র বা বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও সেসব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাকে বোঝায়। যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে সেন্সর বা অনুধাবক বলা হয়। অনুধাবকগুলো দু'ধরনের হয়, যথা: সক্রিয় (Active) (নিজস্ব শক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করে, ফলে রাত দিন সব সময় কাজ করতে পারে) এবং অক্রিয় (Passive) অনুধাবক (সূর্যালোক ব্যবহার করে বলে রাতের বেলায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনা)। আর এসব অনুধাবককে যেখানে স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে প্লাটফর্ম বা মাচা বলা হয়। প্লাটফর্ম হয় তিন ধরনের, যথা: ভূমিস্থ প্লাটফর্ম (Ground-based platform), আকাশস্থ প্লাটফর্ম (Airborne platform) এবং মহাকাশস্থ প্লাটফর্ম (Space-borne platform)।

রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির উন্নয়নকে আটটি গুরুত্বপূর্ণ যুগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

১। বায়ুবাহিত রিমোট সেন্সিং: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বায়ুবাহিত রিমোট সেন্সিং এর বিকাশ ঘটে। সে সময় রিমোট সেন্সিং মূলত জরিপ কাজ, মানচিত্র তৈরি, গোয়েন্দা ও সামরিক কাজে ব্যবহার হতো।

২। আংশিক মহাকাশজাত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং: এটির শুরু হয় ১৯৫০ সালের দিকে। এ সময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে স্পুটনিক-১ ও এক্সপ্লোরার-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে।

draft copy

৩। স্যাটেলাইটকে গোয়েন্দা কাজে ব্যবহারের যুগ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ বা cold war এর সময়ে (১৯৪৭ থেকে ১৯৯১) সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য spy satellites বা গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়। Corona সে সময়ের একটি গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহের নাম।

৪। আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারের যুগ: এ সময়ে মূলত রিমোট সেন্সিং এর বাস্তবিক প্রয়োগ শুরু হয় আবহাওয়া বার্তা সংগ্রহের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করার মাধ্যমে।

৫। ১৯৭২ সালে ল্যান্ডস্যাট-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি নতুন যুগে প্রবেশ করে। মাল্টি স্পেক্ট্রাল স্ক্যানার সেন্সর এবং থিমেটিক ম্যাপার প্রযুক্তি সংযুক্ত থাকায় ল্যান্ডসেট পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধান ও পরিবেশগত গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

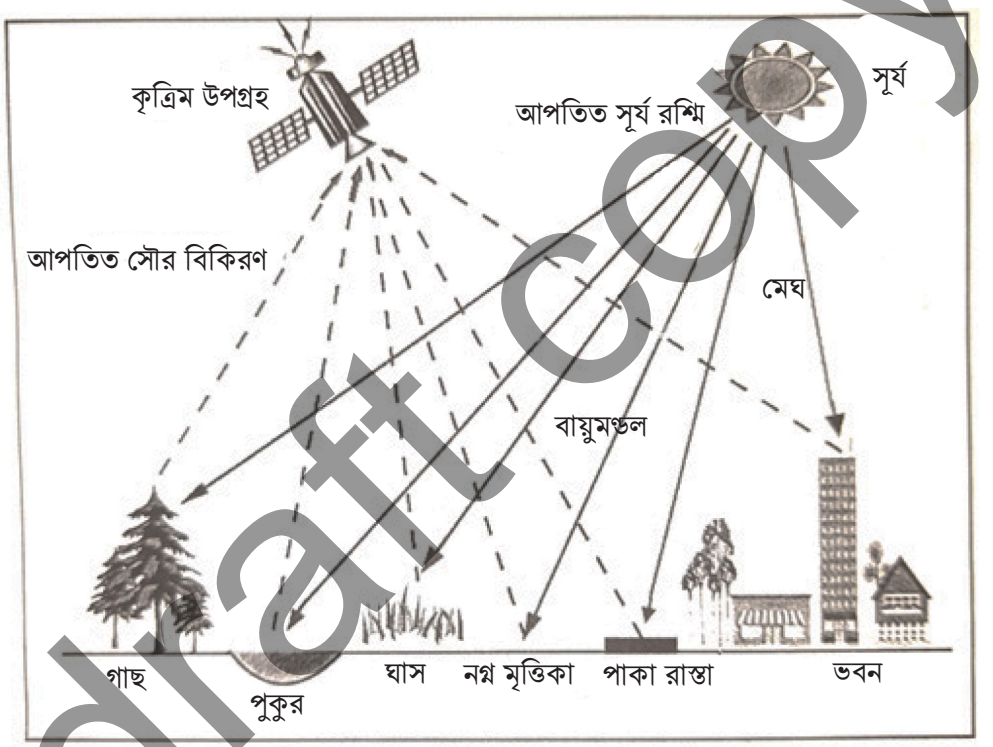

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তিতে তথ্য সংগ্রহের ধারণা চিত্র

৬। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ: ১৯৯৯ সালে Terra নামক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির এক উন্নত যুগের সুচনা হয়।

৭। নতুন সহস্রাব্দের যুগ: এসময়ে মূলত কৃত্রিম উপগ্রহের প্রযুক্তিতে অনেক বেশি অগ্রগতি হয় এবং এর মাধ্যমে উপগ্রহের পাঠানো ছবির গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়। যার ফলে কম অর্থ ব্যয় করে ভালো মানের ছবি পাওয়ার পথ সুগম হয়।

৮। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কৃত্রিম উপগ্রহের মালিকানা, যা আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অধীনে ছিল, তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আসতে শুরু করে। এসময়ে কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ইমেজের রেজুলেশনে অনেক উন্নতি ঘটে। Google

draft copy

Earth এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষও এখন কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারছে। ২০১৮ সালের ১১ মে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামক ভূস্থিত যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে বিশ্বের ৫৭ তম নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় নাম লেখায়। এটি তৈরি করেছিল ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস নামক প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। টিভি সম্প্রচার, দূর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোবাইল যোগাযোগ সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে।

বিশ্বজুড়ে রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবন প্রযুক্তি নানাবিধ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। পূর্বে এর ব্যবহার তাত্ত্বিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে রিমোট সেন্সিং বা স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

১। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পূর্বাভাস প্রদান

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৩। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পূর্বাভাস এর জন্য তথ্য সংগ্রহ

৪। ভূমি ব্যবহারের ধরণ উদঘাটন ও এর পরিকল্পনা

৫। বন্যাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র তৈরি ও ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ নিরুপণ

৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

৭। কৃষি ক্ষেত্রে ফসল তোলা, সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পরিকল্পনা

৮। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত মানচিত্র প্রণয়ন

৯। বনভূমি আচ্ছাদনের পরিমাণ, ধরণ ও ঘনত্ব পরিমাপ

১০। নগর পরিকল্পনা

১১। উপকূলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন

১২। সমুদ্রের সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা

এসবের বাইরেও ভূমির ক্ষয়, খরা পর্যবেক্ষণের মতো আরো অসংখ্য কাজ রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যায় এবং দিন দিন এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো যেখানে মানুষের যাওয়া কষ্টকর সেখানকার তথ্য সংগ্রহ, এক সঙ্গে বিশাল এলাকার তথ্য সংগ্রহ এবং কম অর্থ ব্যয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহ । তাই এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন আমাদের জন্য জরুরি।

Geographical Information System বা জিআইএস

আমরা আগেই জেনেছি যে জিআইএস হলো এমন এক প্রযুক্তি বা কম্পিউটার পদ্ধতি যা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংস্করণ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। জিআইএস এর মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো স্থানিক তথ্য এবং অস্থানিক তথ্য। জিআইএস এর বিখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান

draft copy

ESRI (Environmental System Research Institute) জিআইএসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে যে, 'An organized collection of computer hardware, software, geographic data and personnel designed to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze and display all forms of geographically referenced information'. অর্থাৎ কম্পিউটার হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি দক্ষতা একসাথে কাজ করে যখন তা কোন ভৌগোলিক স্থানের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ, সংস্করণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে পারে তখন সে প্রক্রিয়াকে জিআইএস বলে। ডেটাবেইজের ধারণা, কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়ন, রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির অগ্রগতি, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতিক জ্ঞান জিআইএস এর উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সের ভূগোলবিদ Charles Picquet প্রথম কলেরা মহামারীর স্থানিক বিশ্লেষণ করে জিআইএস এর ব্যবহার দেখান। ১৮৫৪ সালে Dr. John Snow লন্ডন শহরের কলেরার স্থানিক বিস্তৃতির সাথে পানির উৎসের সম্পর্ক দেখান এবং সেখান থেকেই আজকের জিআইএস এর যাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯৬৪ সালে Canadian Geographic Information System প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক জিআইএস এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। সত্তরের দশকে মাঝামাঝিতে Arc/Info নামে সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে ESRI জিআইএস এর বাণিজ্যিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। বর্তমানে দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটারের মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন সফটওয়ার ও তথ্যের সহজলভ্যতা এবং রিমোটসেন্সিং ডাটা পাওয়া সহজ হওয়ায় জিআইএস এর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

জিআইএস পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য যে সকল জিনিস প্রয়োজন হয় তাদেরকে জিআইএস এর উপাদান বলে। জিআইএস এর উপাদান পাঁচটি। যথা:

১। কম্পিউটারে জিআইএস সম্পর্কিত কাজ করতে পারে এমন দক্ষ মানুষ

draft copy

২। উপাত্ত:স্থানিক ও অস্থানিক তথ্য

৩। হার্ডওয়ার: সিপিইউ, মনিটর, কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, জিআইএস ডাটা লগার ইত্যাদি

৪। সফট্ওয়ার: কম্পিউটারে বিদ্যমান সাধারণ সফট্ওয়ারের সাথে জিআইএস এর কাজ করার জন্য বিশেষায়িত সফট্ওয়ার, যেমন-ArcView, ArcGIS, GRASS, ERDAS Imagine ইত্যাদি

৫। কার্যপ্রণালী: উপাত্ত সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য অনুসরণ করা পদ্ধতি।

সভ্যতার অগ্রগতি ও পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জীববৈচিত্র রক্ষা, সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন সেখানে জিআইএস এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় করে ১৯৮৮ সালে Cowen জিআইএস এর দৃষ্টিভঙ্গিকে (approach) চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা:

১। টুলবক্স দৃষ্টিভঙ্গি

২। ডেটাবেইজ দৃষ্টিভঙ্গি

৩। প্রক্রিয়া ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

৪। প্রয়োগভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান সময়ে জিআইএস এর ব্যবহার অনেক বেশি বিস্তৃত। নগর পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ, প্রকৌশলী, পরিবেশ বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা গবেষক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত লোকজন সবাই জিআইএস এর বাস্তব ভিত্তিক ব্যবহার করছেন। নিচে জিআইএস এর বহুল প্রয়োগ থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১। কৃষিতে

২। বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণে

৩। খনিজ সম্পদ উদঘাটন, উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনায়

৪। স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনায়

৫। গ্রাম, নগর পরিকল্পনায়

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

৭। পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও নৌচালনায়

৮। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে

৯। জরিপ কাজে

draft copy

১০। উপকূল ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনায়

এসবের বাইরেও সেচ, মানচিত্র তৈরি, শহরের পয়:নিষ্কাশনসহ আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে জিআইএস এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আমরা জানলাম প্রকৃতি ও সমাজের যেকোনো ধরণের পরিবর্তন কখনও আমাদের জন্য সম্ভবনা তৈরি করছে আবার কখনও আমাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরিবর্তন ঠেকানো সবসময় আমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই আমাদের সেইসব পদক্ষেপই নেওয়া উচিত যেগুলোর মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন এর ঝুঁকি কমিয়ে সেগুলোকে সম্ভবনায় রূপ দিতে পারি। আর তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন গাছপালা, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, বড় বড় জীব-জানোয়ার, পোকা-মাকড় ইত্যাদির মতই আমরা প্রকৃতির একটি উপাদান মাত্র। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ নিজ প্রজাতির মৃত্যুর হার কমিয়ে আনুপাতিক জনসংখ্যা হু হু করে বাড়িয়ে ফেলেছে। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট নয়। বাঁচার প্রয়োজন ছাড়াও ভালোভাবে বাঁচতে গিয়ে বাঁচার জন্য অনিবার্য নয় এমন বাড়তি অনেক কিছু করে। মানুষের চাহিদার এই চাপ ক্রমবর্ধমান। এর চাপ সামগ্রিকভাবে পড়েছে প্রকৃতিরই ওপর। আমরা বাঁচবো প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির উপাদান হিসেবে, প্রকৃতির অংশ হয়ে।

অধুনা বিজ্ঞানীরা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনার কথা বলছেন। এই গত বছর সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা আট বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। এই বৃদ্ধি চলতে থাকবে এই শতাব্দী জুড়ে, সম্ভবত শতাব্দীর শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা নয় বিলিয়ন ছাড়িয়ে একটা স্থিতি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। তারপর জনসংখ্যা কমতে থাকবে এবং পরবর্তী ১০০ বছরে জনসংখ্যা বর্তমান পর্যায়ে আসবে বা আরো কম হবে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এরই মধ্যে চীন, জাপান ও কোরিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঋণাত্মক। অন্যদিকে কোনো কোনো দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকৃতি রক্ষা করার নানা রকম কার্যক্রম ইতিমধ্যে নেয়া হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশীরা যেন পিছিয়ে না থাকি।

চলো তাহলে আমরা এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি যা আমাদের এলাকার জন্য সম্ভবনা সৃষ্টি করবে। এই কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষন ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবো এবং এসকল কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নেবো।

নমুনা কাজের তালিকা

১. এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন/ ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. ডেঙ্গু মশা নিধনে সচেতনতা মূলক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৩. প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৪.....

৫.....

draft copy

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরাই এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দা। তাই আমরা পৃথিবীর এমন কোনো পরিবর্তন ঘটাবো না যা আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। আমাদের উচিৎ নিজস্ব পরিসরে পরিকল্পিত ও ইতিবাচক পরিবর্তনে সামিল হওয়া। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এ পৃথিবীকে বাঁচাতে। আমরা জানি আমরা তা পারবো।

সবাই মিলে এলাকাকে পরিচ্ছন্ন করছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্যাটার্ন উদঘাটন করে এর ফলে সৃষ্ট সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্যাটার্ন অনুসন্ধান, কারণ ও ফলাফল চিহ্নিতকরণ

তোমরা কি কখনো তোমাদের আশেপাশের পরিবেশে কোন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ? এই যেমন বন উজাড় করে কৃষি জমিতে রুপান্তর বা জলাশয় ভরাট করে কোন অবকাঠামো নির্মাণ অথবা পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট তৈরি? এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটছে বলে নিশ্চয়ই তোমাদের চোখে পড়ে থাকবে। আসলে আমাদের চারপাশের পরিবেশে দৃশ্যমান (যেমন-অবকাঠামো নির্মাণ) ও অদৃশ্য (যেমন-বায়ু দূষণ) দু'ধরনের পরিবর্তনই ঘটে থাকে। এর মধ্যে ভূমির পরিবর্তন একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন। বনভূমি বা পাহাড় কেটে তাকে কৃষি জমি বা বসতভিটায় রুপান্তর অথবা আগে কৃষি জমি থাকলে ব্যবহার পরিবর্তন করে তাতে মানব বসতি গড়ে তোলা ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনেরই উদাহরণ। এ ধরনের পরিবর্তনের কিছু বাস্তব নমুনা আমরা অনুশীলনী অংশেও দেখতে পেয়েছি। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কিভাবে

draft copy

কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি এবং এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

ভূমির পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন মানুষ ও তার অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমির পরিবর্তনকে দুটি উপায়ে বর্ণনা করা যায়, যথা- ভূমি আচ্ছাদন (Land cover) ও ভূমি ব্যবহারে (Land use) পরিবর্তন। আপাত দৃষ্টিতে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন বলতে সময়ের আবর্তে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন বোঝালেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভূমি আচ্ছাদন বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও এর সংলগ্ন অংশে জুড়ে থাকা বিভিন্ন উপাদান যেমন- বিভিন্ন জীব, মৃত্তিকা, ভূমিরুপ, ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানি এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহকে বোঝায়। অন্যদিকে মানুষ যে সব উদ্দেশ্যে এসব উপাদানের নানাবিধ ব্যবহার করে তাকে ভূমির ব্যবহার বলে। ভূ-পৃষ্ঠের বায়োফিজিক্যাল উপাদান সমূহের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর যা যা করা হয় তার সবই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

বায়োফিজিক্যাল উপাদান বলতে পরিবেশের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী) এবং জড় (মাটি,পানি) উপাদানসমূহকে বোঝায়। বায়োফিজিক্যাল উপাদানের চারটি অংশ, যথা-বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং জীবমন্ডল।

পৃথিবীতে ভূমির রুপান্তরের ক্ষেত্রে কৃষিকাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন এবং পশু চারণ ভুমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিজমির বড় অংশ মূলত বন, তৃণভূমি এবং জলাভূমি ধ্বংস করেই আমরা পেয়েছি। এগুলো পূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস্থল এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদানের যোগান দিয়ে আসছিল। মোটাদাগে বলতে গেলে পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেক ইতিমধ্যে মানুষ ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে কৃষি জমিতে রুপান্তরের যে প্রক্রিয়া তা বিগত ৩০০ বছরে আরো বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে। ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহারের পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে আমরা মূলত মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কত বেশি নির্ভরশীল তা বুঝতে পারি। বেশ কিছু পরিবেশবিজ্ঞানী তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীজুড়ে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে যে খাদ্য উৎপাদন করে তার শতকরা ২০-৪০ ভাগ মানুষ ভোগ করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কত বেশি নির্ভরশীল। তবে সারাবিশ্বে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরণ একরকম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরণ বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জীবযাপনের ধরণ ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল।

প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের তারতম্য বা ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব বোঝাতে Ecological Footprint বা পরিবেশগত-ছাপ ধারণাটি বেশ প্রচলিত। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বলতে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিতে এবং তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য শোষণ করতে যে পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তাকে বোঝানো হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন বাংলাদেশির ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো ০.৫ হেক্টর ভূমি যেখানে একজন ইতালিয়ান বা আমেরিকানের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো যথাক্রমে ৩.৩ হেক্টর ও ৯.৬ হেক্টর ভূমি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি একজন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান ও সৃষ্ট বর্জ্য শোষণের জন্য যে পরিমাণ ভূমি ব্যবহার হয়, একজন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান

draft copy

নাগরিকের জন্য এর চেয়ে যথাক্রমে ৭ গুণ ও ১৯ গুণ বেশি ভূমি ব্যবহার হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমির তুলনায় জন ঘনত্ব বেশি হওয়ায় প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে ভূমির উপর চাপ অনেক বেশি যার প্রভাব ভূ-আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনেও দেখা যায়।

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের অর্থ্যাৎ এটি মানব সভ্যতা শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত নিকট-প্রাচ্যের (তুরস্ক, জর্ডান, সাইপ্রাস, মিশর, ইরাক, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্য) দেশসমূহের ভূ-ভাগে মানুষের সৃষ্ট পরিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়। প্রাকৃতিক বনভূমি কমে যাওয়ায় দক্ষিণ জর্ডানের আইন গাজাল ও এর আশেপাশের অঞ্চলসমূহকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের দিকে বসবাসের জন্য পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের এক প্রাচীন উদাহরণ। মেক্সিকোর ইউকেটান উপ-দ্বীপে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

সেখানে প্রাচীনকালে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের নমুনা রয়েছে। প্রাচীনকালের ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্য আমাদেরকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। আর বর্তমান সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে আমরা আকাশধৃত মানচিত্র বা ভূ-উপগ্রহের পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ধরণ জানতে পারি। আকাশধৃত মানচিত্র বা ভূ-উপগ্রহের পাঠানো ছবির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াকে রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি বলা হয়। রিমোটসেন্সিং (Remote Sensing) ও জিআইএস (Geographical Information System-GIS) প্রযুক্তির ব্যবহার করে আকাশধৃত মানচিত্র বা ভূ-উপগ্রহের পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে তার থেকে মানচিত্র তৈরি করে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের স্থানিক ও কালিক পরিবর্তন তুলে ধরা যায়। রিমোটসেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমরা অনুশীলনী অংশে বিস্তারিত জানতে পারবে।

সারা বিশ্বের পরিবেশগত যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি তার অন্যতম চালিকা শক্তি হল ভূমি আচ্ছাদন ওব্যবহারে পরিবর্তন। ক্রান্তীয় বনভূমি ধ্বংস সহ সারা পৃথিবী জুড়েই যে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন হচ্ছে তা সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য বিজ্ঞানীরা গত দুই দশকে অনেক কাজ করেছেন। আমরা এ অংশে সারা বিশ্বের ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রধান ধরণ যেমন বনভূমি বিনষ্ট ও উজাড়, শস্য আবাদ ও চারণ ভূমির পরিবর্তন, নগরায়ণ এবং শুষ্কভূমির পরিবর্তন গুলোর স্থানিক বিন্যাস ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

বনভূমি ও বন আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরণ

বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে বন উজাড় পৃথিবীর ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১২.৫ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। আর প্রতি বছর বনায়ন হয়েছে মাত্র ৩.১ মিলিয়ন হেক্টর হারে। যার অর্থ, বিশ্বে প্রতি বছর ৯.৪ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি বিলীন হয়েছে। বন উজাড়ের বড় অংশ সংঘটিত হয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে। আর প্রাকৃতিক বনের যেটুকু বিকাশ হয়েছে তা মূলত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে। ১৯৯০-১৯৯৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে (প্রতি বছর শতকরা ০.৭১ হেক্টর হারে) বেশি বনভূমি কৃষি বা অন্যান্য ব্যবহারে রুপান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মধ্য সুমাত্রায়। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমারে উল্লেখযোগ্য হারে বনভূমি

draft copy

বিনাশ করা হয়েছে।

আফ্রিকায় বনভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাদাগাস্কার, আইভরিকোস্ট ও কঙ্গো অববাহিকায় ব্যাপক পরিমাণে বন উজাড় করা হয়েছে। সাইবেরিয়া এবং রাশিয়াতেও দাবানলের মাধ্যমে ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। আমাজান বনের ব্রাজিল অংশে রাস্তা নির্মাণ ও সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে।

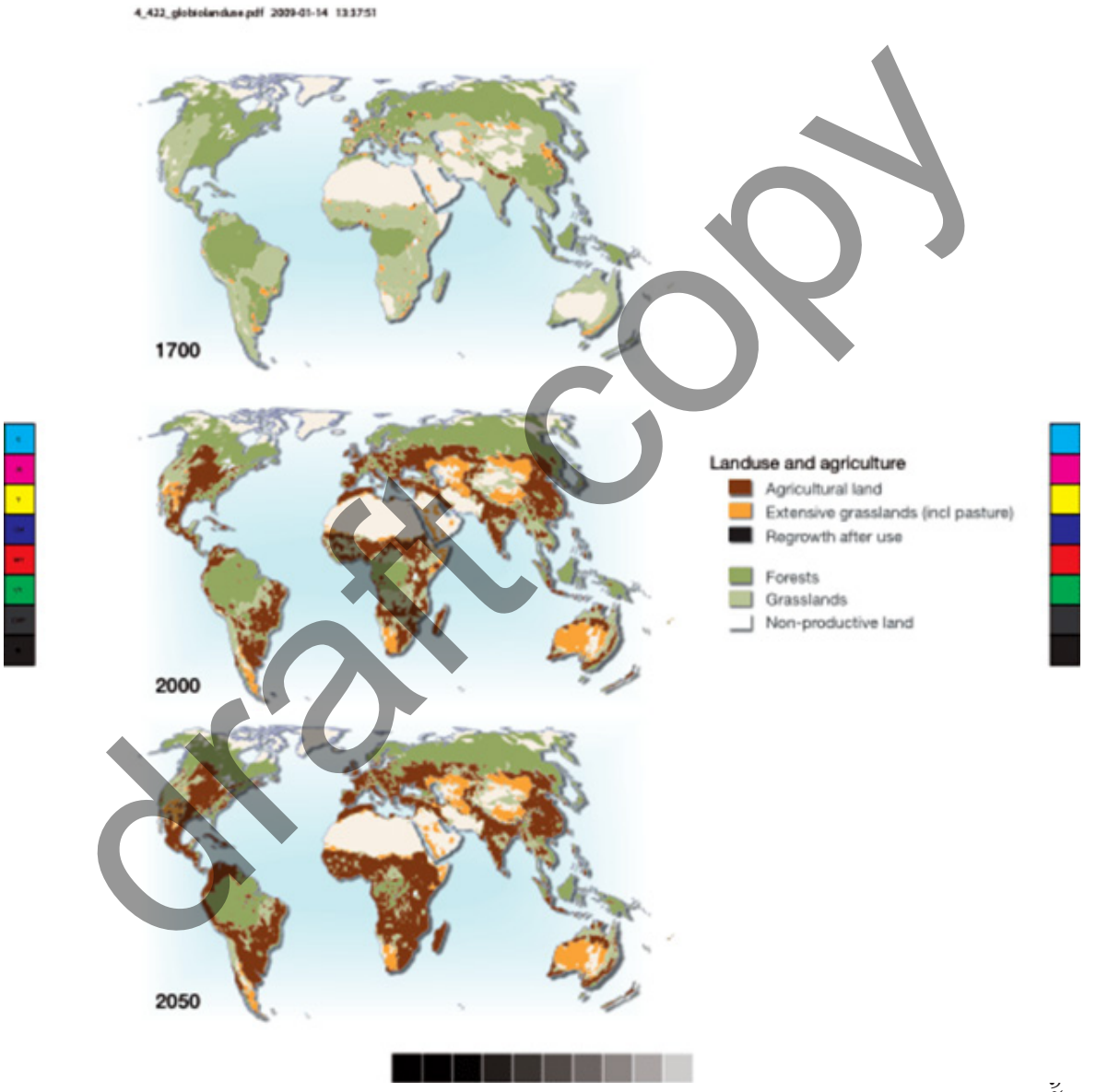

draft copy

আবাদি জমির পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরণ

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি জমির আয়তন বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে। এর ফলে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে বিশ্বজুড়েই, যেমন- পূর্ব ইউরোপের মোট ভূমির অর্ধেকের বেশি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ ভূমি কৃষিজমির শ্রেণিভুক্ত যার মধ্যে শস্যক্ষেত্র, তৃণভূমি ও চারণভূমি অন্তর্ভুক্ত। তবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে একদিকে যেমন খাদ্য চাহিদা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি সেখানে কৃষিজমির অপ্রতুলতা রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অকৃষি জমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কৃষিজমিতে রুপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিজমির সম্প্রসারণ এ অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট লেক অঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিম্নভূমি, পূর্ব চীন, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের বিভিন্ন অংশ পূর্বে বনভূমি বা অনাবাদী থাকলেও সম্প্রতি এগুলোকে শস্য আবাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ (১.৯৬ গুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে যার পেছনে কৃষিজমি সম্প্রসারণের সাথে কাজ করেছে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং নিবিড় কৃষিকাজের চর্চা। তবে সারা পৃথিবীতে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ১৯০০ সালের দিকে যা ছিল (০.৭৫ হেক্টর) তা ১৯৯০ সালের দিকে প্রায় অর্ধেক (০.৩৫ হেক্টর) হয়েছে। সারাবিশ্ব জুড়ে এ সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, শিশুমৃত্যু হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হওয়াসহ অন্যান্য কারণে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়লেও তার সাথে সঙ্গতি রেখে আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়ায় ওগুলোই উপরে বর্ণিত কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

গবাদিপশুর চারণ ভূমির পরিবর্তনের ধরণ

প্রাকৃতিকভাবে বা চাষ করার মাধ্যমে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে কোন ভূমি ব্যবহার হলে তাকে চারণ ভূমি (Pastoral Areas) বলা হয়। এ কারণে সাভানা বা তৃণভূমির সাথে চারণভূমির পার্থক্য করা কঠিন। পৃথিবীতে বিদ্যমান সাভানা বা তৃণভূমি সমূহের বহুমুখী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সারা পৃথিবীর মোট চারণভূমির বড় অংশ আফ্রিকা (২৬ শতাংশ) এবং এশিয়াতে (২৫ শতাংশ) অবস্থিত। লাতিন আমেরকিা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেও (১৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চারণভূমি দেখা যায়। এর বাইরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ (১০ শতাংশ), ওশেনিয়া (১২ শতাংশ), উত্তর আমেরিকা (৮ শতাংশ) এবং ইউরোপে (২ শতাংশ) কিছু চারণ ভূমি রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়েই চারণভূমির ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন এসেছে। এ সময়ে এশিয়া ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহে চারণভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপ ও ওশেনিয়াতে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব আফ্রিকাতেও চারণ ভূমি কমতে দেখা গেছে যার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে সেখানে ব্যাপক পরিমাণে পশু উৎপাদন।

draft copy

নগরায়ণে পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবহারে তার প্রভাবের ধরণ

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আমাদের দেশের গ্রামগুলো থেকে প্রতিবছর কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা উন্নত জীবনের আশায় কত মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশের নয় বরং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে এটি একটি সাধারণ চিত্র। ২০০০ সালের দিকে বিশ্বের শহরাঞ্চলে বসবাস করা জনসংখ্যা ছিল ২.৯ বিলিয়ন যা সেসময়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৪৫ বিলিয়নে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মেগা সিটির সংখ্যা বাড়ছে। শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে তার আয়তন বৃদ্ধিও বোঝায়। আবার নতুন নতুন এলাকা শহরে রুপান্তরিত হয়। তার মানে শহরের পরিসরের বিস্তার এবং নতুন শহর তৈরি এই উভয় কাজ ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহে কৃষিজমি, বনভূমি, উন্মুক্ত স্থান, জলাভূমি ও নিঁচু জমি ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহর বা নগরে রুপান্তর করা হচ্ছে। যার ফলে সেসব স্থানে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনের পার্ল নদীর অববাহিকায় নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে তিনগুণ থেকে বেশি। এ বর্ধিত নগরায়নের বেশির ভাগ সংগঠিত হয়েছে কৃষিজমি রুপান্তর করে। চীনের রাজধানী বেইজিং শহরের আশেপাশে আবাদিজমির রুপান্তরের হার আরো বেশি দেখা গেছে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরগুলো ভারত, পূর্ব এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল, পশ্চিম ইউরোপের উপকূলীয় ও নৌপথের কাছাকাছি দেখা যায়। তবে বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে দ্রুত গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরণ

মরুকরণ (Desertification) শব্দটির সাথে হয়তো আমরা ইতিমধ্যেই অনেকে পরিচিত। মরুকরণ হলো কোন এলাকায় স্থায়ীভাবে ভূমির উর্বরতা ও গাছপালা হারিয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মরুভূমির মতো পরিবেশ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া। আর জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সৃষ্ট কারণে মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা (উদ্ভিদ, অণুজীব) হ্রাস, পানি ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা মাটির উপরিস্তরের ক্ষয়, ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার মতো এক বা একাধিক ঘটনার প্রভাবকে ভূমির অবক্ষয় বা উর্বরতা হারানো বলে। UNEP (United Nations Environment Program) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বিশ্বে শুষ্ক ভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৫১৬০ মিলিয়ন হেক্টর এবং এই শুষ্কভুমির প্রায় ৭০ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রার ভূমি অবক্ষয়ের শিকার। United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) এর তথ্যমতে বিশ্বের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভূমি মরুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মরুকরণের প্রভাবযুক্ত এলাকা সঠিকভাবে সনাক্ত করা এখনো সম্ভব না হলেও এটা বলা যায় যে, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান ধারাবহিকতায় চলতে থাকলে বিশ্বের কম বৃষ্টি সম্পন্ন এলাকাগুলো মরুকরণের শিকার হবে। আর তাতে ভূমি ব্যবহারের বিদ্যমান ধরনে পরিবর্তন আনতে মানুষ অনেকটা বাধ্য হবে।

তবে আমরা যদি মোটাদাগে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই তাহলে নগরায়ণ, বনভূমি ও তৃণভূমিকে কৃষি জমিতে রুপান্তর, ফসলের পরিবর্তন, নিবিড় কৃষিকাজ, চারণভূমিকে কৃষি জমিতে রুপান্তরের কথা বলতে পারি।

draft copy

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

কোন নির্দিষ্ট এলাকায় যত জন লোক বাস করে তাকে সেই এলাকার জনসংখ্যা বলে। এই জনসংখ্যা কোথাও কম আবার কোথাও অনেক বেশি হতে পারে। যেমন: আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে আয়তন অনুপাতে কম মানুষ বাস করে যেখানে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোতে অল্প জায়গাতে অনেক বেশি মানুষের বাস। আবার বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ ফলে আমাদের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ঘনত্ব খুবই কম। কোন এলাকার জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সেখানকার বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেমন ফুটিয়ে তোলে তেমনি সেখানকার ভবিষ্যতের চিত্র বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। একারণেই জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সবদেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন দেশের জনমিতি (Demography) অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা সে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানতে পারি। আবার যেহেতু কোন এলাকার বা দেশের জনসংখ্যা সেখানকার স্থানিক বৈশিষ্টের সাথে সম্পর্কিত এবং সময়ের সাথে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে নানা পরিবর্তন হয় তাই এটি ভূগোল (মানবিক ভূগোল) শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। ভূগোল শাস্ত্রে এটিকে জনসংখ্যা ভূগোল (Population Geography) নামে পড়ানো হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলোর মান অপেক্ষাকৃত ভালো ও বহু বছরের তথ্য তারা সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সমূহ মূলত দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যথা- আদমশুমারি (census) এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত নথিপত্র থেকে। আদমশুমারি থেকে আমরা জনগণের জন্ম-মৃত্যু হার ও তাদের আর্থ-সামাজিক তথ্য পাই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে প্রথম আদমশুমারি হয়, যেমন-সুইডেনে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৭৪৮ সালে। বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ এবং সর্বশেষ ২০২২ সালে (করোনা মহামারির কারণে ১ বছর পিছিয়ে যায়) বাংলাদেশে আদমশুমারি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘ (UN) এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন যেমন- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনেস্কো (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে।

নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করতো, তাদের জীবিকার উৎস কি ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূ-খন্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

draft copy

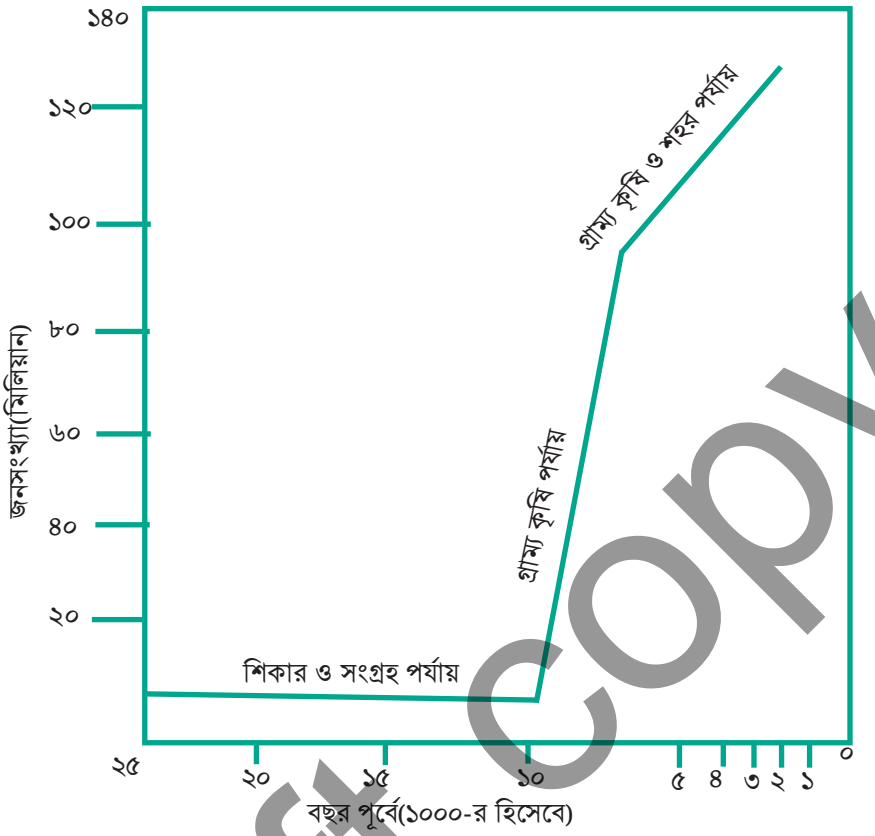

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন প্রাগৈতিহাসিক কালের কোন এক সময়ে আফ্রিকা থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন বা ৩৩ লক্ষ। আর ১৫ হাজার বছর আগে তা বেড়ে দাড়িয়েছিল ৫৩ লক্ষ জনে এবং জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.৪৪ জন। প্রস্তর যুগে মানুষের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬-১২ জনের মতো। ৬ হাজার বছর আগে গ্রামীণ কৃষি ও নতুন নগরায়নের যুগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৬.৫ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ। চাষবাসের শুরুর সময় থেকে কিছু কিছু এলাকায় ও পরবর্তী কালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্য চাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল। শস্য চাষ ও পশুপালন করে মানুষ কাছাকাছি বাস করার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। প্রয়োজন দেখা দিল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ফলে মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির আন্ত:সম্পর্ক দ্রুত বদলাতে শুরু করল। প্রাচুর্য আর খাদ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সাথে সাথে একই স্থানে বহু মানুষের বসবাসের সুযোগ তৈরি হলো। প্রায় ৩৩০ বছর আগে কৃষি, শিল্প ও নগরায়ণের শুরু হলে পৃথিবীর জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫০ সালের দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪৫ মিলিয়নে। এর সাথে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষি বিপ্লবের সাথে সাথে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রেখে মানুষের মৃত্যু হার কমিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী ৩০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিপায় প্রায় ৫ গুণ। আর ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২.৫ বিলিয়ন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৮ বিলিয়নে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা

draft copy

৭.৮৮ বিলিয়ন যা ২০৫০ সালে বেড়ে ৯.৭ বিলিয়নে রুপ নিতে পারে। জনসংখ্যার মহাদেশীয় বিস্তরণের দিকে তাকোলে দেখা যায় এশিয়াতে পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ বসবাস করে। অথচ এ মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ৩০ শতাংশ। নিচের সারণী থেকে আমরা মহাদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার বিস্তরণের চিত্র দেখতে পাব।

মহাদেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
এশিয়া	৪৬৭	৫৯.২৭	১৪৮
আফ্রিকা	১৪৩	১৮.১৫	৪৮
ইউরোপ	৭২	৯.১৪	৩২
উত্তর আমেরিকা	৫৯	৭.৪৮	২৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৩	৫.৪৫	২৫
ওশেনিয়া	৪	০.৫১	৫
এন্টার্কটিকা	০.০০৪৪৯	নগণ্য	নগণ্য

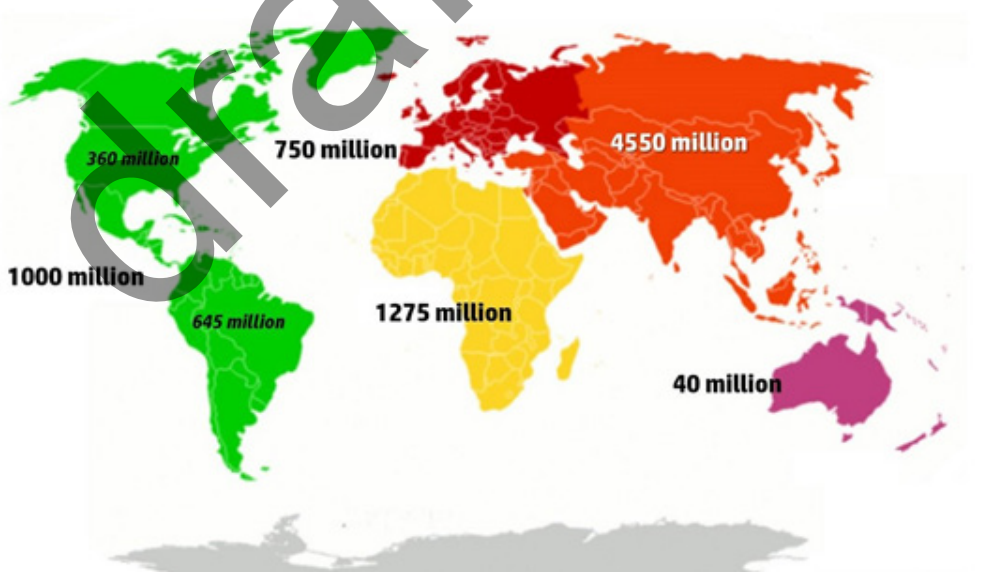

draft copy

এটি একটি জনঘনত্ব নির্দেশক মানচিত্র। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এশিয়াতে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর যেখানে জনঘনত্ব যত বেশি সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপও বেশি থাকে। প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতি থেকে বেশি সম্পদ সংগ্রহের জন্য মানুষ তখন সেখানকার বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

উপরোক্ত সারণী ও মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে এশিয়া মহাদেশের আয়তনের তুলনায় এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস। আর এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং ভারত ও চীনের মতো বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর পরেই রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান। যার ফলে এদুটি মহাদেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বনভূমি উজার হয়ে কৃষি জমিতে রুপান্তর হচ্ছে, কৃষিজমি বা বনভূমি আবার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করতে হচ্ছে, প্রাকৃতিক জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠছে নানা স্থাপনা।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলেও বন কেটে কৃষি ভূমিতে রুপান্তর বা অন্যনান্য কাজে ব্যবহারের ফলে বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে শিল্পায়ন, নগরায়ণ বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর যানবাহনের সংখ্যা। পৃথিবীর বিদ্যমান বনভূমি এ বিশাল পরিমাণ নির্গত কার্বন শোষণ করতে না পারায় দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব আমরা বুঝতে পারছি প্রকৃতির চরম বৈরি আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে । এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি জরুরি। এজন্য রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর এভাবে গৃহীত পদক্ষেপ যাতে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হয় সেজন্য ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হয়ে যার যার কমিউনিটিকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মানব বসতি (Human Settlement) ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

মানুষের জন্মের পর থেকেই যে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, তার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। শুধুমাত্র দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্যই নয় বরং দৈনন্দিন কাজের পর বিশ্রাম, পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের আশ্রয় প্রয়োজন। মানুষ তার সামর্থ্য ও পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে বসতি নির্মাণ করে। আদিমকালে মানুষ পাহাড়ের গুহা বা উঁচু বৃক্ষকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার সাথে সাথে তাতে পরিবর্তন আসে। এর সাথে মানুষের ভূমি ব্যবহারে দক্ষতা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বৃক্ষ থেকে মাটির কুঁড়েঘর, কুঁড়েঘর থেকে ইটের বাড়ি ও আধুনিক বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ- সবই পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকেই তুলে ধরে।

মানব বসতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা ভূমি ব্যবহারের অন্যতম একটি ধরণ এবং এর মাধ্যমে কিভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয় তা জানতে পারব। আগের দিনের যাযাবর মানুষের মধ্যে অস্থায়ী বসতি গড়ার প্রচলন থাকলেও আধুনিক কালে প্রায় সব মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। তবে এখনো কেউ কেউ কালে-ভদ্রে অস্থায়ী বাসস্থান ব্যবহার করে। এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে ধান চাষ মানুষের স্থায়ী বসতি গড়তে সাহায্য করেছে। এধরনের ঘটনা সুদূর প্রাচ্যের দেশ সমূহেও দেখা যায়। আবার উত্তর আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো এলাকায় খনিজ সম্পদ, যেমন-তেলকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে।

draft copy

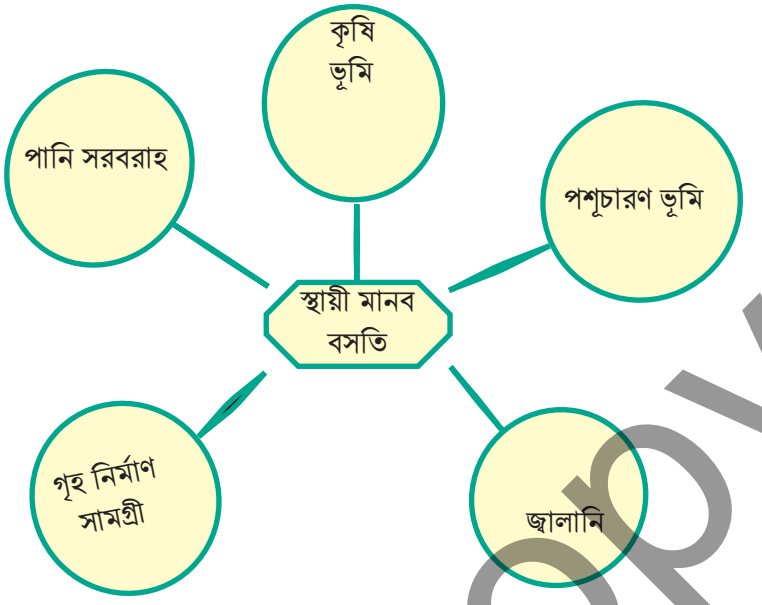

কৃষি অর্থনীতির প্রেক্ষিতে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠার প্রভাবক সমূহ

মানব বসতিকে তার স্থায়িত্ব, কর্মধারা (functions) বা আয়তনের ভিত্তিতে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে মানব বসতির একটি সরল শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো। তবে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা মানব বসতির দুটি প্রধান ভাগ, যথা- গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি নিয়ে আলোচনা করব।

draft copy

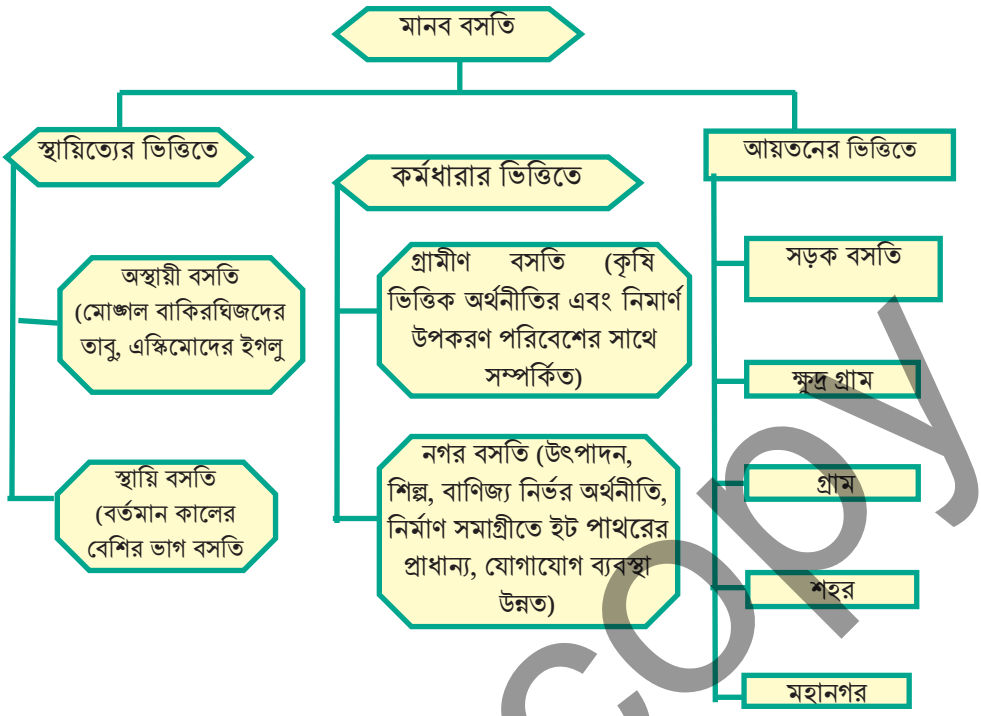

গ্রামীণ বসতি:

মানুষ ঠিক কোন সময়ে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস শুরু করল এবং কখন সেই স্থায়ী বসতি গ্রাম হিসেবে আত্নপ্রকাশ করল তার প্রামাণ্য দলিল নেই। তবে যতদিন পর্যন্ত মানুষকে ফলমূল আহরণ ও পশু শিকার নির্ভর জীবনযাপন করতে হয়েছে বা তারও পরে যতদিন পশুচারণকে জীবিকা হিসেবে নিতে হয়েছে ততদিন পর্যন্ত যে মানুষ স্থায়ী বসতি গড়তে পারেনি তা বলা যায়। পরে কৃষি ও ঘরের পত্তন, পরিবার ও সমাজের সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ এক সাথে বসবাস শুরু করলে গ্রামের পত্তন হয়। গ্রামীণ বসতি বলতে সেই মানব বসতিকে বোঝায় যেখানে বসবাসকারী লোকজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক (কৃষি উৎপাদন) কর্মকান্ডের সাথে জড়িত, জনসংখ্যার ঘনত্ব শহর এলাকা থেকে কম, বসবাসকারীদের মধ্যে আঞ্চলিক ও পেশাভিত্তিক বৈচিত্র্যতা কম, গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর যোগান পরিবেশের উপর নির্ভরশীল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ততটা উন্নত নয়। গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, সূর্যালোক প্রাপ্তি, জলাশয়ের অবস্থান ইত্যাদি। এর মধ্যে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি কারণ এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বসতি স্থাপনকে প্রভাবিত করে। তাই জমির ঢাল, উচ্চতা বা বন্ধুরতা মানব বসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। বসতি গড়ে ওঠার অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বনজ সম্পদের সহজলভ্যতা, মাছ ধরা ও পশুপালনের সুবিধা বা খনিজ সম্পদের আবিষ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে খনিজ তেল, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে নাইট্রেট, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সেখানে বসতি গড়ে উঠেছে। আবার বনজ সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ বিশ্বের বিভিন্ন বনভূমি সংলগ্ন বিচ্ছিন্ন এলাকাতে বসতি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশে জেলে সম্প্রদায় নদী বা সাগরের তীরবর্তী এলাকায় তাদের মতো করে বসতি

draft copy

গড়ে তোলে। আবার সাংস্কৃতিক নানা বৈশিষ্ট্য, যেমন-ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসে সাদৃশ্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক সাথে বাস করার প্রবণতা দেখা যায় যা গ্রামীণ বসতি স্থাপনে ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রামীণ বসতি স্থাপনে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- আমাদের দেশে গুচ্ছ গ্রাম প্রবর্তন বা পাবর্ত্য অঞ্চলে বাঙালি অধ্যুষিত বসতি স্থাপন মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত।

গ্রামীণ বসতির আয়তন দু'ভাবে নির্ধারিত হয়, যথা: গ্রামের পরিধিগত বিচার বা মোট এলাকা এবং গ্রামের মোট জনসংখ্যা দিয়ে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোর পরিধিগত বিস্তৃতি নানা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন-জলাশয় (খাল, বিল, নদী), বনভূমি, প্রাকৃতিক বাধা (পাহাড় বা টিলার অবস্থান) কিংবা যোগাযোগের সুবিধা-অসুবিধার নিরিখে নির্ধারিত হয়। গ্রামীণ বসতির আকার বলতে অনুকূল ও সুবিধাজনক বসতির স্থানে বাসগৃহ ও তার আনুষঙ্গিক উপাদান সমূহের নির্দিষ্ট দিকে বিস্তারের প্রবণতাকে বোঝায়। এর ফলে বসতির একটি বাহ্যিক রূপ সৃষ্টি হয় যা ভূগোলবিদদের চোখে ধরা পড়ে। গ্রামীণ বসতির আকৃতি প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, এবং অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়। আমাদের দেশের গ্রামীণ বসতিতে সরল রৈখিক (linear), গুচ্ছাকৃতি বা পিন্ডাকৃতি (compact or nucleated or agglomerated) এবং বিক্ষিপ্ত (scattered or dispersed) বসতি দেখা যায়। সড়ক বা রেলপথ কিংবা নদীর তীরবর্তী বাঁধ ধরে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠলে তা অনেকটা সরল রৈখিক আকৃতি লাভ করে। কারণ যোগাযোগ সুবিধার জন্য এসব অবকাঠামোর দুদিকে ভূমি ব্যবহারে দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং বসতি গড়ে ওঠে। কোন রাস্তার সংযোগ স্থল, নদী বন্দরের আশেপাশে বা কোন বাজারের চারপাশে গুচ্ছাকৃতি গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। আবার পাহাড়ী এলাকা বা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ বসতিতে মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়।

নগর বসতি:

ইংরেজি শব্দ Urban এর বাংলা প্রতিশব্দ নগর আর Town অর্থ শহর। নগর বা শহর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হলেও শহর অপেক্ষা নগরের আয়তন বড়, নগরে মানুষের পেশা এবং কর্মধরণ অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। বহু প্রকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, পেশা ভিত্তিক সুযোগ, স্থাপত্যশৈলি নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট যা শহরের সীমিত পরিসরে গড়ে ওঠে না। আর ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের সমারোহ, বিনিময় ও বাণিজ্যের কেন্দ্র, কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প ও সেবা ভিত্তিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের জীবিকা নির্বাহ, অল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাস বা মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি দ্বারা নগরকে গ্রাম (rural) থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়। নগরে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, আমোদপ্রমোদের জন্য বিভিন্ন আয়োজন এবং পার্ক, জাদুঘর দেখা যায়। নগরে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের নগরগুলোতে, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যার নাম বস্তি (slum)। এসব বস্তিতে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা না থাকলেও নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখানে গাদাগাদি করে বসবাস করে। জার্মানিতে নগরকে stadt, ইংল্যান্ডে town বা city, ফ্রান্সে cite, সুইডেনে staden বলা হয়। অনেক দেশ জন সংখ্যা দিয়ে নগরকে সংজ্ঞায়িত করে, যেমন-যুক্তরাষ্ট্রে ২,৫০০ মানুষ কোন বসতি গড়ে তুললে তাকে নগর বলা হয়, নেদারল্যান্ডে এ সংখ্যা ২৫,০০০। এ থেকে বলা যায় নগরকে সংজ্ঞায়িত করার কোন একক পদ্ধতি প্রচলিত নাই।

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়নের হার সমান নয়। নগরায়নের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ন দেখা যায়।

draft copy

নগরায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যে সকল প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন তাদের উৎপত্তি কোন না কোন নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে নগরায়নের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়নের চিহ্ন বহন করে।

প্রাচীন জেরিকো (Jericho) নগরীর অবস্থান

draft copy

১৭৬০ সালের দিকে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে যে কারিগরী ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল তা আধুনিক নগরায়নের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষিতে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে কর্মী উদ্বৃত্ত হয়। ফলে ওইসব কর্মীরা নতুন শিল্প শহরে স্থানান্তরে উৎসাহী হয় এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা তাদেরকে অধিকতর গতিশীল করে নগরের দিকে ধাবিত করে। আবার নগরের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ সহজ হয়ে যায়। এভাবে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সমান তালে বিকশিত হয়। ১৯৬০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ নগরের বাসিন্দা ছিলেন যা ঊনবিংশ শতাব্দী শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশে। আধুনিক নগরায়নের পেছনে যে সব বিষয় ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো:

(১) বিজ্ঞানের উন্নতিতে কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সংযুক্তি ঘটে

(২) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেলেও কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি পায়নি

(৩) পরিবহনের উন্নতির ফলে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সহজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়

(৪) গ্রামের দারিদ্র পীড়িত ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠী বেশি আয় ও উন্নত জীবনের আশায় শহরে চলে আসে

(৫) বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন বাণিজ্যপথ আবিষ্কার হয়।

যদি আমরা আধুনিক নগরের দিকে তাকাই তাহলে প্রাচীন নগরসমূহ থেকে তার কিছু পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। যেমন: আধুনিক নগরসমূহে প্রাচীন নগরের প্রাচীর ও পরিখামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। নগরের পারিসরিক বিস্তৃতি ও নগর অভ্যন্তরে চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নগর কেন্দ্রে ব্যবসায়িক প্রাধান্য ও প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় এবং নগরগুলো উল্লম্বভাবে বিকশিত হচ্ছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের নগরায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসন বেশি দেখা যায়। এসব দেশে মেট্রোপলিটন ও মেগাসিটির সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিকল্পিত নগরায়ন অনুপস্থিত থাকায় যানজট, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা, জলাবদ্ধতা প্রতিনিয়ত দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, গ্রামীণ বা নগর বসতি যাই হোক না কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব গড়ে উঠেছে। আর যেকোন বসতি গড়া মানেই তা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপে তৈরি। এ কারণেই মানব বসতি নির্মাণকে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়। যেহেতু সারা বিশ্বের জনসংখ্যা এখনো উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই আগামী দিনগুলোতে বর্ধিত মানুষের জন্য আরো গ্রামীণ বা নগর বসতির প্রয়োজন হবে। যার ফলে বিদ্যমান বনভূমি, কৃষিজমি, জলাশয় বা তৃণভূমির উপর চাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর তাতে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে অন্যদিকে তেমনি বনজ সম্পদের অভাব আরো তীব্র হতে পারে। আবার বনভূমি হ্রাস পাওয়াতে পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র রক্ষা করা দূরুহ হয়ে উঠতে পারে। তাই রাষ্ট্রসমূহের জন্যে পরিকল্পিত জনসংখ্যা নীতি, উর্বরতা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে ভূমি ব্যবহার নীতি, গ্রামীণ ও নগর বসতি স্থাপনে পরিকল্পনা, কৃষি ও বনভূমি, জলাভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। এসব নীতিমালা বাস্তবায়নে ব্যক্তির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া ও কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

draft copy

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সারা বিশ্বে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরণ সম্পর্কে জানতে পারলাম। তবে ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক জটিল প্রক্রিয়া। নানাবিধ বিষয় এর সাথে জড়িত এবং এর স্বরূপ বৈচিত্র্যময়। পরবর্তী অংশে আমরা ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানব।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণগুলো বেশ জটিল ও একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত বা অনেক সময় একটি আরেকটি দ্বারা প্রভাবিত। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের দৃশ্যমান কারণ হিসেবে আমরা অবকাঠামো নির্মাণ (রাস্তাঘাট, বাজার, ঘরবাড়ি), কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহের কথা বলতে পারি। তবে মূল কারণগুলোকে আমরা নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি।

(ক) বায়োফিজিক্যাল কারণ: এর মাধ্যমে মূলত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রাকৃতিক সক্ষমতা বা পরিবেশের এমন একটি অবস্থা বোঝানো হয় যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য সহায়ক। পরিবেশের জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের উপাদান এখানে ভূমিকা রাখে। জলবায়ু, মাটি, শিলার গঠন বৈশিষ্ট্য, ভূসংস্থান, ভূমির বন্ধুরতা, পানিপ্রবাহ, গাছপালা ইত্যাদি বায়োফিজিক্যাল উপাদান ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

(খ) অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণ: ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় সাড়ে সাতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে অর্থনিতক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হয়েছে। বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি সনাক্ত করতে সাহায্য করছে এবং এভাবে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ নানান লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল করেছে ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরণে নানা পরিবর্তন এসেছে।

(গ) জনমিতিক কারণ: জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য কোন এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, আবাসনসহ নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা নিশ্চত করার জন্য মানুষকে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন: অতিরিক্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিজমি, ও পতিত জমিকে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আবার বনভূমি কেটে কৃষিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারে প্রবণতাও বেড়েছে । আবার কোন দেশের মানুষের শিক্ষা, দক্ষতা, শহর বা গ্রামে বাস করাসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ নির্ধারণ করে বলে আমরা বলতে পারি জনমিতিক নানা বৈশিষ্ট্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির উপর মানুষের নির্ভরতা শিল্পোন্নত দেশের মানুষের চেয়ে কম হবে। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল কৃষিনির্ভর দেশে পাহাড় বা বনভূমি উজাড় করে তাতে কৃষিকাজ বা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ, জনমিতিবিদ এবং ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে যে 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' প্রদান করেন তাতে বলা হয়েছে 'খাদ্যশস্যের উৎপাদন যখন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে'। এ তত্ত্ব সৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর ফলশ্রুতিতে ভূমি ব্যবহারের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসেবে কাজ করেছে।

draft copy

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কারণ: ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের জন্য জনমিতিক, অর্থনৈতিক কিংবা প্রযুক্তিগত বিষয়ের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো সরকার। ব্যক্তি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনেক বেশি। সরকারি নীতিমালা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সর্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সরকার বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি প্রদান, আর্থিক প্রণোদনা, শিল্পায়ন, রপ্তানি এবং অবাকাঠামোর উন্নয়নের নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখে। আবার ভূমি, শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি যোগান দিতে সরকার প্রণীত স্থানীয় ও জাতীয় নীতিমালা কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সরকারের কৃষি, বন ও বন্য প্রাণী রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক নীতিমালা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

(ঙ) সাংস্কৃতিক কারণ: অসংখ্য সাংস্কৃতিক বিষয় ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, যেমন- মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভিব্যক্তি। এই বিষয়গুলো আবার মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবার এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমাদের দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করা আদিবাসি গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাপন প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানকে তুলে ধরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে প্রকৃতি যেভাবে আছে তাকে সেভাবে রক্ষার একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেক সময় বৃক্ষপ্রেমী মানুষ নানা জাতের গাছ লাগিয়ে পুন: বনায়ন বা সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলেন। বিপরীতভাবে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে কিছু মানুষ বনের বিনাশ করে এবং ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ফলাফল

ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য মূল কারণ মানুষের নানা প্রয়োজন বেড়ে যাওয়া ও প্রয়োজনের ধরনে পরিবর্তন। মানুষ যে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনবে সেটাই আজ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন মানুষের জন্য আপাত প্রয়োজন মেটালেও অনেক ক্ষেত্রে তা নানা নেতিবাচক প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। নিম্নে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের প্রভাব গুলো উল্লেখ করা হলো।

১. বনজ উৎপাদন যেমন খাদ্য, পশু খাদ্য, তন্তু এবং কাঠের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া। এর সাথে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি ও দারিদ্য বৃদ্ধির যোগ রয়েছে।

২. রোগবালাইয়ের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি

৩. বায়ু দূষণ, গ্রীণ হাউজ গ্যাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বৃদ্ধি

৪. কৃষি বৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য হারানো

৫. মাটির গুণাগুণ বিনষ্ট হওয়া

৬. মানুষের মাধ্যমে পরিবেশ অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি

৭. মিঠাপানির সংস্থান, সেচ ও উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষায় ঝুঁকি বৃদ্ধি

এসবের বাইরেও আচ্ছাদনে পরিবর্তনে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও নানা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। যেমন- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, পাহাড় ধ্বস, মাটির ক্ষয়, নদী ভাঙন, নদী ভরাট হয়ে বন্যা বৃদ্ধি পাওয়াসহ

draft copy

নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

তবে উল্লেখিত নানা ধরণ ও মাত্রার ঝুঁকি ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সাথে জড়িত থাকলেও এর সাথেই আবার মানুষের উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদকে মানব কল্যাণে ব্যবহার ও বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন প্রাপ্তির বিষয়টি জড়িত। কারণ ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতি নির্ভর কষ্টকর জীবন-যাপন থেকে আজকের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও আরামদায়ক জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য ভূমিকা রেখেছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত আবাসন, নগরায়ন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি। আর এসবই এসেছে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সম্ভাবনার তালিকাও বেশ দীর্ঘ। মোটা দাগে বলতে গেলে এ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যেসব সুযোগ তৈরি করতে এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যেতে পারছে সেগুলো হলো-

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারছে

২. নগরায়ণ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাস ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

৩. মানুষের প্রয়োজনে একমুখী ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তে তার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছে ৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় ভারসাম্য সৃষ্টি, শিক্ষা ও জ্ঞান সৃজন, বিতরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন হয়েছে

৫. ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈরি পরিবেশে মানুষের টিকে থাকার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

তবে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভাবনার যেসব দিক উন্মোচিত হয়েছে তার প্রায় সবই শুধু মানবজাতির কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মানুষের দ্বারা তৈরি। আর সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতির কারণ হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যা আজ প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করছে তা অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জন্য সরাসরি ঝুঁকি তৈরি করবে। এর অর্থ হলো, যা প্রকৃতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা যে কোন সময় মানুষের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ মানুষ প্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বৈ ভিন্ন কিছু নয়।

আমাদের করণীয়:

উপরের অংশগুলো থেকে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং মানুষের সংখ্যা এবং তাদের প্রয়োজনের তালিকা যত বৃদ্ধি পাবে এ পরিবর্তনও তত বেশি ত্বরান্বিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। এটি যেহেতু কোন একক রাষ্ট্র বা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এ পরিবর্তন যেহেতু মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের সাথে জড়িত তাই সমগ্র মানব জাতিকেই এর প্রভাব নিয়ে ভাবতে হবে। সকল রাষ্ট্রকেই ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই এবং প্রকৃতিবান্ধব উপায়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সাথে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে এসব নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। আবার যাদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে সে সকল মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করতে হবে। তাহলেই সহনশীল ও টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একটি বিষয় আমাদের উপলব্ধি করতে পারতে হবে যে, পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয় বরং পৃথিবীর হাজারো জীবের মধ্যে মানুষ একটি। মানুষকে তার বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানব কল্যাণের সাথে সাথে প্রকৃতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ, সহনশীল, টেকসই আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

draft copy

মানুষকে বুঝতে পারতে হবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বরং নিজেকে প্রকৃতি ও পরিবেশের অংশ ভেবে তাকে সংরক্ষণে নানা ভূমিকা গ্রহণও তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার নিয়ে আমাদেরকে সচেতন থেকে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিকল্পনা করতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে টেকসই ও সহনশীল উন্নয়নের ধারণা ও অনুশীলন বাস্তবায়ন করতে হবে

সম্পদের উৎপাদন, বন্টন ও সমতার নীতি

আমরা টিভি চ্যানেলে অনেকসময় অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ দেখে থাকি। এরকম দুটি সংবাদ সম্পর্কে আমরা জেনে নিই।

সংবাদ শিরোনামঃ এক তরুন উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনী

প্রিয় দর্শক, সংবাদের এখন থাকছে একজন সফল তরুন উদ্যোক্তার সফলতার পিছনের কাহিনী। জাহাঙ্গির আলম যার বেড়ে উঠা বস্তি এলাকায়। বস্তি এলাকার নোংরা পরিবেশে পরে থাকা প্লাস্টিক বোতল সংগ্রহ করতে করতেই একবার মাথায় এলো এই প্লাস্টিককে পুনর্ব্যবহারের ব্যবসা করা যায় কীনা। স্কুলের পাঠ্য বইতে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় থেকে তিনি পরিকল্পনা করলেন ব্যবহৃত প্লাস্টিককে সবচেয়ে কম খরচে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পুনরায় ব্যবহার করার একটি ব্যবসা দাঁড় করাবেন। সহপাঠী চার বন্ধু মিলে তাই গড়ে তুললেন একটি সংগঠন। খুব কম মূলধনে মাঠে নেমে পড়লেন এবং মাত্র পাঁচ বছরে ভালো মুনাফা লাভ করলেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

draft copy

সংবাদ শিরোনামঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে মৃৎশিল্পের সম্ভবনা

প্রিয় দর্শক, এবার বাংলাদেশের বাজার অর্থনীতি সম্পর্কিত কিছু তথ্য আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের এক সম্মেলনের আয়োজিত হয়। সেখানে উদ্যোক্তরা বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার কথা বলেছেন। তারা জনসাধারণের মধ্যে এই মৃৎশিল্পকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকার ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । সেইসাথে সঠিক প্রচারণা করা হলে এই শিল্প বহির্বিশ্বের ভোক্তাদের মধ্যেও ব্যাপক চাহিদা তৈরি করতে পারবে বলে উদ্যোক্তরা আশা ব্যক্ত করেন।

অনুশীলনী কাজ ১: উপরের দুটি সংবাদের মধ্যে আমরা কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি? চলো আমরা দলগতভাবে পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করি।

এক তরুন উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনী	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে মৃৎশিল্পের সম্ভবনা

আমরা পার্থক্য লেখার সময় হয়তো ভেবেছি একটি সংবাদে একজন তরুন উদ্যোক্তার কথা বলা হয়েছে।

draft copy

তার সংগঠন, মূলধন ও মুনাফার কথা বলা হয়েছে। এই অন্যদিকে অপর সংবাদটি বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের সম্ভবনার কথা বলা হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো ব্যষ্টিক অর্থনীতির অলোচ্য বিষয়। যেমন- একজন উদ্যোক্তা বা শিল্প ফার্মের মালিক কীভাবে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিবে, কতটুকু উৎপাদন করবে, দাম কীভাবে নির্ধারিত হবে, উপকরণের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করবে, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবে ইত্যাদি ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতাভূক্ত। একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্য বা সেবার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। তাই প্রথম সংবাদটিকে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি।

অপরদিকে, জাতীয় সামষ্টিসমূহের বিষয়গুলো সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। মোট ভোগ, মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন, সাধারণ দামস্তর, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদির অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। তাই দ্বিতীয় সংবাদটি সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

ব্যস্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির আরো একটি উদাহরণঃ

ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলতে কোনো একটি শিল্পের ছোট/ক্ষুদ্র একটি ইউনিট বোঝায় । যেমনঃ পাট শিল্প। আমাদের পাট শিল্প গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে যেকোনো একটি পাটকল যেমনঃ আমিন জুট মিলসের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো ।

আবার যখন সকল পাটকল বা পাট শিল্প নিয়ে একত্রে বা সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো তখন তা সামষ্টিক অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমনঃ বাংলাদেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ , এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের মজুরী, দাম এবং উৎপাদন এই বিষয়গুলো সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক এজেন্টস (যেমন-ভোক্তা, উৎপাদন,ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, শিল্প প্রতিষ্ঠান) এবং তাদের আচরণগত ধরনের ওপর ভিত্তি করে আমরা অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

draft copy

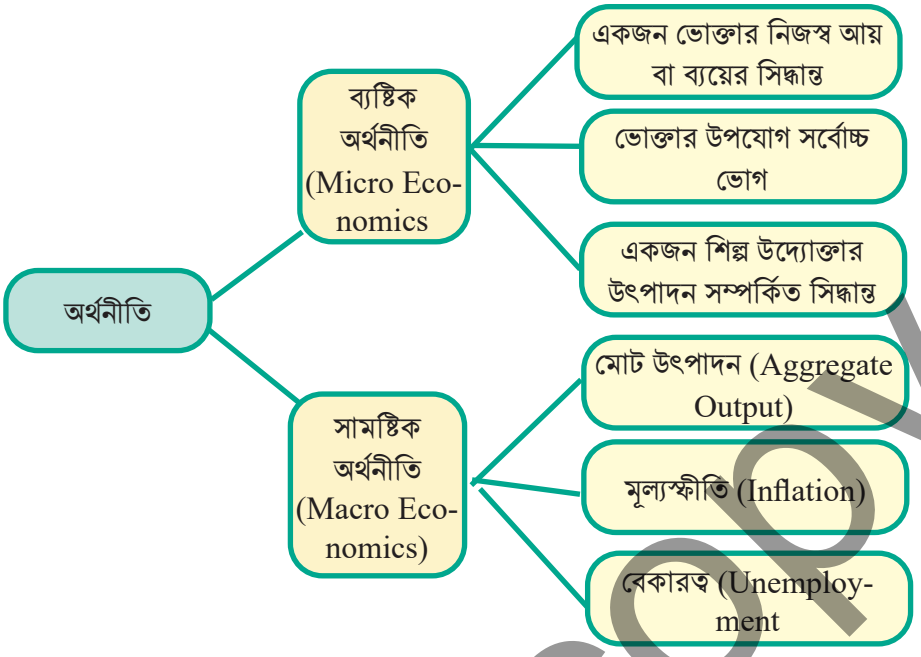

চিত্রঃ ব্যস্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

নিচের প্রত্রিকার রিপোর্টটি আমরা পড়ে নিই।

বিশ্ব বাজারে দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতির প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পড়েছে। বর্তমানে জ্বালানী তেলের দাম বাড়ায় পরিবহন মালিকেরা জনপ্রতি সিট ভাড়া বাড়িয়েছে। এতে করে সাধারণ মানুষ বিরুপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অন্যদিকে পরিবহন মালিকদের দাবি জ্বালানী তেল ক্রয়, কর্মচারীর বেতন ও পরিবহন মেরামত বাবদ এখন তাদের খরচ বেড়েছে আগের চেয়ে দ্বিগুণ। তাই তারা বাধ্য হচ্ছে যাত্রী ভাড়া বাড়াতে। অন্যদিকে যাত্রীদের মতামত জ্বালানী তেলের যে পরিমাণ দাম বেড়েছে সে অনুপাতে অনেক বেশি দাম সিট ভাড়ার দাম বাড়িয়েছে পরিবহন মালিকেরা। এ বিষয়ে সরকারের যথাযথ নজরদারির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরো করেছে অর্থনীতিবিদরা।

আমরা খেয়াল করলে দেখবো এখানে বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের দাম বাড়ানোর প্রভাব বর্ণনায় পরিবহন মালিক, যাত্রী ও অর্থনীতিবিদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। যখন জ্বালানী তেলের উর্ধ্বগতি এবং বাংলাদেশের পরিবহন মালিক ও যাত্রীদের অবস্থা ঠিক যেমনটি আছে সেভাবেই বিশ্লেষণ করা হয় তখন সেটি ইতিবাচক অর্থনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার যখন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বা কর্মকান্ড কেমন হওয়া উচিৎ বা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে যখন কোনো অর্থনীতিবিদের বক্তব্য বা আলোচনা নীতিবাচক অর্থনীতির আওতাভুক্ত। তাই এখানে অর্থনীতিবিদরা সরকারের যথাযথ নজরদারির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য যা

draft COPY

বলেছেন সেটি নীতিবাচক অর্থনীতি।

এখন চলো আমরা একটি গল্প পড়ি

একজন কৃষকের কয়েক বিঘা জমি আছে। তিনি জমিতে অর্ধেক পরিমাণে ধান ও বাকী অর্ধেক পরিমাণ সব্জি চাষ করবেন। ধান থেকে যে চাল হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ তিনি নিজের সংসারের জন্য রেখে দিয়ে বাকী অংশ বিক্রি করেন। এভাবেই কয়েক বছর চলে গেল। কোনো এক বছর ধান বীজের দাম বাড়ায় তিনি ধান চাষ কমিয়ে দিয়ে সব্জির চাষ করলেন বেশি করে। এরপরের বছর ধান বীজের দাম কমায় তিনি ধান চাষ বাড়িয়ে দিয়ে সব্জি চাষ কমালেন। এই বছর তিনি চিন্তা করলেন ধান ও সব্জি দুটোই বেশি করে চাষ করবেন। কিন্তু জমির পরিমাণ না বাড়ায় তিনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

অনুশীলনী কাজ ২: আচ্ছা আমরা একটু ভেবে দেখিতো জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

draft copy

আমরা হয়তো আমাদের ভাবনাগুলো লিখেছি। আসলে আমরা খেয়াল করলে দেখব আমাদের উপকরণের যোগান অসীম নয়। ভূমি, শ্রম এবং মূলধনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই কোনো দ্রব্য বেশি উৎপাদন করতে গেলে অন্য দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। কারণ সব দ্রব্য আমরা সমানভাবে উৎপাদন করতে পারিনা। সম্পদের স্বল্পতার কারণে।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমিত সম্পদ থেকে আমাদের অসীম অভাব পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের বা উপকরণের পরিমাণ বা সরবরাহ অসীম হতো তাহলে আমরা ইচ্ছেমতো দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারতাম। আমাদের কোনো অতৃপ্তি বা অপূর্ণ্যতা থাকতো না।

তাহলে সম্পদের সিমাবদ্ধতার কারণে কোনো কিছু বেশি পরিমাণে পেতে হলে অন্য কিছু কম পরিমাণে পেতে হয় বা পাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাই কোনো দেব্যের বা উৎপাদনের কতটুকু চাই সেই সিদ্ধান্ত নিতে গেলে যে খরচের বিষয়টি এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই/ উপায় নেই সেটির নাম সুযোগ ব্যয় বা সুযোগ বর্জন খরচ (Opportunity cost)।

উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা (Production Possibility Frontier/Curve, PPF/PPC)

draft copy

চিত্রঃ পাট উৎপাদনে কৃষক

চিত্রঃ ধান উৎপাদনে কৃষক

মনে করি, কোনো কৃষক তার সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ ভূমি (কৃষি জমি), শ্রমিক এবং মূলধন (যন্ত্রপাতি) শুধু ধান উৎপাদনে ব্যবহার করে তাহলে সে সর্বোচ্চ পরিমাণ ২৫ লক্ষ টন ধান উৎপাদন করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে পাট উৎপাদনের পরিমাণ হবে শূন্য। আবার সমস্ত উপকরণ পাট উৎপাদনে ব্যবহার করলে সে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫ লক্ষ টন পাট উৎপাদন করতে পারবেন। তখন ধান উৎপাদনের পরিমাণ হবে শূণ্য। এটাকে আমরা উৎপাদন সম্ভবনার রেখার সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি।

টেবিল-উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ও সুযোগবর্জন খরচ

সম্ভাবনা	পাট (লক্ষ টন)	ধান (লক্ষ টন)	সুযোগ বণ্টন খরচ (লক্ষ টন)
A	০	২৫	-
B	১	২৪	১
C	২	২২	২
D	৩	১৮	৪
E	৪	১০	৮
F	৫	০	১০

কৃষক যদি শুধু ধান উৎপাদন করেন তাহলেতো হব না কারণ কিছু পাট উৎপাদন করাও প্রয়োজন। তাই ধান উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত জমি/ভূমি রয়েছে সেখান থেকে কিছু জমি কৃষক পাট উৎপাদনে ব্যবহার করবেন

draft copy

এবং অন্যান্য উপকরণও পাট উৎপাদনের জন্য স্থানান্তর করব। এভাবে আমরা ধান ও পাটের অনেকগুলো উৎপাদন-সমাহার পেতে পারি যা উপরের টেবিলে A,B,C,D,E এবং F এর সাহায্যে সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে।

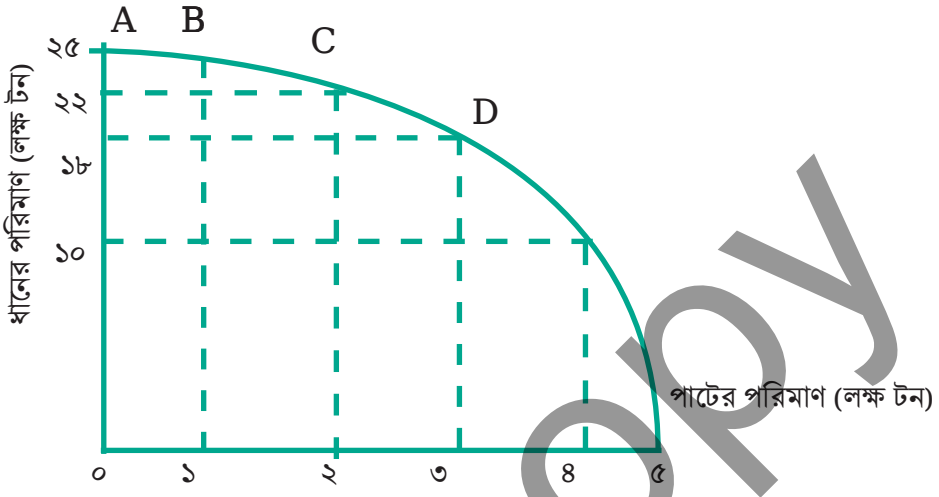

চিত্র১: ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্র-১ এ ধান ও পাটের A, B, C, D, E এবং F উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় সকল উৎপাদন সমাহার দেখানো হয়েছে। উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ঢাল ঋণাত্বক। অর্থাৎ পাটের উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধানের উৎপাদন কমাতে হয়। সকল উৎপাদনের উপকরণ/ সম্পদ ধান উৎপাদন ব্যবহৃত হলে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টন ধান উৎপাদন সম্ভব হয়। চিত্রে এটি A সমন্বয় / বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে । এখন ধরা যাক, উৎপাদনকারী ১ লক্ষ টন পাট উৎপাদন করতে চায়। যেহেতু A বিন্দুতে সব উপকরণ নিয়োজিত রয়েছে, তাই পাট উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে যতটুকু উপকরণের প্রয়োজন তা ধানের উৎপাদন থেকে সরিয়ে আনতে হবে । চিত্রে বাড়তি বা অতিরিক্ত ১ একক (১ লক্ষ টন পাট) পাট উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে পৌঁছাই। অর্থাৎ এক একক পাটের উৎপাদনের জন্য এক একক (এক লক্ষ টন) ধানের উৎপাদন কমাতে হয়েছে। B বিন্দু দেখাচ্ছে ২৪ লক্ষ টন ধান এবং ১ লক্ষ টন পাট । আমরা যতই পাটের উৎপাদন বাড়াবো ততই ধানের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস মেনে নিতে হবে। চিত্রে B বিন্দু থেকে C বিন্দুতে ২ লক্ষ টন পাট ও ২২ লক্ষ টন ধান উৎপাদন দেখাচ্ছে । অর্থাৎ বাড়তি ১ লক্ষ টন পাটের জন্য ২ লক্ষ টন ধান উৎপাদন কমাতে হবে । এইভাবে C থেকে D এবং D বিন্দু থেকে E বিন্দুতে বিভিন্ন উৎপাদন সম্ভাবনা পাবো । F বিন্দুতে ৫ লক্ষ টন পাটের জন্য ধানের উৎপাদন শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে হবে । এইক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদ পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে । তখন সকল উপকরণের সাহায্যে ৫ লক্ষ টন পাট উৎপাদন সম্ভব। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য / পণ্য উৎপাদন করতে চাইলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন সর্বোচ্চ কত হওয়া সম্ভব তা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে জানা যায়।

প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং সম্পদ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপর যে কোনো বিন্দুকে দক্ষ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপর যে কোনো বিন্দুকে দক্ষ উৎপাদন

draft copy

স্তর আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা-এর ভিতরে যেকোনো বিন্দু অদক্ষ উৎপাদন হিসেবে বিবেচনা করা হয় । উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার বাহিরে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে।

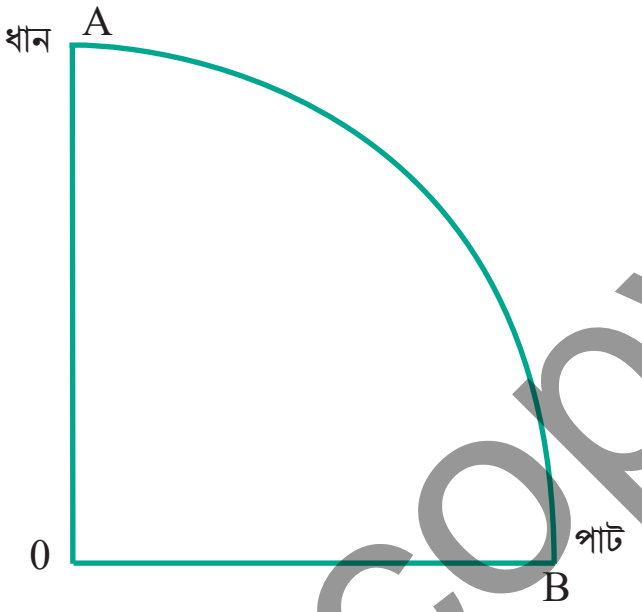

Figure: Efficient, Under Utilized and Unattainable Level of Production

দ্রব্য বা পণ্যর চাহিদা

.০৫ আমাদেরতো অনেক কিছুর চাহিদা রয়েছে তাই না? কারো কম বা কারো বেশি। চলো আমরা এখন আমাদের নিজেদের কি কি জিনিসের চাহিদা রয়েছে তা নিচের ছকে লিখে নিই। এরপর পাশে বসা সহপাঠীর কাছ থেকে জেনে নিই তার কোন জিনিসের চাহিদা রয়েছে। সহপাঠীর চাহিদাগুলোও নিচের ছকে লিখে নিই।

আমার যে জিনিসের চাহিদা রয়েছে	আমার সহপাঠীর যে জিনিসের চাহিদা রয়েছে

draft copy

আমরা হয়তো লক্ষ্য করেছি আমাদের নিজের চাহিদা ও সহপাঠীদের চাহিদার মধ্যে কম বেশি পার্থক্য রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে দুজনের পণ্য পাওয়ার আকাঙ্খা ভিন্ন। তাই চাহিদার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকাঙ্খা।

অনুশীলনী কাজ ৪: আমাদের যেসব জিনিসের আকাঙ্খা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বাসা বা স্কুলের কাছাকাছি নিরাপদ দূরত্বে কোনো দোকানে বা বাজারে ক্রয় করা যায় তার তালিকা করি। সেই দোকানে বা বাজারে গিয়ে আমরা পণ্যগুলোর দাম জেনে নিই।

যে পণ্যের আকাঙ্খা রয়েছে	যে দামে আমি কিনতে আগ্রহী	বাজারে পণ্যটির দাম	পণ্যটি কি আমার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে?	পণ্যটি কি আমি বাজারের দামে কিনতে চাই?

দোকান বা বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা হয়তো বুঝতে পারছি অনেক পণ্য আছে যেগুলো ক্রয় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আবার অনেক পণ্য আছে যেগুলো কেনার সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা থাকলেও আমরা বাজার দামে অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক নই। তাই চাহিদার আরো দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম সেগুলো হলো ক্রয় ক্ষমতা ও ব্যয়ের ইচ্ছা।

draft copy

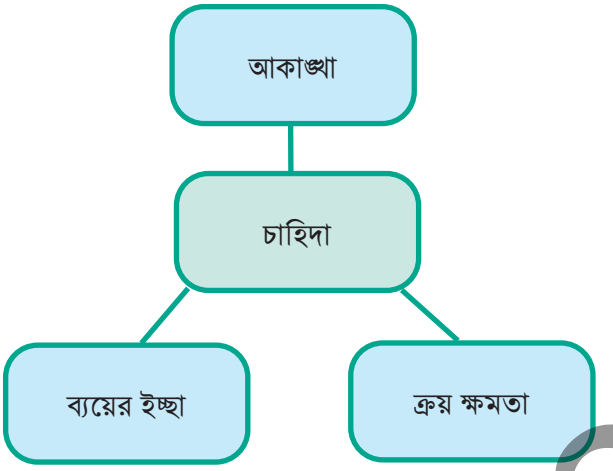

চিত্র- চাহিদার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

আচ্ছা, আমাদের যে পণ্য বা জিনিসের চাহিদা রয়েছে এগুলোর দাম যদি কমে যায় তাহলে কি পণ্যের চাহিদা কমবে না বাড়বে? নিশ্চই কমে যাবে। কারণ আমাদের ক্রয় ক্ষমতাতো বাড়বে না। দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলে। কিন্তু পণ্যের দাম বাড়ার সাথে সাথে যদি ক্রয় ক্ষমতাও একইভাবে বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? চাহিদা ঠিক থাকবে। বাড়বেও না কমবেও না। এরকম কিছু অবস্থা রয়েছে যেগুলো অপরিবর্তিত থাকলেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা বাড়ে। এই অন্যান্য অপরিবর্তিত অবস্থাগুলো জেনে নিই।

১. ভোক্তার আয়

২. পণ্য ও সেবার নিজস্ব দাম

৩. ভোক্তা/ ক্রেতার সংখ্যা

৪. সময়

৫. আয়ের বণ্টন

৬. অন্যান্য দ্রব্য ও সেবার দাম

এক কথায়, অন্যান্য নির্ধারকগুলো স্থির থাকা অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের/ পণ্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে যায় এবং তা বিপরীক্রমেও সত্য। একেই চাহিদা বিধি হিসেবে আমরা বিবেচনা করি। অন্যান্য অবস্থার যেকোনো একটিরও পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি অকার্যকর হবে।

চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা (Demand Schdule & Demand Curve)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ তা যে সূচির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাকে চাহিদা সূচি এবং এই চাহিদা সূচি যে রেখার মাধ্যমে বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা

draft Copy

বলে।

টেবিল- গমের চাহিদা সূচি

সমন্বয় বিন্দু	প্রতি কিলোগ্রামের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (হাজার কিলোগ্রাম)
A	১০	৩০
B	১১	২৫
C	১২	১১
D	১৩	৮
E	১৪	৬
F	১৫	৪

draft copy

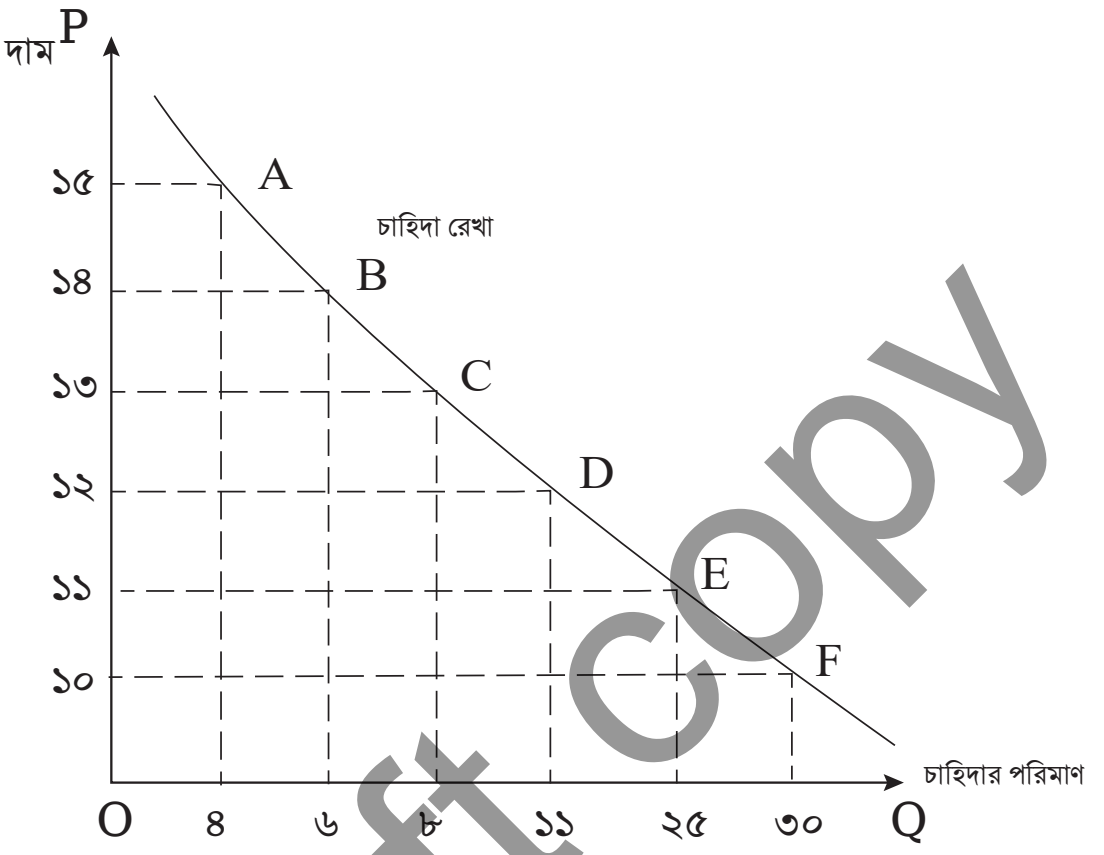

চিত্র- গমের চাহিদা রেখা

চাহিদা সূচির বিভিন্ন দামের প্রেক্ষিতে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের সমাহারগুলো যে চিত্রের বা রেখার রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে যা উপরের চিত্র দ্বারা দেখানো হয়েছে। যেখানে গমের ভিন্ন ভিন্ন দামে চাহিদার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ A, B, C, D, E এবং F বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে।

উপরের চিত্র বা চাহিদা রেখা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দাম এবং চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। একটি বাড়লে অন্যটি কমবে । আবার, একটি কমলে অন্যটি বাড়বে। তাই চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্বক। এখানে চাহিদা বিধি কার্যকর বিধায় দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তা বিপরীতক্রমেও সত্য। অর্থাৎ চাহিদা রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী ।

চাহিদা রেখার স্থানান্তর বা পরিবর্তন (Shifting Demand Curve)

draft copy

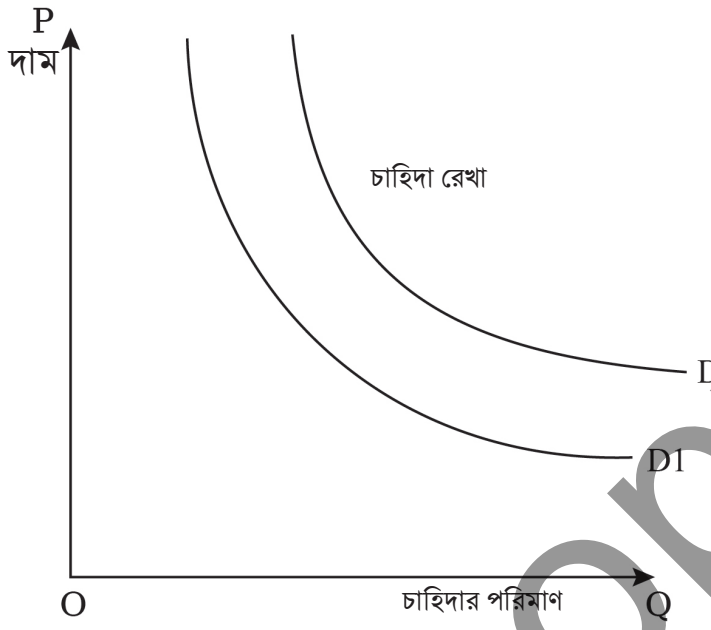

চিত্র-গমের চাহিদা রেখার পরিবর্তন

চাহিদা বিধিতে আমরা "অন্যান্য অবস্থার অপরিবর্তিত" রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দামের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে বা কমে। সেই ভিত্তিতে আমরা উপরের চিত্রে গমের চাহিদা রেখা এঁকেছিলাম। এখন ধরি, অন্যান্য অবস্থায় যে নির্ধারকগুলোকে অপরিবর্তিত ধরা হয়েছিল সেগুলোকে অপরিবর্তিত ধরা হয়েছিল সেগুলোর পরিবর্তন হয়েছে।

যেমন- ভোক্তার আয় বাড়লে সে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ ক্রয় করতে পারবে। অথবা বলা যায়, অন্যান্য অবস্থায় যে কোনো একটির মান পরিবর্তিত হলে চাহিদা রেখা মূল অবস্থান থেকে পরিবর্তন/ স্থানান্তর হয় । তাকেই চাহিদা রেখার পরিবর্তন বা স্থানান্তর বলে।

উপরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গমের চাহিদা রেখার মূল রেখা হলো D। এখন ক্রেতার আয় বৃদ্ধির ফলে যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ গমের দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি বা গমের যোগানের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি তাহলে পূর্বের নির্ধারিত দামে ভোক্তা আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ গম ক্রয় করতে পারবে । যার ফলে নতুন চাহিদা রেখা D১ থেকে D২-তে স্থানান্তরিত হবে।

draft copy

যোগান (Supply)

আমরা যখন বিগত ক্লাসে বিভিন্ন কৃষি খামার বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি তখন উৎপাদকদের বা মালিকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী কোথায় সরবরাহ করেন। তখনই আমরা জেনেছি উৎপাদকরা তাঁদের উৎপাদিত জিনিস/ দ্রব্য সামগ্রী বাজারে সরবরাহ করে থাকে মুনাফার আশায়।

তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, উৎপাদকরা বা সরবরাহকারীরা কিসের ওপর ভিত্তি/ নির্ভর করে বাজারে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে?

অনুশীলনী কাজ ৫: চলো এখন আমরা বাড়ির কাছের যেকোনো দোকানের পণ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

দোকানে যে যে পণ্যের সরবরাহ বেশি	এই পণ্যের বেশি হওয়ার কারণ কি?	পণ্যের সরবরাহ/যোগান কখন বেড়ে যায় বা কমে যায়?	পণ্যের সরবরাহ বাড়া বা কমার কারণ
১.			
২.			
৩.			
৪.			

আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যদি বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম বেশি থাকে বা ভালো পরিমাণে দাম পাওয়া যায় তাহলে সরবরাহকারী তার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন বা যোগান বাড়িয়ে বেশি মুনাফা করার চেষ্টা করেন। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে, যে দ্রব্যের দাম কম সেই দ্রব্যের যোগান বাজারে সীমিত বা অনেক সময়ে বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান থাকে না। কারণ উৎপাদনকারী কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে যে উৎপাদন খরচ হয়, বাজারে যদি ঐ দ্রব্যের দাম তার খরচের তুলনায় কম হয় তাহলে উৎপাদনকারী ঐ দ্রব্য বাজারে সরবরাহ করবে না বা উৎপাদনই করবে না। তাই দাম এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে সরবরাহকারী/ উৎপাদনকারী তাঁর উৎপাদন খরচের সমান বা তার বেশি দাম পায় তাহলে সে উৎপাদন করবে তা নির্ভর করে দাম কতটুকু বেড়েছে তার ওপর ।

তাহলে যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি পণ্যের বা সেবার বিভিন্ন পরিমামাণকে বোঝায় যা সরবরাহকারীরা বাজার মূল্যে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক।

যোগান সূচি এবং যোগান রেখা (Supply Schedule & Supply Curve)

আমরা যদি গমের যোগান সুচি বিবেচনা করি তাহলে দেখতো পারে, বিভিন্ন দামে সরবরাহকারীরা বা উৎপাদঙ্কারীরা যে পরিমাণ সরবরাহ বা যোগান দিতে ইচ্ছুক তা একটি সূচি বা টেবিলের মাধ্যমে প্রকাশ বা

draft copy

উপস্থাপন করলেই তাকেই যোগান সূচি বা টেবিলের মাধ্যমে প্রকাশ বা উপস্থাপন করলে তাকেই যোগান সূচি বলে। আর এই যোগান সূচিকে যে রেখার মাধ্যমে অংকন করা হয় তাকে যোগান রেখা বলে।

টেবিল- গমের যোগান সূচি

সমন্বয় বিন্দু	প্রতি কিলোগ্রামের দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (হাজার কিলোগ্রাম)
A	৫	১০
B	৬	১৫
C	৭	২০
D	৮	২৪
E	৯	৩০

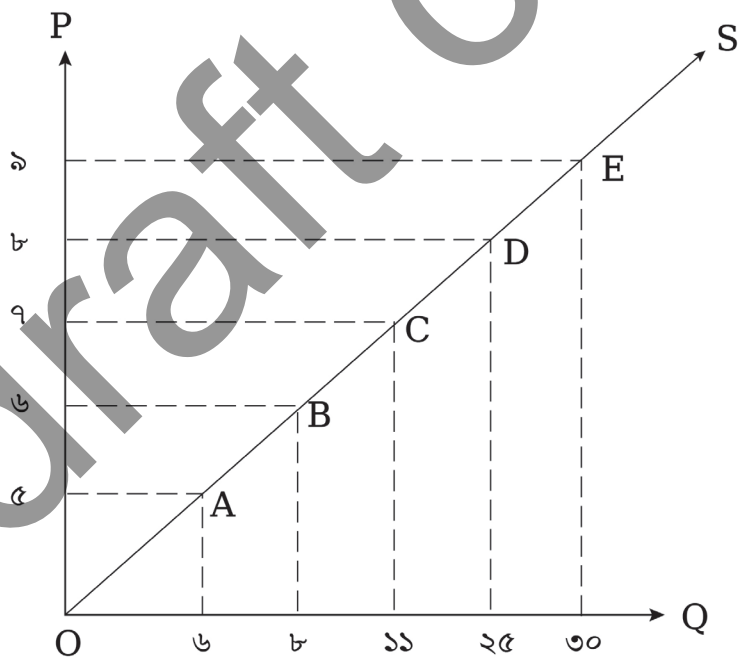

চিত্র- গমের যোগান/ সরবরাহ রেখা

draft copy

উপরের যোগান রেখাটি যোগান সূচির (বিভিন্ন দামের ভিত্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহের পরিমাণ দেখানো হয়েছে) ভিত্তিতে অংকন করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দাম বাড়লে বিক্রেতারা সরবরাহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন, আবার দাম কমলে সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দাম যখন ৫ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০ হাজার কিলোগ্রাম যা চিত্রে A বিন্দু দেখানো হয়েছে। এভাবে দাম বৃদ্ধির ফলে যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা চিত্রে B, C, D এবং E বিন্দু গুলোকে একত্রে যোগ করলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাই যোগান রেখা ।

"অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত" বা স্থির থাকা অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্য বা সেবার দাম বাড়লে বিক্রেতারা বা সরবরাহকারীরা বাজার দামে যে পরিমাণ সরবরাহ/ যোগান বাড়িয়ে থাকে এবং দাম কমলে যোগান কমিয়ে থাকে তাকেই যোগান বিধি বলে। দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি বা ইতিবাচক সম্পর্ক বিরাজ করে। অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়বে এবং একটি কমলে অন্যটিও কমবে । একেই সরাসরি সম্পর্ক বলতে পারি । যার ফলে যোগান উর্ধ্বগামী এবং যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক।

যোগান রেখার স্থানান্তর (Shifting Supply Curve)

"অন্যান্য অবস্থায় অপরিবর্তিত" বলতে যে যে নির্ধারকগুলোকে বোঝানো হয়েছে তার যে কোনো একটির পরিবর্তনের ফলে যেমন- কাঁচামালের খরচ কমে গেলে উৎপাদক আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে সরবরাহ করতে পারবে । যার ফলে যোগান রেখা স্থানান্তরিত হবে।

অথবা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম/ কৃষক গম চাষে আগ্রহী হলে গমের সরবরাহ বেড়ে যাবে। ফলে ভোক্তা একই দামে বেশি পরিমাণ গম কিনতে পারবে । বিক্রেতারাও একই দামে বেশি পরিমাণ বিক্রয় করতে পারবে। একেই যোগান রেখার স্থানান্তর বলা হয়।

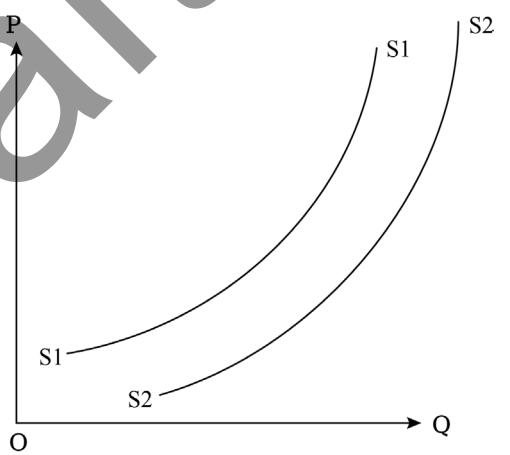

চিত্র- গমের যোগান রেখার স্থানান্তর

draft copy

টেবিল- উৎপাদন খরচ, যোগানের পরিমাণ এবং যোগান রেখার পরিবর্তন (For Activities)

	উৎপাদন খরচ	যোগানের পরিমাণ	যোগান রেখার পরিবর্তন
কাঁচামালের খরচ কমে গেলে	↑	↑	→
উপকরণের খরচ বেড়ে গেলে	↑	↓	←
উৎপাদন কমে গেলে	↑	↓	←
উৎপাদন বেড়ে গেলে	↓	↓	←
নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে	↓	↑	→
উচ্চ আয় কর/ অতিরিক্ত কর	↑	↓	←
স্বল্প/ ন্যূনতম কর আরোপ	↓	↑	→
ভর্তুকী প্রদান করলে	↓	↑	←

draft copy

বাজার ভারসাম্য দাম (Market Equilibrium Price) বা চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়া (Interactions between Deamnd & Supply)

নিলীমা একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করল।

প্রতিটি আইসক্রিমের দাম যখন ১০ টাকা তখন এর চাহিদার পরিমান থাকে ১০,০০০টি কিন্তু যোগানের পরিমান হয় ২,০০০টি। যখন প্রতিটি আইসক্রিমের দাম হয় ২০টাকা তখন বাজারে চাহিদার পরিমান কমে গিয়ে হয় ৮,০০০টি কিন্তু যোগানের পরিমান বেড়ে গিয়ে হয় ৪,০০০টি। এভাবে আইসক্রিমের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমান কমে এবং যোগানের পরিমান বাড়ে। তাই চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ে একটি ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করা হয়। যে দামে ভোক্তা/ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং একই দামে বিক্রেতা/ সরবরাহকারী বিক্রি করতে ইচ্ছুক হয়।

অনুশীলনী কাজ ৬: আচ্ছা আমরা একটু ভেবে দেখিতো প্রতিটি আইসক্রিমের দাম কত হলে ক্রেতা আইসক্রিম ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং একই দামে ফ্যাক্টরির মালিক বিক্রি করতে ইচ্ছুক হবে। কেনো এই দামে ক্রেতা কিনবে এবং ফ্যাক্টরির মালিক বিক্রি করবে তার কারণও ব্যাখ্যা করব।

আমার ভাবনা

draft copy

চমৎকার আমাদের অনেকের ভাবনার সাথে অর্থনীতিবিদদের ভাবনাও মিলে গেছে হয়তো। চলো দেখে নিই চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়ায় ভারসাম্য দাম কিভাবে নির্ধারণ হয় তা দেখে নিই।

টেবিল- চাহিদা ও যোগান সূচির মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

আইসক্রিমের দাম (৳)	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ	উদ্বৃত্ত চাহিদা (Excess Demand: +) উদ্বৃত্ত সরবরাহ (Excess Supply: -)
১	১০	২	(+)৮ (উদ্বৃত্ত চাহিদা)
২	৮	৪	(+)৪ (উদ্বৃত্ত চাহিদা)
৩	৬	৬	০ (চাহিদা ও যোগান সমান: ভারসাম্য)
৪	৪	৮	(-)৪ (উদ্বৃত্ত সরবরাহ)
৫	২	১০	(-)৮ (উদ্বৃত্ত সরবরাহ)

আমরা টেবিলটিতে চাহিদা ও যোগান সূচি একত্রে উপস্থাপন করেছি। টেবিল দেখা যাচ্ছে, আইসক্রিমের ভিন্ন ভিন্ন বাজার দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমনঃ আইসক্রিমের দাম যখন ১ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ১০ ইউনিট এবং যোগানের পরিমাণ ২ ইউনিট। অর্থাৎ এই দামে (১ টাকা অবস্থায়) বাজারে চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি কিন্তু যোগানের পরিমাণ অনেক কম । তাই বাজারে উদ্বৃত্ত চাহিদা বিরাজ করে। অন্যভাবে বলা যায়, বাজারে আইসক্রিমের দাম ১ টাকা অবস্থায় সরবরাহকারীরা তেমন যোগান দিতে ইচ্ছুক নই কারণ হয়তো এই দামে তার উৎপাদন খরচ উঠে আসে না বা তার সামান্য ক্ষতিও হতে পারে । তাই যোগানের পরিমাণ কম হয় চাহিদার তুলনায়।

টেবিল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দাম বেড়ে যখন ৩ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ উভয়েই সমান। অর্থাৎ যে দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। এই দামে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা বা অতিরিক্ত যোগান থাকবে না। তাই একে বাজার ভারসাম্য বলা হয়।

ভারসাম্য দাম ৩ টাকা ছাড়া অন্য সকল দামে হয়তো চাহিদার পরিমাণ বেশি নয়তো যোগানের পরিমাণ বেশি। তাই চাহিদাও যোগানের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ায় যে দাম স্থির/ নির্ধারণ হয় তাকে বাজার ভারসাম্য দাম বলা হয়। টেবিলে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে/ চাহিদা ও যোগানের সমন্বিত সূচির মাধ্যমে বাজার ভারসাম্য দাম চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

draft copy

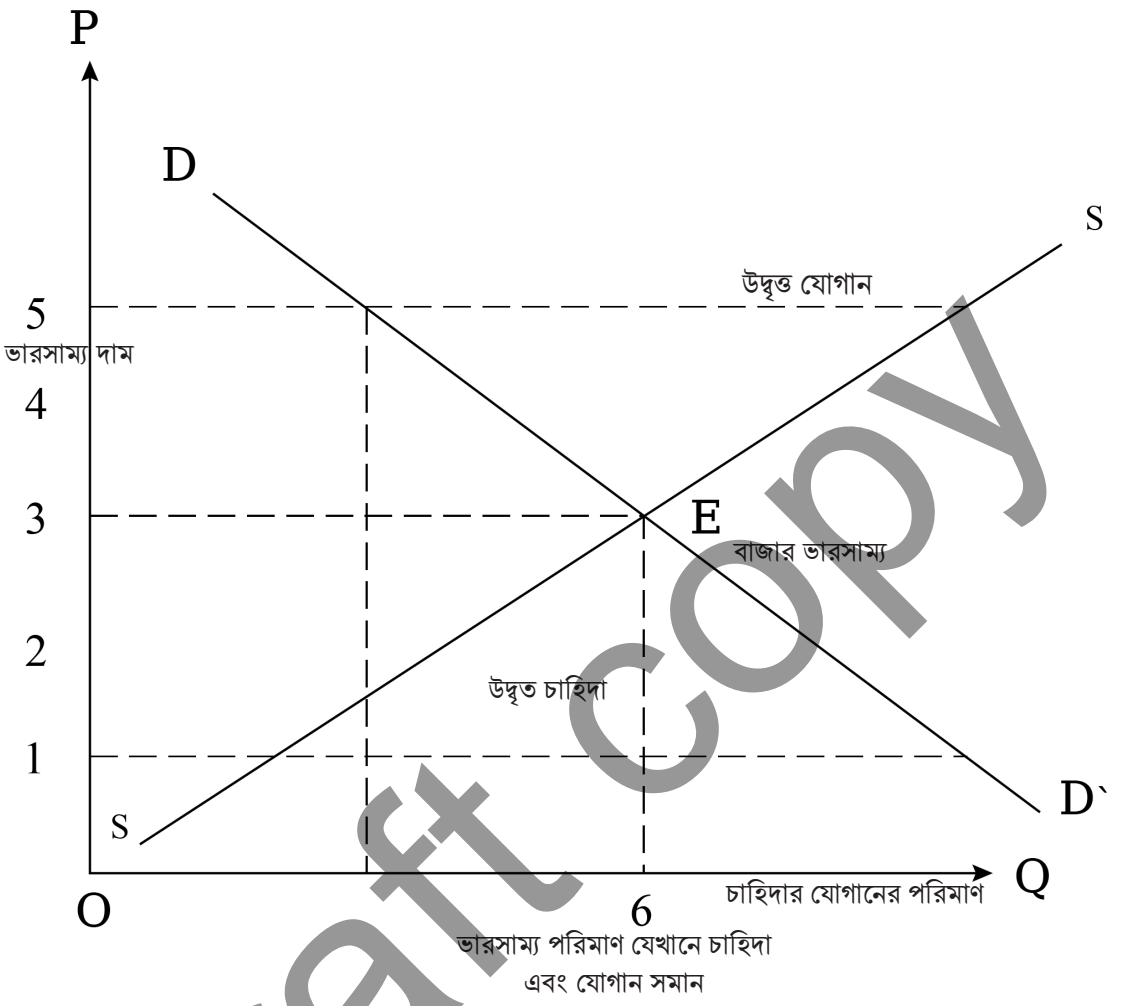

চিত্র- ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

চিত্রে,

ES= Excess Supply/ উদ্বৃত্ত যোগান

ED=Excess Demand/ উদ্বৃত্ত চাহিদা

DD = Demand Curve / চাহিদা রেখা

SS= Supply Curve / যোগান রেখা

E= Equilibrium Price / ভারসাম্য দাম। যেখানে চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ সমান সমান।

draft copy

ভারসাম্য দাম ব্যতিত অন্য কোনো দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হবে না । হয়তো উদ্বৃত্ত চাহিদা বা উদ্বৃত্ত যোগান বিরাজ করবে।

অতিরিক্ত যোগান (Excess Supply) এবং অতিরিক্ত চাহিদা (Excess Demand): মজুদ বা সংরক্ষণ

অনুশীলনী কাজ ৭: আচ্ছা, আমরা কি করোনাকালে বাজার অবস্থা কেমন ছিল তা মনে করতে পারি? হয়তো কিছু মনে পড়ছে বা এতো ভালভাবে খেয়াল করিনি। চলো আমরা আমাদের পরিচিত ৪-৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি।

১. করোনাকালে কোন কোন পণ্যের চাহিদা বেশি ছিল?

২. কেনো পণ্যগুলোর চাহিদা বেশি ছিল?

৩. পণ্যগুলোর দাম সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি না কম ছিল?

৪. বাজারে পণ্যগুলোর যোগান বা সরবরাহ কি পরিমাণে ছিল?

প্রাপ্ত তথ্য আমরা নিচের ছকে লিখব।

করোনাকালীন সময়ে পণ্যের চাহিদা ও যোগান

আমাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা হয়তো দেখতে পাবো করোনাকালো কিছু কিছু পণ্যের চাহিদা বেশি ছিল কিন্তু পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিলো। কারণ করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য পণ্যগুলো কেনার ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাই ভারসাম্য দামের চেয়েও বেশি দামে ক্রেতারা কিনছিল এবং অতিরিক্ত যোগান ছিল। অর্থাৎ বেশি দামে বিক্রেতারা অতিরিক্ত যোগান (Excess Supply) দিতে ইচ্ছুক। এই সময়ে বাজারে অসংখ্য উৎপাদক অধিক মুনাফার লোভে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে থাকেন।

draft copy

বাজারে যখন ভোজ্য তেলের মূল্য প্রতি লিটারে ১৬০ টাকা বেড়ে ১৭৫ টাকা হলো তখন মিজান সাহেব ভোজ্য তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দিলেন ৩০ ইউনিট থেকে ৪০ ইউনিট। ভোজ্য তেলের দাম বাড়ায় বাজারে চাহিদা কমে যায়। ফলে উৎপাদিত অতিরিক্ত ১০ ইউনিট ভোজ্য তেল তিনি মজুদ বা সংরক্ষণ করে রাখেন।

তাহলে আমরা বলতে পারি, বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের ফলে তা বিক্রি না হওয়ায় সংরক্ষণ বা মজুদ করতে হয়।

আবার, যেসমস্ত কৃষি দ্রব্য পচনশীল এবং সংরক্ষণ করতে না পারলে দ্রুত সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় ঐ ধরনের দ্রব্যগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে রাখতে হয়। যার ফলে উৎপাদকের খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন খরচের সাথে সংরক্ষণ বাবদ খরচ একত্র করলে মোট খরচ বেড়ে যায়। ফলে করোনাকালিন সময়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। আমরা জানি, কোন পণ্যের চাহিদা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেলে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকলে দামও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় কিছু কিছু উৎপাদনকারী যাদের অধিক উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে তারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে একটা সম পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অন্যান্য উৎপাদনকারীও তাদের উৎপাদন বাড়ায় তাহলে দেখা যাবে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। ফলে উৎপাদনকারীরা আবার তাদের দাম কমিয়ে বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে থাকে। একটা পর্যায়ে দাম কমতে কমতে ভারসাম্য দামে নির্ধারিত হবে। এক কথায়, ভারসাম্য দাম নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত যোগান এবং চাহিদার তফাৎ বা ফারাক থাকবে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

draft copy

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশের অবস্থান এর আগেও দ্বিতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু ২০২০ সালে ভিয়েতনাম এই স্থানটি দখল করে তখন বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে নেমে যায়।

ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের সরকার পোশাক শিল্প মালিকদের অধিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকেন। যার ফলে বেশ কয়েকটি পোশাক শিল্প এখন বিশ্ব বাজারে পোশাক সরবরাহ করতে পারছে। এর মধ্যে হা-মীম গ্রুপ ও বেক্সিমকো অন্যতম। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরিকৃত পোশাকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে পোশাক শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমানে তৈরিকৃত পোশাক সরবরাহ করছে। ২০২১ সালের এক তথ্য অনুসারে হা-মীম গ্রুপ রপ্তানি করে ৫৮ কোটি ডলারেরও বেশি পোশাক পণ্য। বর্তমানে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের সরবরাহ বেড়েছে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের দাম কম হওয়ায় ভোক্তাদের কাছে এই পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। একটি রিপোর্ট অনুসারে তুরস্কে তৈরি যে পণ্যটি কিনতে লাগে ৮ ডলার বাংলাদেশে তৈরি সেই পণ্যটি হয়তো পাওয়া যায় ৩ ডলারে।

করোনাকালে পোশাক শিল্পে বিশ্ব বাজার অর্থনীতি কিছুটা স্থবির ছিল। তখন উদ্যোক্তরা চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য সংরক্ষণ করেন এবং তাদের উৎপাদন উপকরণের মূল্য হ্রাসে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেমন-শ্রমিকের সংখ্যা কমানো, বেতন কমানো ইত্যাদি। অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে বিধায় সরকার এই সমস্যা নিরসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পণ্য রপ্তানি এবং স্থানীয় বাজারে পোশাক বিক্রির প্রক্রিয়া সুগম করে দেন।

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের ক্রম বর্ধমান চাহিদা বিশ্লেষণ করে অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের বিশ্ব মানসম্পন্ন পণ্য আরো বেশি পরিমাণে উৎপাদনের প্রতি মনযোগী হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অন্যতম আরেকটি রপ্তানিযোগ্য পণ্য হচ্ছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য যা বিশ্ববাজারে এক বিরাট অংশ দখল করে আছে। কিন্তু বিশ্ব বাজারে এর চাহিদা কমছে ফলে এই পণ্য উৎপাদনের পরিমাণও কমছে। অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, পাট শিল্পের প্রতি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন

draft copy

তাই বাংলাদেশে যেখানে বিশ্ববাজারে ৪৫ বিলিয়ন ডলার পোশাক যোগান দিয়েছে সেখানে তুরস্ক যোগান দিয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার পোশাক। বাংলাদেশে শ্রমিক মজুরি ও মূলধন যেমন-ভবন, জমি ও টাকা ইত্যাদি কম হওয়ায় কম খরচে পোশাক উৎপাদন করা যায়। এতে পোশাক শিল্পের মালিকেরা কম মূল্যে পোশাক যোগান দিতে পারেন।	পরিবেশবাদীদের মতামত, প্লাস্টিকের তৈরি ব্যাগ ও বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ব্যবহার পরিহার করে পরিবেশ বান্ধব পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার করার বিষয়ে ভোক্তাদের আগ্রহী করা যেতে পারে। তবে এতে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। পাটজাত পণ্য ক্রয়ের চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়বে এতে করে প্লাস্টিকের পণ্য তৈরির কারখানাগুলোর যোগান কমে যেতে পারে।

অনুশীলনী কাজ ৮: এই পাঠে শেখা অর্থনীতির কয়েকটি বিষয় উপরের প্রতিবেদন পড়ে নির্ণয় করি। সেই সাথে বিস্তারিতভাবে লিখি প্রতিবেদনে এই বিষয়ে কি দেওয়া আছে। একটি উত্তর করে দেওয়া আছে।

বিষয়	প্রতিবেদনে যেভাবে লেখা আছে	কারণ/ব্যাখ্যা
ব্যস্টিক অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতি	হা-মীম গ্রুপ ৫৮ কোটি ডলারেরও বেশি পোশাক পণ্য উৎপাদন করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরিকৃত পোশাকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে পোশাক শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমানে তৈরিকৃত পোশাক সরবরাহ করছে।	প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের সব পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে।
ইতিবাচক অর্থনীতি নীতিবাচক অর্থনীতি		
সুযোগ বর্জন		
চাহিদা বিধি		

draft copy

যোগান বিধি		
অরিক্তি চাহিদা/অতিরিক্ত যোগান		

আয় বৈষম্য (Income Discrimination)

আয় বৈষম্য বলতে সমাজ বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার মধ্যে ব্যক্তি (Individual) বা পরিবারের (Household) মধ্যে আয়ের অসম বণ্টনকে বোঝায়। এটি একটি সামাজিক (Social) এবং অর্থনৈতিক (Economic) সমস্যা যা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আয়ের মধ্যে ব্যবধান পরিমাপ করে, যা সম্পদ এবং উপার্জনের বৈষম্যকে হাইলাইট করে।

আমরা এখন আয় বৈষম্যের মূল কারণগুলি উল্লেখ করবো:

মজুরি বৈষম্য (Wage Disparities): শ্রমিকদের মজুরি (Wage of Labour) এবং কর্মকর্তাদের বেতনের (Salaries of Employees) তুলনামূলক পার্থক্য আয় বৈষম্যের একটি প্রধান অনুঘটক বা উপাদান। বিশেষভাবে অর্জিত জ্ঞান বা উন্নত শিক্ষাসহ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ (Skilled Human Resources) বা কর্মীরা প্রায়শই নিম্ন-দক্ষ (Low Skilled) বা অদক্ষ (Unskilled) শ্রমিকদের তুলনায় উচ্চ মজুরি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী মজুরি প্রদান করা হয় না। যার ফলে উদ্যোক্তা কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ করা হয়।

গুনগত শিক্ষা ও দক্ষতার স্তর (Quality Education & Efficiency Level): আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চস্তরের গুনগত শিক্ষা এবং বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সাধারণত ভাল বেতনের চাকুরি এবং অবারিত কর্মজীবনের সুযোগের দিকে পরিচালিত বা ধাবিত করে। মানসম্পন্ন শিক্ষা, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা পারদর্শিতা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ চাকুরীতে প্রবেশাধিকারের বা সুযোগের বৈষম্য পরবর্তীতে আয় বৈষম্যকে স্থায়ী করতে পারে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি (Technological Advancements): প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উন্নত প্রযুক্তির সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী হয়ে আয় বৈষম্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয়তা এবং ডিজিটালাইজেশনের ফলে স্বল্প-দক্ষ কর্মীদের চাকরি স্থানচ্যুতি হতে পারে, আয়ের ব্যবধান আরও প্রসারিত হতে পারে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে যারা খাপখাওয়াতে পারবে না তারা শ্রম বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অথবা নূন্যতম মজুরিতে চাকুরি করতে বাধ্য হবে। যারা যতো দ্রুত সম্ভব নতুন প্রযুক্তি বা আধুনিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হবে তারা অধিক আয় করতে পারবে। ফলে নতুন প্রযুক্তিও আয় বৈষম্যের কারণ হতে পারে।

বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্য (Globalization & Trade): বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশে চাকরি ও শিল্প স্থানান্তরের মাধ্যমে আয় বৈষম্যকে প্রভাবিত করেছে। যদিও এটি নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে পারে, এটি নির্দিষ্ট সেক্টরে চাকরি হারাতে পারে, নিম্ন-দক্ষ কর্মীদের প্রভাবিত করে এবং আয় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশ্বায়নের যুগে আমাদের দেশের অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক আমাদের দেশের

draft copy

বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, সেবা খাতে, উৎপাদন খাতে এবং অবকাঠামো নির্মাণে নিয়াজিত রয়েছে। এখানে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, আমাদের দেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বহির্বিশ্বে কর্মরত থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়ে থাকে তার থেকে অনেক কম সংখ্যক বিদেশি বাংলাদেশ থেকে তাদের দেশে তুলনামূলক বেশি বেতন ভাতা পাঠিয়ে থাকে। কারণ বিদেশি যারা আমাদের দেশে কর্মরত রয়েছে তাদেরকে উচ্চ বেতনে কাজ দিতে হয়।

কর নীতি (Taxation): কর ব্যবস্থা আয় বৈষম্য কমাতে বা বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রগতিশীল কর কাঠামো, যেখানে উচ্চ উপার্জনকারীদের উচ্চ হারে কর দেওয়া হয়, সম্পদ পুনঃবন্টন এবং বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। বিপরীতভাবে, রিগ্রেসিভ ট্যাক্স নীতিগুলি কম আয়ের ব্যক্তিদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বোঝা চাপতে পারে।

লিঙ্গ এবং সংখ্যালঘু বৈষম্য (Gender & Minority Disparities): আ বৈষম্য দ্বারা প্রায়শই লিঙ্গ অর্থাৎ নারী পুরুষ, আদিবাসী, বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। নারী, উপজাতি, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই কম মজুরি এবং উচ্চ বেতনের পদগুলিতে সীমিত প্রবেশের সুযোগ পায়, যা লিঙ্গ এবং জাতিগতভাবে আয় বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করে।

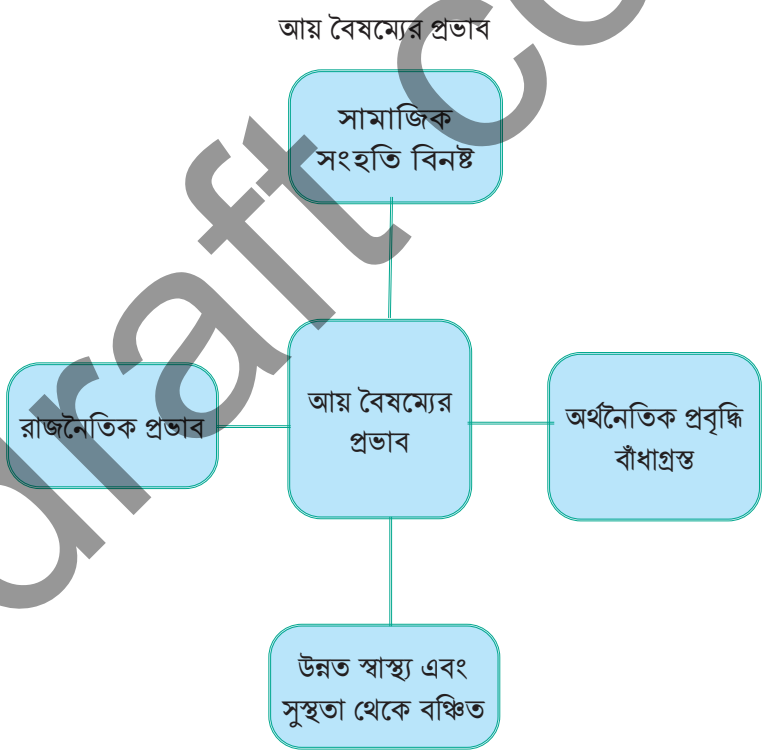

সামাজিক সংহতি বিনষ্ট: উচ্চমাত্রার বা চরম আয় বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হতে হতে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ক্রোধ কাজ করে। কারণ এটি অন্যায়

draft copy

এবং অন্যায়ের অনুভূতি তৈরি করে। ফলে এটি সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করতে পারে এবং সমাজকে বিভাজন ও দ্বন্দ্বে ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত (Economic Growth): চরম আয় বৈষম্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যদি মোষ্টিমেয় ধনী শ্রেণির মানুষ পেয়ে থাকে এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন মানের ইতিবাচক কোনো ধরণের পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই প্রবৃদ্ধি আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে। যখন জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত থাকে, তখন এটি ভোক্তাদের চাহিদা কমাতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে নিম্ন আয়ের ভোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী বা সেবা বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে না।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা: আয়ের বৈষম্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ফলাফলের সাথে যুক্ত। নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিরা প্রায়শই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, গুনগত শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে সীমিত সুযোগ পায়। যার ফলে স্বাস্থ্যের ফলাফল, আয়ুষ্কাল এবং জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দেখা দেয়।

রাজনৈতিক প্রভাব: আয়ের বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষমতার গতিশীলতাকে বিঘ্নিত করতে পারে, কারণ বেশি সম্পদের অধিকারীরা প্রায়শই নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর বেশি প্রভাব ফেলে। এটি ধনীদের স্বার্থের পক্ষ হয়ে বৈষম্যকে আরও স্থায়ী করতে পারে।

অনুশীলনী কাজ ৯:

চলো এখন আমরা দলে বসে এই আয় বৈষম্য দূর করার কিছু সমাধান খুঁজি। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে আয় বৈষম্য দূর করার কয়েকটি উপায় নিচের ছকে লিখি।

আয় বৈষম্য দূর করার উপায়

আমরা অনেকেই আয় বৈষম্য দূর করার চমৎকার কিছু উপায় বের করে ফেলেছি। এখন দেখা যাক অর্থনীতিতে

draft copy

আয় বৈষম্যের কি কি সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

আয় বৈষম্যের সমাধান

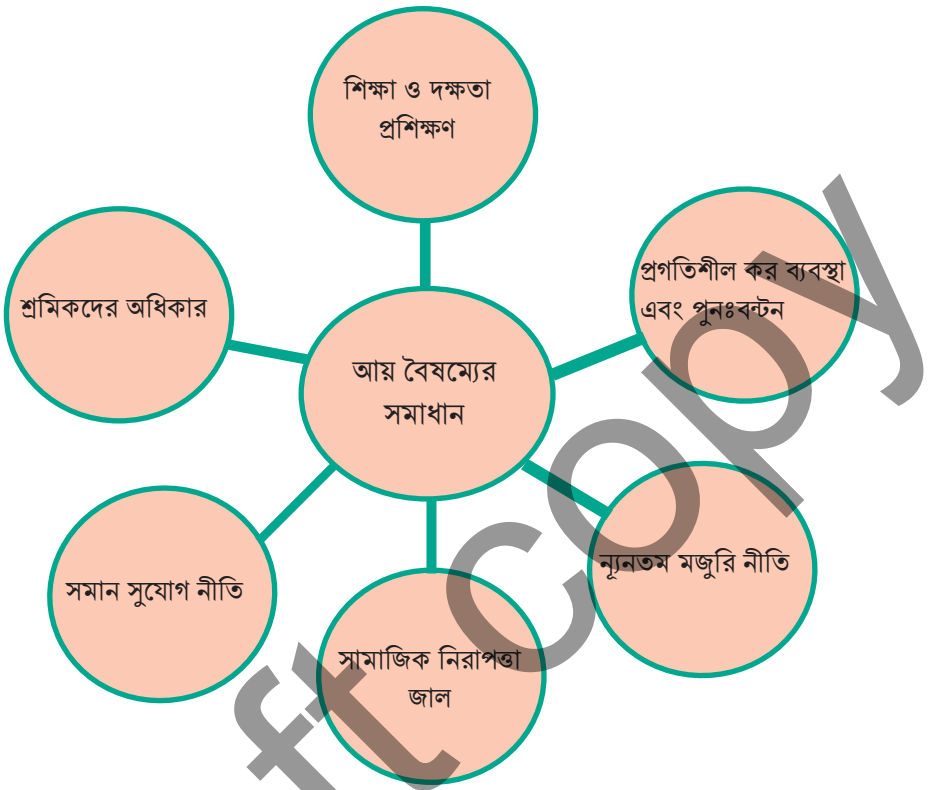

draft copy

শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ: আয়ের বৈষম্য কমানোর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং উচ্চতর দক্ষতা তাদের কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়ায়।

প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা এবং পুনঃবন্টন: প্রগতিশীল কর নীতি বাস্তবায়ন সম্পদ পুনঃবন্টন এবং আয় বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। সরকার উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের জন্য করের হার বাড়াতে পারে এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য সম্পদ বরাদ্দ করতে পারে।

ন্যূনতম মজুরি নীতি: ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি মান প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা নিম্ন আয়ের কর্মীদের উন্নীত করতে এবং আয়ের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য ন্যূনতম মজুরিতে পর্যায়ক্রমিক সমন্বয় করা উচিত।

সামাজিক নিরাপত্তা জাল: বৃদ্ধ ও অসহায় ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বেকারত্বের সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের মতো ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা নেট প্রোগ্রামগুলি বিকাশ করা

ব্যক্তি এবং পরিবারগুলির জন্য একটি নিরাপত্তা জাল প্রদান করতে পারে যারা অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সমান সুযোগ নীতি: বৈষম্য বিরোধী ব্যবস্থা, ইতিবাচক পদক্ষেপ, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে সমান সুযোগের প্রচার করা লিঙ্গ, জাতিগততা এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত আয় বৈষম্যকে মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

শ্রমিকদের অধিকার শক্তিশালী করা: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা, ন্যায্য শ্রম অনুশীলন নিশ্চিত করা এবং সমষ্টিগত দর কষাকষি সমর্থন করা আরও ন্যায়সঙ্গত মজুরি এবং কাজের পরিস্থিতিতে অবদান রাখতে পারে।

আয়ের বৈষম্য মোকাবেলার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যাতে সরকারী নীতি, ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং সামাজিক উদ্যোগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার লক্ষ্য ন্যায্যতা, সমতা এবং ভাগ করে নেওয়া সমৃদ্ধি।

অনুশীলনী কাজ ১০:

আমরা আমেরিকার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের গড় বাৎসরিক বেতন থেকে আয় বৈষম্য বের করব। এই আয় বৈষম্য নিরসনে আমেরিকার সরকার কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন তা প্রতিবেদন আকারে লিখে জমা দিব।

পেশা	বাৎসরিক বেতন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	২,৪৬,৪৪০ ডলার
মার্কেটিং ও সেলস ম্যানেজার	১,৫৩,৪৭০ ডলার
মানব সম্পদ ম্যানেজার	১,৪৫,৭৫০ ডলার
কৃষক	৮৩,৭৯০ ডলার
শিক্ষা প্রশাসন, কিন্ডারগার্ডেন থেকে মাধ্যমিক স্তর	১০৬,৬৯০ ডলার
অর্থনীতিবিদ	১২৮,১৮০ ডলার
জ্যোর্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যাবিদ	১৪৭,৮০০ ডলার

draft copy

কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী	৪৯,৯০০ ডলার
খাবার পরিবেশক	৩৩,০২০ ডলার

draft copy